প্রকাশক :
আবদুল আজীজ আল-আমান
সোলেমানপুর ।। রাজীবপুর
২৪-পরগণা

একমাত্র পরিবেশক :
ইউনিভার্সাল বুক ডিপো
৫৭-বি কলেজ ষ্ট্রীট, কলি-১২

প্রথম মুদ্রণ :
কলিকাতা সংস্করণ
নজরুল-জন্মদিবস
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২
২৫শে মে, ১৯৫৫

মুদ্রাকর :
শ্রীপরমানন্দ সিংহরায়
কালী প্রেস
৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলি-৯
এবং
পি, বি, প্রেস
শ্রীশক্তিপদ পাল
১।১-এ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলি ৬

মূল্য : বার টাকা

সুচীক্রম

কবিতা ও গান

নাটিকা :

প্রবন্ধ ও আলোচনা :

অভিভাষণ :

চিঠিপত্র :

কবি-পরিচিতি :

পরিশিষ্ট :

মুখবন্ধ

কবি কাজী নজরুল ইসলামের যে-সকল রচনা এ-সংকনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা ইতিপূর্বে তাঁর কোনো বাজারে-প্রকাশিত পুস্তকে স্থান পায়নি।

১৩৬৫ সালের ২৫শে বৈশাখ "নজরুল ইসলামের পরিণত প্রতিভার দান বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত কবিতা" নিয়ে 'শেষ সওগাত' বের হয়। এই সংকলনের 'কবিতা ও গান' অধ্যায়ের লেখাগুলিরও অধিকাংশই কবির 'পরিণত' বয়সের রচনা। কবির রচিত এরূপ আরও অনেক কবিতা ও গান নানা সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় এখনও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। কলকাতা বেতার-কার্যালয়ে এবং অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহেও কবির কিছু অপ্রকাশিত রচনা হয়ত পাওয়া যেতে পারে।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর সাপ্তাহিক 'কৃষক' সম্পাদকের খাতায় কবি লিখে দিয়েছিলেন এই শ্লোকটি—

"শক্তি-সিন্ধু মাঝে রহি' হায় শক্তি পেল না যে
মরিবার বহু পূর্বে, জানিও মরিয়া গিয়াছে সে।"

'অঞ্জলি'-সম্পাদককে উপহার দিয়েছিলেন পথে-চলার এই উৎসাহ-বচন—

"হে তরুণ! কোন্ অঞ্জলি দিতে এই যুগে আসিয়াছ?
কোন্ সে অসম্ভবের সাগর-স্রোতে তুমি ভাসিয়াছ?
তুমি কি ঘরের? অথবা পীড়িত ভারতের তুমি কেহ?
ভোগের অথবা পরম-ভোগের তরে তব প্রাণ দেহ?
আজি ভারতের সন্ধিক্ষণে অঞ্জলি নিবেদন
করিবে কি তব সকল শক্তি আত্মা ও যৌবন?"

কবির ভক্ত ও অনুরাগীরা যত্নপর হলে তাঁর এ-ধরণের বহু বিক্ষিপ্ত রচনা একত্রে গ্রন্থাকারে সংগ্রথিত হতে পারে। আমরা আশা করছি, এ সংকলনের পরবর্তী সংস্করণে কবির কয়েকটি অপ্রকাশিত কবিতা সংযোজিত করতে পারব।

১৩৩৪ শ্রাবণের 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রকাশিত হলে তার সমালোচনা ক'রে ভাদ্রের 'বিচিত্রা'য় শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লেখেন 'সাহিত্যধর্মের সীমানা', আশ্বিনের 'বঙ্গবাণী'তে শরৎচন্দ্র লেখেন 'সাহিত্যের রীতিনীতি।'

শরৎচন্দ্রের প্রতিবাদ ক'রে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ১৩৩৪ আশ্বিনের 'আত্মশক্তি'তে লেখেন 'আধুনিক সাহিত্য ও শরৎচন্দ্র', তাতে বলেন : "তিনি (শরৎচন্দ্র) নজরুল-কল্লোল-কালিকলমের সাহিত্য সৃষ্টিতে আস্থাবান—যাহাদের রচনার প্রতি অক্ষরে কৃত্রিমতা চিৎকার করিয়া উঠিতেছে।" অতঃপর রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের পরিপূরক হিসেবে ১৩৩৪ অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে লেখেন 'সাহিত্যে নবত্ব'। তাতে বলেন : "মোহিতলাল সাধারণের কাছে খ্যাতিলাভ করেছেন। এই খ্যাতির কারণ তাঁর কাব্যের অকৃত্রিম পৌরুষ। অকৃত্রিম বলছি এই জন্যে, তাঁর লেখায় তাল-ঠোকা পায়তারা-মারা পালোয়ানি নেই যথার্থ যে বীর সে সার্কাসের খেলোয়াড় হতে লজ্জাবোধ করে। পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্যাদা আছে; সাহস আছে, বাহাদুরি নেই।" রবীন্দ্রনাথের এ-সব কথায় ইঙ্গিত লক্ষ্য করে নজরুল ইসলাম 'আত্মশক্তি'তে লেখেন 'বড়র পিরীত বালির বাঁধ', তাতে রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' নাটিকার উৎসর্গকরণ, কবিতায় 'রক্ত' অর্থে 'খুন' শব্দ ব্যবহার প্রভৃতি বহু বিষয়ের উল্লেখ করেন। অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনে নজরুল নিয়েছিলেন পুরোধার ভূমিকা, এ প্রবন্ধটিতে তার পরিচয় প্রোজ্জ্বল।

নজরুলের সম্পাদিত অর্ধসাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' (১৩২৯) ছাপা হতো কলকাতার মেটকাফ প্রেসে। ১৩৪৫ সালের দিকে উক্ত প্রেসের কর্তৃপক্ষ সাপ্তাহিক 'দুন্দুভি' বের করেন, তাতে নজরুলের 'পদ্ম-গোখরো' গল্পটি প্রকাশিত হয়। উক্ত 'দুন্দুভি' পত্রে প্রকাশিত নজরুলের একটি প্রবন্ধের উল্লেখ আমি অন্যত্র করেছি। কবির চিত্ত-বিকাশের ধারা অনুধাবনের জন্য প্রবন্ধটি মূল্যবান।

উপরোক্ত প্রবন্ধ দু'টি সংগ্রহ করা গেলে দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় (১৯৪০-৪২) নজরুলের স্বাক্ষরিত যে-সকল সম্পাদকীয় সন্দর্ভ প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলিও সংগৃহীত হয়ে একত্রে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়া প্রয়োজন।

এ সংকলনের কবির ১২টি 'অভিভাষণ' পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু কবি আরও বহু অনুষ্ঠানে বাণী ও ভাষা দিয়েছিলেন, হয়ত নানা সাময়িক পত্রিকাতে সেগুলি মুদ্রিত হয়েছিল। সে-সব অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা সহযোগিতা করলে সেগুলি সহজেই সংগৃহীত হতে পারে।

কবির লেখা যে-সকল 'চিঠিপত্র' এ সংকলনে স্থান পেয়েছে, তার প্রায় সব-গুলিই ইতিপূর্বে সাপ্তাহিক 'সওগাত', ত্রৈমাসিক 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা',

মাসিক 'জাগরণ', মাসিক 'যুগের আলো', সাপ্তাহিক 'লাঙল', মাসিক 'মাহে-নও', বার্ষিক 'শিখা', মাসিক 'সওগাত', মাসিক 'দিলরুবা', সাপ্তাহিক 'ওযাতান', সাপ্তাহিক 'জমানা', দৈনিক 'কৃষক', দৈনিক 'আজাদ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল— এখানে সেগুলি শুধু তারিখ-পরম্পরা একত্রে সজ্জিত করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে কবি খান্ মোহাম্মদ মঈনুদ্দীনের 'যুগস্রষ্টা নজরুল', শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের 'কাজী নজরুল' ও বেগম শামসুন্ নাহার মাহমুদের 'নজরুলকে যেমন দেখেছি' প্রভৃতি পুস্তকও কাজে লেগেছে। শুনেছি, জনাব মোহাম্মদ আফজাল-উল হক, শ্রীসুবোধ রায়, শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, জাহানারা বেগম চৌধুরী প্রভৃতি বহু বিদগ্ধজনের কাছে নজরুল ইসলামের লেখা চিঠি আছে, সেগুলিও (অনাবশ্যক ও ব্যক্তিগত অংশসমূহ বাদ দিয়ে হলেও) প্রকাশের ব্যবস্থা করা উচিত।

এই গ্রন্থ-ভুক্ত নজরুল-রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয় ব্যতিরেকে বাঙলা সাহিত্য ও সঙ্গীতে নজরুলের অসামান্য অবদানের পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি ও সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্ভব নয় বলেই আমাদের ধারণা। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই 'নজরুল রচনা-সম্ভার' গ্রন্থনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এখন বাংলার সুধী ও রসিকবর্গের সুবিচার ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করছে এ-প্রচেষ্টার বাস্তব সার্থকতা।

—আবদুল কাদির

কবিতা ও গান

প্রথম অশ্রু

এরি লাগি' তুই পথ চেয়ে' কি রে ব'সে ছিলি মুসাফের,
প্রথম অশ্রু দেখে যাবি চোখে নিরশ্রু আকাশের?
রৌদ্র-ধূসর উষর গগন
হেরিল কখন মেঘের স্বপন,
দুলিয়া উঠিল অসীম রোদন কূলে কূলে নয়নের,
তত ঝরে জল—চোখে অঞ্চল যত চাপে জলদের।

ডাকিয়াছে কুহু মুহুর্মুহু গো দিবসে যাহার বনে
ফাগুন দিতেছে ফুল-ফরমাস যার রাঙা অঙ্গনে,
যাহার হাসির রোদ্দুর-তাতে
শিশির শুকায়ে গিয়াছে প্রভাতে,
সে কেন আজিকে নিশুতি নিশীথে জাগিয়া সঙ্গোপনে—
চিকুর এলায়ে কাঁদিছে লুটায়ে, কি কথা করিয়া মনে?

তৃষিত চাতক! এরি লাগি' কি রে এতদিন ব'সে ছিলি
চাহিয়া শুষ্ক গগনে— খুলিয়া নয়নের ঝিলিমিলি?
এরি লাগি' জাগি' কাটালি, অধীর!
মধু-মাসে চাস্ বরষার নীর?
এই জল চাহি' এতদিন ধরি' এত আঁখি-জল দিলি?
কে জানে কাহার দুঃখে আকাশ কাঁদিতেছে নিরিবিলি!

কাঁদিছে আকাশ—সে যে তোরি তরে, কে বলিল তোরে বল্!
ঐ জল চাহি' কাঁদিছে কানন, মরা নদী, ধরাতল।
শাখে শাখে কাঁদে কলিকা কুসুম,
ফটিক-জলের চোখে নাই ঘুম,

জাগে প্রান্তর তৃষ্ণায় কাতর দগ্ধ-তৃণাঞ্চল,—
কে জানে কাহারে স্মরিয়া উহার নয়নে নেমেছে ঢল ?

কাহার উপরে অভিমানে কার প্রণয়-অনাদৃতা
মেঘ-বেণী হ'তে ছিঁড়ে' ছিঁড়ে' ফেলে বিজলী-জরীন্ ফিতা!
ঘন ঘন বহে পূবাল বাতাস
অভিমানিনীর দারঘ শ্বাস,—
নিভাইয়া সব তারা-দীপ, কাঁদে ধূলি-অবলুণ্ঠিতা!
হতাশ পথিক! তুই কেন সেথা চাহিয়া আছিস্ বৃথা ?

বন্ধ ক'রে দে বাতায়ন তোর, ভেসে' চল্ পথ-টানে!
মিটা' বক্ষের নিদারুণ তৃষা কণ্ঠের বিষপানে!
তোর তরে নয় যে অশ্রুজল,
তা'রে চেয়ে' তোর কি হবে, পাগল!
তোর বনে ফুল মুঞ্জরিবে না * * *
* * * * * * *

(অসমাপ্ত) †

† পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে, কবি প্রথমে কবিতাটি রচনা শুরু করেছিলেন এভাবে :

এরি লাগি' তুই পথ চেয়ে' কি বে ব'সে ছিলি মুসাফির,
নিরশ্রু তা'র চোখে দেখে যাবি প্রথম অশ্রু-নীর ?
রৌদ্র-ধূসর উষর গগন
কূলে কূলে জলে হ'ল নিমগন,
যত চাপে চোখে মেঘের আঁচল, * * * *

জয় হোক! জয় হোক!

জয় হোক, জয় হোক, আল্লার জয় হোক!
শান্তির জয় হোক, সাম্যের জয় হোক!
সত্যের জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক!
সর্ব অকল্যাণ পীড়ন অশান্তি
সর্ব অপৌরুষ মিথ্যা ও ভ্রান্তি
হোক ক্ষয়, ক্ষয় হোক!
জয় হোক, জয় হোক!

দূর হোক অভাব ব্যাধি শোক-দুখ,
দৈন্য গ্লানি বিদ্বেষ অহেতুক!
মৃত্যু-বিজয়ী হোক অমৃত লভুক
ভয়-ভীত দুর্বল নির্ভয় হোক!
জয় হোক! জয় হোক!

র'বে না এ শৃংখল উচ্ছৃংখলতার,
বন্ধন কারাগার হবে হবে চুরমার,
পার হবে বাধার গিরি-মরু-পারাবার,
অসৎ, অবিদ্যা, লোভী ও ভোগী লয় হোক!
জয় হোক! জয় হোক!

যৌবন জয়ী হোক, জড়তা ও জরা যাক,
প্রতি নিঃশ্বাসে "পাব" বিশ্বাস বেঁচে থাক!
"পাব না" বলে যারা, জ্যান্তে মরা তা'রা,
আঁধারের জীব তা'রা ভয়ে দ্বার খোলে না,
পাষাণ-পিণ্ড তা'রা নিশ্চল চলে না।

জীবন যাদের আছে তারাই মানুষ,
তাদেরই সাথে শুধু পরিচয় হোক!
জয় হোক, জয় হোক!

জাগে না ভিতরে যার প্রবল তেজ,
কে কাটিবে হায় তার ভিতরের লেজ?
অসম্ভবের পথে যে বীর চলে
আসমানে শির তার, পৃথিবী টলে
তাহার চরণ-তলে। অসাধ্য তার
আয়ত্ত হয় সাধনার।
ঝঞ্ঝার গতি-বেগ তাহার সাথী
কোটি গ্রহ-তারা তার পথের বাতি।
না-দেখা বিপুল শক্তিতে আপনাব
মানব পুনরায় অসংশয় হোক!
জয় হোক, জয় হোক!

পরাজয় মানে না সে আছে যার যৌবন,
যুদ্ধ করে সে করিয়া পরাণ-পণ,
যাহা চায় তাহা যদি নাহি পায় তবু সে
রণ-ক্ষেত্রে মরে, পলায় না কভু সে!
অসুর-নির্জিত মানবতা ক্লৈব্য
পুনঃ দুর্জয় যৌবন-ময় হোক!
জয় হোক, জয় হোক!

আল্লার দেওয়া পৃথিবীর ধন-ধান্যে
সকলের সম অধিকার;
রবি শশী আলো দেয়, বৃষ্টি ঝরে—
সমান সব ঘরে, ইহাই নিয়ম আল্লার!

এক করে সঞ্চিত, বহু হয় বঞ্চিত—
জাগো লাঞ্ছিত জনগণ সবে—সংঘবদ্ধ হও।
আপনার অধিকার জোর ক'রে কেড়ে' লও।
নহিলে আল্লার আদেশ না মানিবে,
পরকালে দোজখের অগ্নিতে জ্বলিবে;
দুনিয়াতে আবার সর্বভ্রাতৃত্ব সমন্বয় হোক।
জয় হোক, জয় হোক।

র'বে না দারিদ্র, র'বে না অসাম্য,
সমান অন্ন পাবে নাগরিক গ্রাম্য,
র'বে না বাদ্‌শা রাজা জমিদার মহাজন,
কারো বাড়ী উৎসব কারো বাড়ী অনশন,
কারো অট্টালিকা কারো খড়-হীন ছাদ,
র'বে না এ ভেদ, সব ভেদ হবে বরবাদ।
নির্যাতিত ধরা মধুর সুন্দর প্রেমময় হোক।
জয় হোক, আল্লার জয় হোক।

সাম্যের জয় হোক! শান্তির জয় হোক!
সত্যের জয় হোক! জয় হোক, জয় হোক!

দৈনিক 'নবযুগ'
২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১।

আল্লা পরম প্রিয়তম মোর

আল্লা পরম প্রিয়তম মোর, আল্লা ত দূরে নয়,
নিত্য আমারে জড়াইয়া থাকে পরম সে প্রেমময়।
পূর্ণ পরম সুন্দর সেই আমার পরম পতি,
মোর ধ্যান-জ্ঞান তনু-মন প্রাণ, আমার পরম গতি।
প্রভু বলি' কভু প্রণত হইয়া ধূলায় লুটা'য়ে পড়ি,
কভু স্বামী ব'লে কেঁদে প্রেমে গল' তাঁরে চুম্বন করি।
তাঁর উদ্দেশে চুম্বন যায় নিরুদ্দেশের পথে,
কাঁদে মোর বুকে ফিরে এসে' যেন সাত আসমান হ'তে।
তাঁরি সাধ পুরাইতে বলি, "আমি তাঁহার নিত্যদাস।"
দাস হয়ে করি তাঁর সাথে কত হাস্য ও পরিহাস।
রূপ আছে কিনা জানি না, কেবল মধুর পরশ পাই,
এই দুই আঁখি দিয়া সে অরূপে কেমনে দেখিতে চাই।
অন্ধ বধূ কি বুঝিতে পারে না পতির সোহাগ তার?
দেখিব তাঁহার স্বরূপ, কাটিলে আঁখির অন্ধকার।

কেমনে বলিব ভয় করে কি না তাঁরে,—
যাঁহার বিপুল সৃষ্টির সীমা আজিও জ্ঞানের পারে।
দিনে ভয় লাগে, গভীর নিশীথে চলে' যায় সব ভয়,
কোন্ সে রসের বাসরে লইয়া কত কী যে কথা কয়!
কিছু বুঝি তা'র, কিছু বুঝি না ক, শুধু কাঁদি আর কাঁদি;
কথা ভুলে' যাই, শুধু সাধ যায় বুকে লয়ে তারে বাঁধি।
সে প্রেম কোথায় পাওয়া যায় তাহা আমি কি বলিতে পারি?
চাতকী কি জানে কোথা হ'তে আসে তৃষ্ণার মেঘ-বারি?
কোনো প্রেমিকা ও প্রেয়সীর প্রেমে নাই সে প্রেমের স্বাদ,
সে প্রেমের স্বাদ জানে একা মোর আল্লার আহ্লাদ।

তাঁরে নিয়ে খেলি, কভু মোরে ফেলি' যেন দূরে চ'লে যায়,
সাজানো বাসর ভাঙি' অভিমানে ফেলে দি' পথ-ধূলায়!
বিরহের নদী ফোঁপাইয়া ওঠে বিপুল বন্যা-বেগে,
দিন গুণে' কত দিন যায় হায়, কত নিশি যায় জেগে'!
চমকিয়া হেরি কখন অশ্রু-ধৌত বক্ষে মম
হাসিতেছে মোর দিনের বন্ধু, নিশীথের প্রিয়তম!

আমি কেঁদে বলি, "তুমি কত বড়, কত সে মহিমময়,
মোর কাছে আস,—শাস্ত্রবিদেরা যদি কলঙ্কী কয়!
নিত্য পরম পবিত্র তুমি, চির প্রিয়তম বঁধু,
কেন কালি মাখ পবিত্র নামে, মোরে দিয়ে এত মধু!
মোরে ভালোবাস বলে' তব নামে এত কলঙ্ক রটে,
পথে ঘাটে লোকে কয়, যাহা রটে, কিছু ত সত্য বটে!"

তুমি বল, "মোর প্রেমের পরশ-মাণিক পরশে যারে,
আর তা'রে কেউ চিনিতে পারে না, সোনা বলে' ডাকে তারে।
তাহার অতীত, তার স্বধর্ম মুহূর্তে মুছে' যায়,
তবু নিন্দুক হিংসায় জ্বলে' নিন্দা করে তাহায়!"

"সে কি কাঁদে," কহে শাস্ত্রবিদেরা। মোর প্রেম বলে, "জানি,
আমার চক্ষে বক্ষে দেখেছি না-দেখা চোখের পানি।
তাঁর রোদনের বাণী শুনিয়াছি বিরহ-মেঘলা রাতে,
ঝড় উঠিয়াছে আকাশে তাঁহার প্রেমিকের বেদনাতে!"

আমি বলি, "এত কৃপাময়, এত ক্ষমা-সুন্দর তুমি,
মানুষের বুকে কেন তবে এই অভাবের মরুভূমি?"

প্রভুজি বলেন, “মোর সাথে ভাব করিতে চাহে না কেউ ;
‘আড়ি’ ক’রে আছে মোর সাথে, তাই এত অভাবের ঢেউ।
ভিখারীর মত নিত্য ওদের দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাকি,
‘আমারে বাহিরে রেখো না’ বলিয়া কত কেঁদে’ কেঁদে’ ডাকি।
আমারে তাহারা ভাবে, আমি অতি ভয়াল ভয়ঙ্কর ;
আমি উহাদের ঘর দিই, হায়, আমারে দেয় না ঘর !
আমার চেয়ে কি পরমাত্মীয় মানুষের কেহ আছে !
আমি কাঁদি, হায়, পর ভেবে’ মোরে ডাকে না তাদের কাছে।
ভয় ক’রে মোরে হইয়াছে ভীরু, যে চায় যা’ তা’রে দিই,
জড়ায়ে ধরিতে চায় যে আমারে, তা’রে বুকে তুলে’ নিই।
সব মালিন্য, সব অভিশাপ, সব পাপ তাপ তা’র
আমার পরশে ধুয়ে’ যায়, আর করি না তার বিচার।
প্রতি জীব হ’তে পারে মোর প্রিয়, শুধু মোরে যদি চায়,
আমারে পাইলে এই নর-নারী চির-পূর্ণতা পায় ”
হেরিনু, চন্দ্র-কিরণে তাঁহার স্নিগ্ধ মমতা ঝরে,
তাঁহারি প্রগাঢ় প্রেম প্রীতি আছে ফিরোজা আকাশ ভরে’।
তাঁহারি প্রেমের আবছায়া এই ধরণীর ভালোবাসা,
তাঁহারি পরম মায়া যে জাগায় তাঁহারে পাওয়ার আশা।
নিত্য মধুর সুন্দর সে যে নিত্য ভিক্ষা চায়,
তাঁহারি মতন সুন্দর যেন করি মোরা আপনায়।
অসুন্দরের ছায়া পড়ে তাঁর সুন্দর সৃষ্টিতে,
তাই তাঁর সাথে মিলন হ’ল না কভু শুভ-দৃষ্টিতে।
আমরা কর্ম করি আমাদের স্বকল্যাণের লাগি,’
তিনি যে কর্মে নিয়োগ করেন, সেথা হ’তে ভয়ে ভাগি !
মোরা অজ্ঞান তাই তিনি চান, তাঁরি নির্দেশে চলি ;
তাঁহার আদেশ তাঁরি পবিত্র গ্রন্থে গেছেন বলি’।

সে কথা শুনি না, পথ চলি মোরা আপন অহঙ্কারে,
তাই এত দুখ পাই, এত মার খাই মোরা সংসারে।
চলে না তাঁহার সুনির্দিষ্ট নির্ভয় পথে যারা,
অন্ধকারের গহ্বরে পড়ে' মার খেয়ে মরে তা'রা।
তাঁর সাথে যোগ নাই যার, সেই করে নিতি অভিযোগ;
তাঁর দেওয়া অমৃত ত্যাগ ক'রে বিষ করে তা'রা ভোগ।
ভিক্ষা করিয়া তাঁর কৃপা কেহ ফেরেনি শূন্য হাতে,
যারা চাহে নাই, তারাই তাঁহারে নিন্দে অবজ্ঞাতে।
কার করুণায় পৃথিবীতে এত ফসল ও ফুল হাসে,
বর্ষার মেঘে নদ-নদী-স্রোতে কার কৃপা নেমে' আসে?
কার শক্তিতে জ্ঞান পায় এত, পায় যশ সম্মান,
এ জীবন পেল কোথা হ'তে, তার পেল না আজিও জ্ঞান।

তাঁরি নাম লয়ে বলি, "বিশ্বের অবিশ্বাসীরা শোনো,
তাঁর সাথে ভাব হয় যার, তার অভাব থাকে না কোনো।"
তাঁহারি কৃপায় তাঁবে ভালোবেসে,' ব'লে আমি চ'লে যাই,
তাঁরে যে পেয়েছে, দুনিয়ায় তার কোনো চাওয়া-পাওয়া নাই।
আর বলিব না। তাঁরে ভালোবেসে' ফিরে' এসে মোরে বলো,
কি হারাইয়া কি পাইয়াছ তুমি, কি দশা তোমার হ'লো!

চির নির্ভয়

আমি   পেয়ে আল্লার সাহায্য হইয়াছি চির-নির্ভয়,
আল্লা যাহার সহায় তাহার কোনো ভয় নাহি রয়!
কোনো বন্ধন বাধা নাই তার কোনো অভিযান-পথে,
যত বাধা আসে তার কোটি গুণ শক্তি উর্ধ্ব হ'তে
আল্লার সেই বান্দার বুকে স্রোত-সম নেমে আসে!
হাতে তার সংহারী-তলোয়ার নেচে ওঠে উল্লাসে!

অবিশ্বাসীরা শোনো শোনো সবে জন্ম-কাহিনী মোর,
আমার জন্ম-ক্ষণে উঠেছিল ঝঞ্ঝা-তুফান ঘোর!
উড়ে গিয়েছিল ঘরের ছাদ ও ভেঙেছিল গৃহ-দ্বার,
ইসরাফিলের বজ্র-বিষাণ বেজেছিল অনিবার!
'আল্লাহু আকবর'-ধ্বনি শুনি প্রথম জনমি' আমি,
আল্লাহ নাম শুনিয়া আমার রোদন গেছিল থামি'।
সেই পবিত্র ধ্বনি রণরণি' উঠেছে এ ধমনীতে
প্রতি মুহূর্তে চেতন ও অচেতন আমার এ চিতে।
জন্মক্ষণের সেই ঝড় মোরে টেনে' এনে গৃহ হ'তে
লইয়া ফিরেছে কত অনন্ত অজানা অদেখা পথে।
কত গিরি কত অরণ্য কত সাগর মরুর পারে
জন্মক্ষণের বিষাণ আজান শুনিয়াছি বারেবারে।
কত দারিদ্র্য অভাব দুঃখ আঘাত দিল সে পথ,
তবু পাইয়াছি আল্লার অহেতুক কৃপা-রহমত!

নিত্য-যুদ্ধ করেছি বাধার সাথে চির-নির্ভীক,
মোর পরিচয় আমি জানি, আজন্ম-সৈনিক!

কোনো ভয় মোরে ফিরাতে পারেনি মোর 'আগে চলা' থেকে,
কে যেন স্বপ্নে জাগরণে মোর নাম ধ'রে গেছে ডেকে'।
পিছু-ডাকে সাড়া দিইনি কখনো, দেখিনি পিছন পানে;
শুনিতাম কার মহা-আহ্বানে, কাহার প্রেমের টানে
কেবলই অগ্রপথে চলিয়াছি, কে যেন রে অনুরাগে
কেবলই কহিত, "হেথা নয়, ওরে আগে চল আরো আগে!"
যত বিদ্রোহী বিপ্লবী ছিল মোর প্রিয়তম সখা,
এদেরই বক্ষে আশ্রয় পেত এই চির-পলাতকা।
নিতি হাহাকার উঠিত এ বুকে, কাহার মহা-বিরহ
অসহ নিবিড় বেদনা কেন যে জাগাইত অহরহ।
সে কি আল্লাহ্? পরম পূর্ণ আমার পরম স্বামী?
সে কি মোর চির-চাওয়া পূর্ণতা? সে কি আমি? সে কি আমি?
দ্বন্দ্ব বাঁধিত তাঁহাতে আমাতে, কত যে মন্দ ভালো
কভু নিত মোরে ভীষণ তিমিরে, কভু দিত জ্যোতি আলো।
কক্ষ-চ্যুত গ্রহ ধূমকেতু-সম চলিয়াছি ছুটে,
যেতে' যেতে' কত ভুল-কণ্টক ফুল উঠিয়াছে ফুটে'।
কত অপরাধ পাপ করিয়াছি, স্মৃতি হ'তে তাহা আজ
চির-বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতীত ভেবে কি কাজ?
অতীতের মলিনতায় রুদ্ধ করেনি আমার পথ,
নিত্য নূতন গতিবেগে চলে আমার তৃষার রথ।
যে নদীতে স্রোত-প্রবাহ মরেনি, সাগরের তৃষা যার,
কোনো মালিন্য করিতে পারে না অশুদ্ধ জল তার।

পুত্র মরিল, লুটায়ে কাঁদিনু। প্রথম পুত্রশোক!
সেই মুহূর্তে হেনার সুবাস আনিল চন্দ্রালোক।
ভুলিনু পুত্রশোক, ডুবে গেল সেই সুরভিতে মন:
বন্ধুরা দেখে' কহিল, "পিতা, না পাষাণ এ অচেতন?"

যে যায় আমার সম্মুখ হতে চিরতরে সে হারায়,
সেই মোর সাথী প্রবল গতিতে যে আমার সাথে ধায়।

আত্মা আমার চিরদিন কেঁদে' কয়—"দেরী হয়ে গেল ;
পূর্ণের সাথে শুভদৃষ্টির লগ্ন যে হ'য়ে এল !"

আগে চলি অনুরাগে, সহসা কে পিছু হতে মোরে টানে ?
এ কি শয়তান, এ কি অজ্ঞান ?—কি জানি…কে জানে।
কোথা হতে আসে অশান্তি নির্যাতন উপদ্রব
দেয়ালির আলো দেখে যেন ছুটে' আসে পতঙ্গ সব !
আজন্ম-সৈনিক আমি মোর নাহি ক মৃত্যু-ভয় ;
মানি না ক আমি বাধা ও বিঘ্ন মানি না ক পরাজয় !
মোর আরাধ্য মোর চির-চাওয়া পরম শক্তিমান,
মোরে বাধা দেবে কোন্ সে রুদ্র নরকের শয়তান ?

সহসা দেখিনু সম্মুখে যেন অসীম নীলাম্বরে
বিপুল বিরাট জ্যোতির্ধনুক উঠেছে আকাশ ভরে'।
সেই ধনুকের আমি যেন তীর, ধনুকের ছিলা ধরে'
শয়তান যেন টানিতেছে মোরে আঁধারের গহ্বরে।
পরম প্রবল আল্লার তেজ কোথা হতে যেন এল,
বহিতে লাগিল প্রলয়ঙ্কর ঝড় যেন এলোমেলো !
জন্মক্ষণের সাথী ঝড় এল বিষাণের আহ্বান,
"আল্লাহু আকবর" বলি' আমি ধনুকে মারিনু টান।
শয়তান শিরে মারিলাম লাথি, ছুঁড়িলাম আমি তীর ;
সেই তীর যেন স্পর্শ করিল মোর আল্লার নীড় !

শ্রমিক মজুর

ভদ্র সমাজে শ্রমিকের কথা 'কমিক' গানের মত
ভব্যের মত মোরা নহি নাকি সু-সভ্য সংযত।
আচারে পোষাকে আমাদের নাই ভদ্রের মত চাল,
চা'ল চুলা নাই, দারিদ্র্যে দুখে নাচার ও নাজেহাল।
আমাদের বাসা আমাদের ভাষা নিত্য নোংরা, দাদা!
তবুও বলিব, বাহিরে আমরা নোংরা, ভিতরে সাদা।
ভিতরের কালি ঢাকিতে তোমরা পরো হ্যাট, প্যাণ্ট, কোট,
শ্রমিকেরে যারা গরু বলে, মোরা তাদের বলি, "হি-গোট"!
মজুরের ভাষা বিঁধিবে অঙ্গে খেজুর-কাঁটার মত,
গলা কেটে রস খাও, হবে না ক অঙ্গ কাঁটায় ক্ষত?
যে বাড়ীতে থাক, তার প্রতি ইটে রক্ত মাখানো কার?
হৃদয় থাকিলে, দেখে' বেদনায় কাঁপিয়া উঠিত হাড়!
মজুর তোমার মজুরী করিয়া নজ্‌রাণা কত পায়?
চক্ষে তোমার লজ্জা থাকিলে ম'রে যেতে লজ্জায়!
শ্রমিকের সেবা আছে তোমাদের অণু পরমাণু ঘিরে,
ফসল না যদি ফলাতাম, খেতে টাকা গিলে', নোট ছিঁড়ে'?
যদি কাপড় না পরায়ে তোমারে করিতাম মোরা বাবু,
'পাঁচ আইনে' প'ড়ে পুলিশের হাতে হ'তে নাকি তুমি কাবু?
তোমারে কাপড় পরায়ে হয়েছি মোরা ন্যাংটেশ্বর,
মোরা নিরন্ন, বিবস্ত্র, দিয়ে তোমারে ভাত কাপড়!
তোমাদের হাতে শোভা পায় ছাতা ছড়ি আর হাত-ঘড়ি,
অভাবে ঋণের দায়ে আমাদের হাতে পড়ে হাত-কড়ি!
তোমাদের ঘরে থালা বাটী, মোরা পাই না কলার পাতা,
নুন নাই ঘরে, উনুন ধরে না, চালে ঘুণ-ধরা বাতা।

চরণ-কমল কোমল রেখেছে মোদের হাতের জুতা,
আমাদের পদ কাদা-গদগদ, খায় কাঁকরের গুঁতা।
তোমাদের খাটে মশারি, মাথায় বালিশে কাপাস তুলো,
রাতে আমাদের সাথী ছারপোকা, মশা আর আরশুলো।
রাজ-মিস্ত্রিরা রাজ-বাড়ী গড়ে, তোমরা সেখানে রাজা;
আমাদের চালে খড় নাই, এ কি পারিশ্রমিক সাজা?
আমরা রাজার অস্ত্র গড়িয়া নিরস্ত্র নির্জীব,
উহারা হয়েছে সৈনিক আর আমরা হয়েছি ক্লীব।
লাখ টাকায় এক পাই দান ক'রে ধনীরা হয়েছে দানী,
পিঁপ্ড়েরে দেয় চিনি খেতে আর ক্ষুধিতেরে খেতে পানি!
রচিয়া ধর্মশালা অধর্মী ধর্মেরে দেয় গালি,
রাম নাম ওরা শেখায় মাখায়ে মানুষেরে চূণ কালি!
আমরাই গড়ি হাতুড়ি, শাবল, বন্দুক, তলোয়ার;
আপনার পানে চেয়ে' দেখি আজ হাতে নাই হাতিয়ার!
যে হস্ত দিয়া হাতিয়ার গড়ি সে হাত এখনো আছে,
কোথা হ'তে এই অপমান, এই ভয় এল তবে কাছে?
যাহাদের হাতিয়ার গড়ি মোরা তাহাদেরি লাথি খাই,
মোদের রক্ত প্রাণ দান করি—আমাদেরই নাম নাই!
কেন রহি মোরা বস্তিতে অস্বস্তিতে চিরদিন?
কেন এ অভাব, রোগ, দারিদ্র, চিত্ত গ্লানি-মলিন?
শিক্ষা পাই না, দীক্ষা পাই না, ক্ষুদ্র কি তাই বলে'?
মোদের মাঝেও সকলের মত আত্মার জ্যোতি জ্বলে।
নহে আল্লার বিচার এ ভাই, মানুষের অবিচারে
আমাদের এই লাঞ্ছনা আছি বঞ্চিত অধিকারে।
আমরা মূর্খ বলিয়া বুদ্ধিমান করে প্রতারণা;
দেখেছি নিজের শক্তিকে আর লাঞ্ছনা সহিব না!
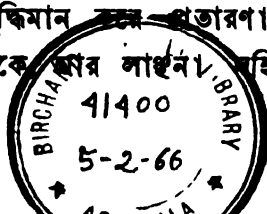
যে হাত হাতুড়ি দিয়া গড়িয়াছি প্রসাদ হর্ম্য-রাজি,
সেই হাত দিয়া বিলাস-কুঞ্জ ধ্বংস করিব আজি।
দেয় নাই ওরা পারিশ্রমিক মজুরের শ্রমিকের—
যা দিয়েছে, তাহে মেটেনি মোদের ক্ষুধা তৃষা ক্ষণিকের!
মোদের প্রাপ্য আদায় করিব, কব্জি শক্ত কর;
গড়ার হাতুড়ি ধরেছি, এবার ভাঙার হাতুড়ি ধর!

দৈনিক 'নবযুগ'
২৬শে নভেম্বর, ১৯৪১।

প্রেম ও প্রহার

'প্রেম' ও 'প্রহার' এই দু'টী মোর নীতি!
এই দু'টী মোর আল্লার দান, গাহি ইহাদেরই গীতি।
যারা নিপীড়িত যারা নির্জিত দুনিয়ায় নিশিদিন,
তাহাদেরি তরে পথে পথে আমি বাজাই প্রেমের বীণ।
উহাদের লাগি' নিতি ভিখ্ মাগি দুয়ারে দুয়ারে আমি,
ওদেরি মুক্তি চাহিয়া শক্তি যাচিতেছি দিবাযামী।
প্রাণ যার আছে তারি কাছে চাই উহাদের তরে প্রাণ,
যারা যত পারে উহাদের তরে করুক আত্মদান।
যুক্তিতে ঐ মুক্তি আসে না, তাই প্রেম দিয়ে ডাকি,
রস-সুন্দর রথ ত্যাগ ক'রে চলি পথ-ধূলি মাখি'।
আত্মারে যারা বন্দী রেখেছে না ক'রে আত্মদান,
যাহাদের ভোগ-বাসনা এনেছে অশেষ অকল্যাণ,
ভিক্ষা চাহিলে ভিক্ষা দেয় না সর্বহারার তরে,
জনগণে রাখি' উপবাসী ঘরে ধন সঞ্চিত করে,
ধর্ম যাদের শুধু বঞ্চনা আর বঞ্চিত করা,
মর্মে বেদনা নাই, শুধু যারা চর্ম-মাংসে ভরা,
তাদের প্রাপ্য প্রেম নয়, ওরা গলিবে না কভু প্রেমে,
প্রহার পাইলে উহাদের প্রেম গলিয়া আসিবে নেমে!
প্রেম ও জ্ঞানের কেন্দ্র দেখিবে দিব্য খুলিয়া যাবে,
যেদিন তাহারা আষ্টেপৃষ্ঠে নিদারুণ মার খাবে!
বহু তপস্যা করিয়া জেনেছি ভাই,
প্রেম জাগাইতে প্রহারের মত আমোঘ ওষুধ নাই!
বনের সিংহ বাঘ পোষ মানে, প্রেম-ভরে চাটে পা,
যদি অকরুণ প্রহারের চোটে হাড়ে হাড়ে ফোটে ঘা!

মানব দানব মদ-গর্বীরা সকলেই হয় বশ,
বক্ষে বসিয়া টুঁটি টিপে যদি খাওয়াও প্রহার-রস!
তাই প্রহারের সেনাদল চাই শৌর্য-দীপ্ত প্রাণ,
জরা ও মরায় তরায় যাহারা নিত্য-নৌজোয়ান।
পুরুষের বেশ, পৌরুষ নাই—দেখিবে ভারত-ভরা
ক্লৈব্য-ক্লিষ্ট, ভব্য আচার, সভ্য পোষাক পরা!
যুদ্ধের নামে নিঃশ্বাস হয় রুদ্ধ, হাত পা ভয়ে
উদার উদরে প্রবেশিতে চায় যেন আড়ষ্ট হয়ে!
ভূয়ো তর্কের তুর্কী-নাচন সহসা থামিয়া যায়,
বুদ্ধি পলায় কুদিস্থানে আশ্রয় খুঁজি', হায়!
বস্তা-বোঝাই-প্রস্তাব ভোট পথে যায় গড়াগড়ি;
জাতিভেদ ভুলে' কাঁদে সবে ক'রে রেল-রথে জড়াজড়ি।
হাসি পেট ভ'রে, রাশি রাশি এই বাসি-মড়াদের দেখে,'
আগুন জ্বলিবে ইহাদেরই দেহে প্রেমের তৈল মেখে'!
অন্তরে যার নিত্যোৎসবে যৌবন ফাগুনের,
আগুনোৎসবে মাতিতে পারে যে, ফাগুনোৎসবে সেই
রণ-উন্মাদ যৌবন-বন-বিহারী! মৃত্যু নেই
কোনো কালে তার! সেই ফিরে ফিরে আসে
এই পৃথিবীর যৌবন-বনে, উদ্দাম রণ-রাসে!
ইহাদেরই রণ-নৃত্যের তালে পদতলে হয় গুঁড়া,
ভোগ-বিলাসীর তখ্‌ত ও তাজ, লীলা-প্রাসাদের চূড়া!
ইহারাই প্রেমলোক হতে আসে প্রহার-অস্ত্র হাতে,
ইহারাই আনে বিজয়োল্লাস ধরণীর আঙিনাতে!
এরা দুর্জয়, এরা নির্ভয়, এরা আল্লার সেনা,
এরাই ফোটায় নিরাশার বনে আশার হাস্‌নাহেনা!

অসুন্দরের সংহার ক'রে সুন্দর করে ধরা,
ইহাদেরই তেজে অসি বশীভূতা, সাথী ও স্বয়ম্বরা।
এরা ঘনঘোর নিশীথ প্রহরী প্রবল প্রহার হাতে
দুর্বল মানুষের বল হয়ে লড়ে অমানুষ-সাথে!
সংঘবদ্ধ হ'য়ে আজ এরা এসেছে রঙ্গ-নটে,
আঁকিবে নতুন ছবি এরা পৃথিবীর প্রচ্ছদপটে!
যারা দুর্বল যারা অসহায়, এরা তাহাদেরি প্রেমে
পেয়ে আল্লার সহায়-শক্তি ধরায় এসেছে নেমে'।
বলহীনে এরা রক্ষা করিবে, বলীরে দানিবে বলি,
এক হাতে ভীম প্রহরণ, আর হাতে প্রেম-অঞ্জলি
লয়ে এরা জনগণের আলয়ে এসেছে চৌকিদার,
যার যা প্রাপ্য পাইবে এবার, প্রেম অথবা প্রহার!
প্রেম ও প্রহার—চমৎকার কি নয় আমার এ নীতি?
প্রহারে করিব সংহার, প্রেমে ঘুচাব সর্বভীতি।

মহাত্মা হাজী মোহাম্মদ মোহসিন

॥ ১ ॥

সালাম লহ, হে মহাত্মা মোহ্‌সিন।
ইতিহাসে নয়, মানব হৃদয়ে তব নাম চিরদিন
প্রেমাশ্রুজলে লেখা র'বে প্রিয় আত্মীয় স্মৃতি-সম,
মানবাত্মার নিত্য বন্ধু, মহাত্মা নিরুপম!

সারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ধরায় মানব-জন্ম লয়ে
মানুষ যাহারা হ'লো না, বেড়ায় ভোগৈশ্বর্য বয়ে,
যাহারা রক্ত-মাংস মেদ ও মজ্জা বৃদ্ধি ক'রে
পেল না শান্তি রস আনন্দ, পশু-সম গেল ম'রে,
সুন্দর সেই স্রষ্টার যারা ইঙ্গিত বুঝিল না,
বণিক-বুদ্ধি আত্মার বিনিময়ে নিল রূপা সোনা,
রূপ-ভোগী নর প্রেম চাহিল না, যে প্রেম রূপের প্রাণ,
আত্মা মলিন হয়ে গেল শোকে না পেয়ে' আত্মদান।
মেঘবারি, নদীজল থাকিতেও, কাদা-জল যারা খায়,
মদপায়ী হয়, মৌচাকে এত মধু থাকিতেও, হায়!
পথভ্রষ্ট সেই মানুষেরে তুমি পথ দেখাইলে,
রাজৈশ্বর্য বিলায়ে, ভিক্ষু, ভিক্ষা-পাত্র নিলে।
ভিক্ষা-পাত্র প্রেম-অমৃত পূর্ণ করিয়া তুমি
সিক্ত করিলে আত্মার কা'বা, দারিদ্র্য-মরুভূমি।

কোন্ আনন্দপ্রেয়সীরে পেয়ে, চির-ব্রহ্মচারী!
মিটিল তোমার তৃষ্ণা, করিয়া পান কোন্ রস-বারি?
মোহাম্মদের তত্ত্ব তুমিই শিখালে ভারতে আসি,'
ষড়ৈশ্বর্য পেয়ে মুসলিম বৈরাগী সন্ন্যাসী!

অর্থ তখনি বাধা হয় শুভ পরমার্থের পথে,
সে অর্থ যদি বঞ্চিত হয় পরার্থে ব্যয় হ'তে।
তখনি অর্থ আনে অনর্থ সুন্দর পৃথিবীতে,
তখনি অসুর দানব-জন্ম লভে মানবের চিতে।
স্বর্ণ হীরক মাণিক মুক্তা তখনি মুক্তি পায়
মানুষের লোভ বাসনা যখন তাদেরে নাহি জড়ায়।
অলঙ্কারের রূপে যবে মণি-মুক্তা বন্দী হয়,
অহঙ্কারীর প্রাসাদে তখনি প্রবেশ করে প্রলয়।
রৌপ্য স্বর্ণ, কণ্ঠ বাহু ও চরণ জড়ায়ে কহে—
"কাঁদিতে আসি গো, বাঁধিতে আসা তো মোদের ধর্ম নহে;
মোরা পৃথিবীর জমাট রক্ত, মোরা বিধাতার দান;
মোদেরে গলায়ে বিলাইয়া দাও, মুমূর্ষু পাবে প্রাণ।"
হে দ্রষ্টা, তুমি অচেতন জড় ঐশ্বর্যের বুকে
দেখেছিলে কোন্ চৈতন্যের জ্যোতিঃ যেন মহাদুখে
লোভীর পরশে গভীর বিষাদে পাষাণ হইয়া আছে;
মুক্তি তাদেরে দিলে দান করি' ক্ষুধিত জনের কাছে!
দশ লাখ টাকা থেকে দশ টাকা দিয়ে দাতা হয় যারা,
কারে বলে দান, তব দান দেখি শিখে যায় যেন তা'রা।
যারা দান করে, আপনারে তা'রা নিঃশেষে দিয়ে যায়,
মেঘ ঝরে যায়, ভাবে না তাহার বিনিময়ে সে কি পায়।
প্রদীপ নিজেরে তিলে তিলে দাহ ক'রে দেয় নিজ প্রাণ,
প্রদীপই জানে, কি আনন্দ দেয় তারে এই মহাদান।
যুগে যুগে এই পৃথিবী গেয়েছে সেই মানবের জয়,
বিলায়ে দিয়েছে মানুষেরে যারা স্বীয় সব সঞ্চয়।
তুমি আল্লার সৃষ্টিরে দিয়ে আল্লার নিয়ামত,
তাহার দানের সম্মান রাখিয়াছ, ওগো হজরত!

পরমার্থের মধু-মাখা তব অর্থ যাহারা পায়,
জিজ্ঞাসা করি, তা'রা কি তোমার মতো প্রেমে গলে' যায়?
ব্যর্থ হয়নি তব দান জানি, তোমার প্রেমের ঢেউ
এনেছে শক্তিবন্যা বঙ্গে হয়তো জানে না কেউ।
যারা জাগ্রত-আত্মা, তারাই করে যে আত্মদান,
তাহাতেই এই পৃথিবী পেয়েছে স্বর্গের সম্মান।
সৃষ্টির যারা সখা তাহারাই রাখে স্রষ্টার নাম,
সেই মহাত্মা তুমি মোহ্‌সিন, লহ আমার সালাম!

॥ ২ ॥

সকল জাতির সব মানুষের বন্ধু, হে মোহ্‌সিন!
এ যুগে তুমিই শোধ করিয়াছ এক আল্লার ঋণ॥

ভোগ করনি ক' বিপুল বিত্ত পেয়ে,
ভিখারী হইলে শুধু আল্লারে চেয়ে',
মহাধনী হ'লে আল্লার কৃপা পেয়ে,'
দুনিয়ায় তাই রহিলে কাঙাল দীন॥

মানুষের ভালবাসায় দেখিলে আল্লার ভালবাসা;
সৃষ্টির তরে কাঁদিয়া পূরালে তব স্রষ্টার আশা।

তব দান তাই ফুরায়ে নাহি ফুরায়,
বিত্ত হইল নিত্য এ দুনিয়ায়;
শিখাইয়া গেলেঃ মুসলিম তারে কয়
অর্থ যাহারে কিনিতে পারে না
যে নহে লোভ-মলিন॥

জামালউদ্দীন

সালাম, সালাম, জামালউদ্দীন আফগানী তস্‌লীম,
এশিয়ার নব-প্রভাত-সূর্য্য—পুরুষ মহামহিম ॥

সাম্য ওমর ফারুকের তুমি, আলীর জুল্‌ফিকার,
অসম সাহস খালেদের, মুসা তারেকের তলোয়ার,
নিরাকার কারবালা-প্রান্তরে তুলতুল্‌ আস্‌ওয়ার,
জড় ও ক্লীবের মাঝে এসেছিলে আদর্শ মুসলিম ॥

কারাগারে তুমি দেখিলে স্বপন কোন্‌ মহামুক্তির
ভাঙিয়া বুলন্দ-দরওয়াজা হলে মুক্ত-লোকে বাহির,
খান্‌ খান্‌ হয়ে টুটিল অমনি চরণের জিঞ্জীর,
রাঙিল আকাশ, বন্দীর বুকে জাগিল আশা অসীম ॥

শত লাঞ্ছনা জুলুম সহিয়া ভাঙিলে সবার নিঁদ,
বুকের রক্তে সুবহ্‌-সাদেক আনিয়া হ'লে শহীদ,
জাগিল কাবুল, মেসের, ইরাণ, তুর্ক, আরব, হিন্দ্‌,
তুষার-সাগরে হে চাঁদ আসিয়া জাগালে জোয়ার ভীম

সউদ্‌, কামাল, জগলুল্‌-পাশা, ইব্‌নে-করিম বীর
তোমার মানস পুত্রের রূপে এল উন্নত শির,
দ্বীনের জামাল, তরুণ শাহানশাহীর আলমগীর,
'প্রাচী'-র গর্ব্ব, সাম্য মৈত্রী মানবতার খাদিম ॥

'বুলবুল'
চৈত্র, ১৩৪৪।

মাওলানা মোহাম্মদ আলী

আধেক হিলাল ছিল আস্‌মানে, আধেক হিলাল দুনিয়ায়,
দুনিয়ার চাঁদ গেল আসমানে, দুনিয়া অন্ধকারে ছায়।
ছিল না আরবে ইরাণে তুরাণে ইরাকে মেসেরে সিরিয়ায়,
হিন্দুস্থানে ছিল সে রতন, হারাইয়া গেল সে-ও, হায়!
উহাদের ছিল ইব্‌নে-করিম, সউদ, কামাল, জগলুল্‌;
আমাদের ছিল মোহাম্মদ আলী—একাই সবার সমতুল।
উহাদের দেশ-নেতার আছিল লোক্‌-লশকর-বৈভব,
মোদের নেতার ছিল না সে সব, তবু গো তাঁহার ছিল সব।
ছিলনাকো তেগ্‌-হাতিয়ার তার, আছিল লেখনী আর দিল,
অভয় বাণীর ভরসা লইয়া তাড়ায়েছে তবু আজাজিল।
সে ছিল ফকির মুসাফির শুধু, ভিক্ষার ঝুলি ছিল যার,
তবু তারি পায়ে করেছে সালাম কামান গুলি ও তরবার।
দুশমন-বুকে বসি' নির্ভীক করিয়াছে তার সাথে রণ;
করেনি গণনা সে ছিল একাকী, দুশমন ছিল অগণন।
দু'নয়নে তার নয়নের মণি ছিল গো ধর্ম আর দেশ,
তাহারি লাগিয়া সে হ'ল ভিখারী, ধূলায় ফেলিয়া রাজবেশ।
রাজার রাজারে মেনেছে সে শুধু, মানেনি সে মেকি রাজাকে,
সেই শক্তিতে হেনেছে সে লাজ রাজার হাজার সাজারে।
ছিল আওরঙ্গজেবী-দ্বীনি জোশ, আকবরী-দিল্‌ মিলনের,
ছিল কমরেড্‌, ছিল হামদর্দ্দ, দীন দরিদ্র সকলের।
'মোহাম্মদে'র ইসলাম-প্রীতি, 'আলী'র শৌর্য্য বাহুবল
ছিল গো যাহাতে আজি অসময়ে সেই ছেড়ে গেল ধরাতল।
নাইকো মক্কা, মদিনায়ও আজ এমন নিশান বর্দ্দার,
নাই ইসলাম-জাহানে গো আজ এমন দ্বীনি-সর্দ্দার।

গেছে বাদশাহী শাহ্-ই-তখত, সে দুঃখ ছিনু ভুলিয়া
যার ভরসায়, তাহারেও হায় বেহেশ্ত লইল তুলিয়া।
মোদের জীবনে দেখিনু আমরা দুঃসহ শোক—কিয়ামত,
ধূলিসার মাটি রহিল পড়িয়া, আগুনে পুড়িল নিয়ামত।
মোদের হৃদয়-শাহানশাহ্ আজ চলে গেল, অরাজক দেশ
যৌব রাজ্যে অভিষেক করি কারে, কই সেই দরবেশ।
নাই নাই কেহ নাইরে তেমন, ক্রন্দন ওঠে চারিধার,
মোদের ভাগ্য-গগনে বুঝি গো থামিবে না মেঘ-বারিধার।
এ পতাকা বয়ে চলিবে কে আর, ভারতে তেমন নাই বীর,
হিন্দু কাঁদিছে 'গুরু গেল' বলি, মুসলিম কাঁদে, 'গেল পীর।'

আজো পরাধীন সোনার ভারত, হেথায় তাঁহারে আনিস্‌নে;
চির-স্বাধীনতা পথের পথিকে যেতে দে, হেথায় টানিস্‌নে।
বদ্ধ খাঁচায় আঘাত হানিয়া আজিকে ক্লান্ত পাখা যে ওর,
জাগাস্‌নে আর, ঘুমায়েছে ও-যে, কেটেছে খাঁচার বাঁধন-ডোর।
বন্ধনহীন নিঃসীম নভ ডাকিয়াছে, ওরে ছাড়িয়া দে;
তোরা পিঞ্জরে বন্দী করিয়া মুক্ত পাখীরে ডাকিস্‌নে,
যুঝিয়া যুঝিয়া শ্রান্ত সে বড়, ডাক ছেড়ে তোরা কাঁদিস্‌নে।
যে-দেশের পথ ভুলে এসে ছিল, যেতে দেরে সেই জেরুজালেম
সে দেশে নাইরে বন্ধন, নাই পিঞ্জর কারা, নাই জালেম।
তারপর, মোরা উহারি মতন পাখা ঝাপটিয়া পিঞ্জরে
ঐ এক পথে যাব মুসাফির চির-মুক্তির বন্দরে।

'সওগাত'
১৩৩৮।

নবীনচন্দ্র

অঞ্জলি পূরিয়া মম ভাগীরথী-নীরে
দাঁড়ায়েছি আসি' তব কর্ণফুলী-তীরে।
বীর-কবি! লহ লহ এ মোর তর্পণ—
অপরিচিতের এই পূজা-নিবেদন!
আসিনি একাকী আমি এই তীর্থ-পথে
দানিতে তর্পণ আজি! মম দেশ হ'তে
এসেছে ভারতচন্দ্র, কবি চণ্ডীদাস,
জয়দেব, কাশীরাম, সাথে কৃত্তিবাস
এসেছে কঙ্কণ কবি। তাঁরা উর্ধ্বে রহি,
পাঠায়েছে অর্ঘ্যভার। আমি তাহা বহি'
আসিয়াছি তব পুণ্য চট্টলায় একা,
তাহাদেরি অর্ঘ মম এই অশ্রুলেখা!

আজি বিচ্ছেদের এই স্মরণ-সন্ধ্যায়
তব কর্ণফুলী-তীরে সমুদ্র-বেলায়
উঠিল মহান এক মিলন-মন্দির।
পশ্চিমের ভাগীরথী অজয়ের নীর
আসিল তোমার দেশে বন্দিতে তোমায়।
আসিল পশ্চিম-বঙ্গ পূর্ব-বাঙ্গালায়
শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিতে। দিতে অর্ঘ্য হবি
এ স্মরণ-তীর্থে এল কোরানের কবি।
ওঠে অভিনব মহা-মিলনের গীত
আজিকে শ্মশানে তব। আজি পুরোহিত

৩

তোমার এ শ্রাদ্ধ-তীর্থে মুস্‌লিম-তনয়।
প্রাণ আজি হ'ল জয়ী, ভেদবুদ্ধি লয়
আজ হতে হ'ল, কবি! চিতা-ভস্মে তব
উঠিল মিলন-তাজ আজি অভিনব!

বিদায়-দিনের তব ভবিষ্যৎ-বাণী
'আজিকে বিজয়া মোর।' দিল আজি আনি'
সার্থক করিয়া বর হেথা অকস্মাৎ—
হেথা ভায়ে ভায়ে আজ মিলাইল হাত।
এ গৌরবে ধন্য শুধু আমি নহি আজ—
এ-গর্ব তাদের যারা সৃজিল এ তাজ।

হে কবি! জানিছ তুমি আর আমি জানি—
যে-লোকে বিহার করে বাণী বীণাপাণি
সেথা আছে আমাদের চির পরিচয়।
তাই এই স্মৃতি-তীর্থে নাহি মোর ভয়
আনিতে অঞ্জলি মোর দানিতে তর্পণ।
এ-লোকে যাহারা তব আত্মীয় স্বজন—
আমি জানি তাহাদের সকলের হতে
অধিক আত্মীয় আমি। না-জানার পথে
আমাদের জানাজানি। মোর অধিকার
হে কবি, নতুন নহে অর্ঘ্য দানিবার।
কবির ধেয়ান-লোকে স্বরগ-কাননে
পরম আত্মীয় বন্ধু মোরা দুই জনে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর হে নবীন ব্যাস!
"রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র", তোমার "প্রভাস"

বনানীর আঁধার মুঠে
কার রং-মশাল টুটে,
জোনাকীর ফিনিক ফুটে,
যেন চাঁদ-চূর্ণ উড়ে !
সে কোথায় কোন্ মহলে
আলোকের পায়রা দোলে,
অধারের গরুড় চলে
প্রভাতে কোন পাহাড়ে ?

এ মাটির কোন সে ফাঁকে
কুসুমের গন্ধ থাকে,
ফলেদের পীযূষ রাখে
সুরসাল কোন সে ভাঁড়ে ?

সে কে ভাই রাখাল ছেলে
এত সব খেলনা ফেলে
নিরালায় একলা খেলে
উদাসীন গহন-ছায়ায় ?

নিশিদিন কানন গিরি
তাহারেই খুঁজে ফিরি,
বাঁশী তার আমায় ঘিরি
কেবলই যায় কেঁদে যাঃ ॥

সারস পাখী

(১)

সারস পাখী ! সারস পাখী !
আকাশ-গাঙের শ্বেত কমল !
পুষ্প-পাখী ! বায়ুর ঢেউ-এ
যাস্ ভেসে তুই কোন্ মহল ?
তোরে ময়ুর-পঙ্খী করি'
পরীস্থানের কোন্ কিশোরী
হাল্কা পাখার দাঁড় টেনে যায় ?
নিম্নে কাঁপে সায়র-জল।
গগন-কূলে ঘুম ভেঙে চায়,
মেঘের ফেণা অচঞ্চল !

(২)

দীঘির তীরের কুমুদ-কুঁড়ি,
রাঙা চরণ মৃণাল তোর।
তুলতে এসে চম্‌কে ওঠে
মাঠের রাখাল থল্-ভোমোর।
পালক-মুকুল পাপড়ি খুলি'
যাস উড়ে তুই লহর তুলি'
খোকা ভাবে চাঁদ উড়ে যায়,
চাঁদ ভাবে তুই ফুল-চকোর।
চঞ্চুতে তোর জল ঢেলে দেয়
নীল যমুনার মেঘ-কিশোর !

(৩)

কানন-শাখার নীড়-খসা ফুল !
তুল্‌বি রে তুই কণ্ঠে কার ?
দিগ্‌বালিকার মুক্তামালা,
ভাদর-দীঘির চন্দ্রাহার !
আকাশ-খুকীর রূপার ঘুঙুর !
যাস্‌ নেচে তুই ঝুমুর ঝুমুর,
তমাল ভাবে শুভ্র ময়ূর,
ময়ূর ভাবে মেঘ-তুষার।
দিবা-শেষের বিদায়-বাণী
আনন্দগান শ্বেত উষার॥

গজল-নাতিয়া

কুল্‌ মখলুক গাহে হজরত
বালাগাল উলা বেকামালিহি।
আঁধার ধরায় এলে আফতাব
কাশাফাদ্দুজা বেজামালিহি ॥

রৌশ্‌নীতে আজো ধরা মশ্‌গুল,
তাই তো ওফাতে করিনা কবুল,
হাস্‌নাতে আজো উজালা জাহান
সাল্লু আলায়হি ওয়া আলিহি ॥

নাস্তিরে করি নিতি নাজেহাল্‌—
জাগে তৌহিদ দ্বীন্‌-ই-কামাল,
খুশ্‌বুতে খুশী তুনিয়া বেহেশ্‌ত্‌—
সাল্লু আলায়হি ওয়া আলিহি ॥

ণ আবতুল কাইউমের সৌজন্যে।

দিওয়ান-ই-হাফিজ

গজল—১

হাঁ, এয়্ সা'কী শরাব্ ভর্ লাও বোলাও পেয়ালী
চালাও হর্দম।

প্রথম প্রেম-পথ সহজ সুন্দর শেষের দিক তার
ঢালাও-কর্দ্দম্।

কসম্ তার ভাই ভোরের বায় ভায় অলক্ গুচ্ছের
যে বাস কান্তার,

বহুৎ দিল্ খুন করলে কুন্তল কপোল-চুম্বী
চপল ফাঁদ্দার।

যদিই কন্ তোর সাগ্নিক ঐ পীর মুসল্লায় কর্
শরাব-রঙ্গীন্,

পথেই রথ যার অচিন নয় তার কোথায় পথ ঘাট
খারাব সঙ্গীন্।

আরাম সুখ মোর হারাম বিলকুল পথের মঞ্জিল্
পিয়ার মুল্কের,

নকীব হরদম্ হাঁকায়, হাম্দম্ পথিক! দূরপথ
গাঁঠ্রী তুল্ ফের্।

অন্ধকার্ রাত্, উর্ম্মি সংঘাত্, ঘূর্ণাবর্ত্তও
তুমুল গর্জ্জে,

বেলায় বাস্ যার বুঝবে ছাই তার পথের ক্লেশ মোর
সমুন্দর্ যে।

তামাম মোর কাম্ শুধুই বদ্নাম নিজের দোষ ভাই
নিজের দোষ্ সে,

গোপন দূর ছাই রয় কি নাম তায় রাজ-সভায় যার
চর্চ্চা জোর-সে ?

প্রসাদ্ চাস ? বাস, গাফিল হোস্‌নে হাফিজ হরদম
হাজির মজ্‌লিশ !

এ-সব তঞ্চট্ ঝক্কি ঝঞ্ঝট্ ছোড়্ দে, তারপর
পিয়ার খোঁজ নিস !

মোসলেম ভারত
১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ ।

১নং গজলের টীকা :—সাকী—যে শরাবের পেয়ালা হাতে দেয়। শরাব—মদ (দ্রাক্ষারস)। হর্‌দম্—সর্ব্বদা। কসম্—দিব্য। দিল্—হৃদয়। ফাঁদ্-দার—কোঁকড়া। পীর—গুরু। মুসল্লা—বিছিয়ে নামাজ পড়ার মাদুর বা কাপড়। সঙ্গীন—দুস্তর। হারাম—নিষিদ্ধ। বিলকুল—সমস্ত। মঞ্জিল—পান্থনিবাস। পিয়ার—প্রিয়ার। মুল্‌কের—মুল্লুকের। নকীব—তূর্যবাদক। হাম্‌দম—বন্ধু। সমুন্দর—সমুদ্র। তামাম—সমস্ত। কাম—কাজ। জোর্-সে—খুব জোরে। গাফিল—অলস। হাফিজ—কবির নাম। মজ্‌লিশ—সভা। তঞ্চট—গোলমাল। ছোড়্ দে—ছেড়ে দাও।

গজল—২

মূল কবিতার ছন্দ :

	মাহে হোসন্ আজ্	রুয়ে রোখ্ শা
		নে শুমা
আবরুয়ে	খুবি আজ চা—	হে জনখ্ দা
		নে শুমা !
হে মোর সুন্দর !.	চাঁদের চাঁদ মুখ্	তোমার রৌশন্
		রূপ দেখেই ;
রূপের জৌলুস	তোমার টোল্‌দার্	চিবুক্ গণ্ডের
		কূপ্ থেকেই
ওষ্ঠে প্রাণ। হায়	দেখতে তা'ও চায়	গোল্-বদন ঐ
		ঘোম্‌টা-হীন,
জানাও ফরমান	জ্বল্‌বে আর না	নিব্‌বে জান্‌টার
		মোম্‌টা ক্ষীণ।
তোমার কেশপাশ্	আমার দিল্, বাস্—	জম্‌বে জোট সেই
		এক জা'গায়
আরজু এই ক্ষীণ্	মিট্‌বে কোন দিন ?	আর না বিচ্ছেদ্—
		দেক্ লাগায়।
নার্গিস-অক্ষি।	হরলে সব সুখ্	তোমার নয়নার
		অত্যাচার,
মস্ত চাউনীর	হস্তে তাই কই	যাক সতীত্বও
		হত্যা ছার।
খুল্‌বে এইবার	নয়ন পাত্ তার	বদ্-নাসিব্ মোর
		নিঁদ্-আতুর,

আজ যে প্যারীর উজ্‌লি স্মিরতির আন্‌লে নির্ঝর
ক্ষীণ্‌ আঁসুর !
পাঠিয়ে ভোর বায় ফুল্ল ফুল্‌ তুল্‌ তোমার গণ্ডের
ফুল্‌-তোড়া !
যদিই পাই তায় তোমার বোস্তাঁর খোশ্‌বুদার খাক্‌
ধূল্‌ থোড়া !
সে খবর দিল- দার পিয়ার সই বক্ষে আজ মোর
জোর ব্যথা,
মাথার দিব্যি রইলো সইলো জরুর ক'স তায়
মোর কথা !
জাম্‌শেদেরদর- বারের সা'কী ! বাড়ুক পর্‌মাই,
মদ্য-পিণ্ড্‌ !
তোমার হস্তে এ মদের ভাঁড় মোর পুর্‌লো নাই ভাই
যদ্যপিও !
'য়্যাজ্‌দ্‌' মুল্‌কের বাসিন্দায় সব্‌ বল্‌বে, বন্ধু
ভোর-সমীর !
(ভরুক্‌ ময়দান্‌ লুটাক পায় পায় অকৃতজ্ঞের
খণ্ড শির !)
"বহুৎ দূর পথ্‌ বহুৎ বিচ্ছেদ স্মৃতির ভুল হায়
হয়নি তায়,
তাদের বাদশার গোলাম আজকেও তাদের খোশ্‌নাম
কয় সদাই !"
চল্‌তে মোর পথ সাম্‌লো প্যারী আঁচর, খাক্‌ আর
খুন হ'তে ;
তোমার এশকের নিরাশ খুন্‌-দিল লোহু'য় পথ্‌ এ
পূর্ণ যে !

এয়্ শাহান-শাহ্ ওয়াস্তে আল্লার শক্তি দাও এই,
অহর্নিশ্,
আস্মানের ন্যায় চুম্বি অম্নি তোমার খাস রং
মহল্-শীষ!
আশিষ্ চায় এই 'হাফিজ' হর্দম্, কও 'আমিন্' সব
খুব্ মনে—
"লাল শিরীন্ ঠোঁট পিয়ার রোজ পাই, ভারাই লাখ্ লাখ্
চুম্বনে।"

মোসলেম ভারত
১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩২৭।

২নং গজলের টীকা:—রৌশন—জ্যোতির্ময়। টৌল্দার—টোল খাওয়া। গোল-বদন—পুষ্প-পেলব সুন্দর মুখ। ফরমান—হুকুম। মোমটা-ক্ষীণ—ক্ষীণ প্রদীপটা। আরজু—প্রার্থনা। দেক্—বিরক্তি। নার্গিস-অক্ষি—নার্গিস ফুলের মত সুন্দর চোখ যে নারীর। মস্ত চাউনী—ঘোর ঘোর চটুল চাওয়া। নিঁদ-আতুর—নিদ্রাতুর। প্যারী—প্রিয়তম। উজ্লি—উজ্জ্বল। স্মিরতির—স্মৃতিতে। আঁসু—অশ্রু। বোস্তাঁ—কুঞ্জ। খোশ্বুদার—সুরভিত। খাক্—মৃত্তিকা। থোড়া—সামান্য। দিলদার পিয়া—দরদী প্রিয়া। জরুর—নিশ্চয়ই। জামশেদ—পারস্যের বিখ্যাত বাদশাহ ছিলেন এবং এঁরই আমলে প্রথম রাজ-দরবারে শরাবের জাম বা মদ্যের পিয়ালার প্রচলন হয়। এর 'জামশেদ' নাম হ'তেই পারসী 'জাম' (শরাব-পেয়ালা) কথার উৎপত্তি। মস্ত-পিও—মস্ত পান কর। য়্যাজ্দ্—পারস্যের এক প্রদেশের নাম, এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই নাকি ফকির দরবেশ ছিলেন। খোশ্ নাম—প্রশংসা। খুন-রক্ত, স্থান বিশেষে রক্তাক্ত। এশ্ক—প্রেম। শাহান্শাহ—মহামহিম সম্রাট। ওয়াস্তে আল্লার—দোহাই আল্লার। চুম্বি—চুম্বন করি। খাস—প্রধান। রং-মহল-শীষ—রং-মহল বা প্রাসাদের চূড়া। আমিন্—তথাস্তু। লাল—চুনি-পান্নার মত টুক্টুকে। শিরীন—মধু ভরা।

গজল—৩

মূল কবিতার ছন্দ :

দিল মি রওদ	যে দস্তম্	সাহিব দিলা খোদারা !
হাত্ হ'তে মোর	হৃদয় যায়	দোহাই-বাঁচাও হৃদয়বান্ !
আফ্সোস ! আমার	গোপন সব	ফস্কে যে দেয় নিদয় প্রাণ।
দশদিনের এই	দুনিয়া ভাই	স্বপ্ন-কুহক কল্প-লোক ;
করতে ভালোই	বন্ধুদের,	বন্ধু, তোমার লক্ষ্য হোক্ !
বড় অনুকূল	চায়, এ নাও	ভগ্ন, মনেও শ্রান্তি হায় ;
হয়তো দু'বার	দেখবো ফের	সেই হারা মোর প্রাণ পিয়ায় !
শরাব্-সভায়	কুঞ্জে আজ	বুলবুলি বাঃ বোল বিলায়,
লাও প্রভাতের	মদের ভাঁড়,	মস্তানা সব্ জলদি আয় !
হাজার লাখ্ হে	মহান্-প্রাণ,	সালাম সালাম ধন্যবাদ !
দর্বেশ্ এ দীন	একটি দিন	প্রসাদ চায়, নাই অন্য সাধ।

দুই দুনিয়ার আরাম্ সব ব্যাখ্যা ভাই এই
এক্ কথায় ;

দোস্তে মধুর স্নিগ্ধ ভাষ, শত্রু যে—দাও
বক্ষ তায়।

সুনাম সুযশ লাভের পথ করলে হারাম,
হে দুর্ব্বোধ!

মন্দ বোধ্ হয় কু-নাম আজ ? বদ্‌লে দাও, বাস
এ দূর পথ !

জম্‌শেদের এই মদের গ্লাস সিকান্দারের
আয়না ভাই ;

দারার দেশের সকল হাল ঐ হের বাঃ,
ভায় না তায় ?

শির্ ঝোঁকা, নয় মোমের ন্যায় জ্বলবে,—সে কি
শরম কম ?

ঐ পিয়া যার পরশ ঘায় কঠিন শিলাও
নরম মোম।

বন্ধু দে' সব বৈতালিক গায় যদি এই
ফার্সী গীত্,

সন্ন্যাসী পীর্ ভাব্ মোহিত নাচবে ; এ গান্
সার্-নিহিত্।

ঐ খাঁটি মদ্ সুফীর দল পাপের মা কয় ?
আ দুত্তোর।

আইবুড়ো সব ছুক্‌রীদের ঠোঁট-চুমোরও
মধুর্‌তর !

হাত খালি ? বাস্ আয়াস কর্ আয়েশ করার,
শেখ সুখেও ;

পরশ-পাথর মত্ততার 'কারুণ' বানায়
ভিক্ষুকেও।
পরমায়ু দেয় মুমূর্ষুরে ফারেস দেশের
দিল্ পিয়ায়,
এয়্ সাকী, এই খোশ-খবর জ্ঞান-বুড়োদের
বলবি ভাই!
খাম্‌খা হাফিজ দেয়নি গা'য় শরাব-রঙীন্
ফুর্ত্তি এই;
আল্‌খেলা-পাক্ গায় হে শেখ! লাচার,—সার এই
ফূর্ত্তিটেই!

মোসলেম ভারত
১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা,
পৌষ, ১৩২৭।

৩নং গজলের টীকা:— নাও—নৌকা। মস্তানা—মাতাল, পাগল। সালাম—তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। দরবেশ—যে প্রার্থনা নিয়ে দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকে। দুই দুনিয়ার আরাম—ঐহিক পারত্রিক সুখ। হারাম—নিষিদ্ধ। সিকান্দার—মহাবীর আলেকজান্দার। সিকান্দরের আয়না—কথিত আছে যে, সিকান্দার বৈজ্ঞানিক উপায়ে এক অদ্ভুত আয়না নির্মাণ করেন; তাতে স্তাম্বুল শহর পর্যন্ত যেখানে যা হ'তো এই আয়নায় তা প্রতিবিম্বিত হ'য়ে দেখা যেত। দারা—পারস্যের এক বিখ্যাত সম্রাট। হাল—অবস্থা। শেখ—জ্ঞানী। 'কারুণ'—কুবের। ফারেস—পারস্য। পাক—পবিত্র।

মূল কবিতার ছন্দ :

সা- কী ব-নূরে বা-দা বরঅফ্‌
রোজে জা-ম এমা

মোর পাত্র মদ্য রোশ্‌নায়ে কর
রৌশন্‌ এয়্‌ সাকী !

গাও বান্দা, "মোদের পূরবে সব আশ্‌
দুনিয়া নয় ফাঁকী !"

মদ্‌ পাত্রে মোর আজ বিম্বিত ছবি
প্রিয়ার চাঁদ মুখের,

শোন্‌ বঞ্চিত যত হর্দ্দমই মদ্‌—
টানার স্বাদ সুখের !

ঝাউ- ছিপ্‌ছিপে তন্‌ নাঙ্গীদে' নাজ
নখ্‌রা সব্‌ ফুরোয়,

ক্ষীণ দেব্‌দারু-তনু মরালী পিয়ার
যেই হয় অভ্যুদয়।

সে যে মৃত্যুঞ্জয়ী শাশ্বত চির-
জাগ্রত প্রেম যার ;

আব- নশ্বর মম নাম তাই দোলে
কাল-বুকে হেম-হার।

মোর দিলরুবা' পিয়ার আঁখিয়ার বড়
মিঠি দিঠি আধ-ঘোর,

তাই চাউনীর ওরই হাতে সঁপা মোর
বাসনার বাগ-ডোর।

রোজ কিয়ামতে ভাই জিত্‌বে না,—আহা
দুঃখে গাল খুঁটি !

মোর হারাম মদকে ভণ্ড শেখের
হালাল দাল-রুটি।

কভু বন্ধুদের সে ফুলবাগে যদি
যাও দখিন্ হাওয়া।

মোর কান্তারও কাছে এই কথাটুকু
জরুর চাই যাওয়া,

বলে, প্রিয়তম! স্মৃতি জোর করে ছিছি
ভোলা কি কখনো যায় ?

ওগো আপনি সেদিনও আসিবে, আর না
দেখিবে স্বপনো তায়!

ওই পাৎলা ছুঁড়িরই প্রেমে দাগ বুকে
'লালা'-ফুল সম চিন্ ;

মম জালে ধরা দেবে মিলন-বিহগ
বাকী আর কত দিন ?

ওই সবজা দরিয়া আসমানের, আর
চাঁদের নৌকা সেই,

সব্ ডুব গিয়া ভয়া 'কওয়াম হাজি'র
মাল এ মদ্ গ্রাসেই।

ফেল অশ্রুবিন্দু শষ্য-কণিকা,
হাফিজ কাঁদ রে কাঁদ !

ওরে মিলন-পক্ষী হয়তো লক্ষ্য
করবে তা' হ'লে ফাঁদ !

মোসলেম ভারত
১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা
পৌষ, ১৩২৭।

৪নং গজলের টীকা :—রোশ্‌নায়—জ্যোতি। রৌশন—জ্যোতির্ম্ময় এয়্‌—ওগো। বান্দা—সভার গায়ক। নাজ-নখ্‌রা—ছলা-কলা। দিলরুবা—মনহরণকারী। রোজ কিয়ামত—শেষ বিচারের দিন। হালাল—শাস্ত্র-সিদ্ধ। বাগ-ডোর—লাগাম। ফুলবাগে—পুষ্পোদ্যান। জরুর—অবশ্য অবশ্য। লালা—এক রকম ফুল, এই ফুলেব বুকে একটা ক্ষত বা দাগ থাকে। দরজা—সবুজ। দরিয়া—সমুদ্র। কাওয়াম হাজি—কবি হাফিজের এক উজীর বন্ধু।

গজল—৫

কোথায় সুবোধ সংযমী, তা'র তুল এ মাতাল অপাত্রে ছাই!
তাদের পথ আর আমার এ পথ বহুৎ বহুৎ তফাৎ যে ভাই!
ধরম্ শরম? চুলোয় সে যাক! প্রেম সিরাজীর প্রেমিক এ জন্,
নীতির নীরস ঠোঁট চেপে শোন রোবাব-বীণের ঝিঁঝিট-বেদন।
মস্‌জিদে গে' শিখনু পরা ফেরেববাজীর কুর্ত্তি কালো;
ভাইরে আমার আতশ-পূজা শরাব-শিঁরীর ফূর্ত্তি ভালো।
মিলন্-চুমুর শিরীন স্মৃতি আবছায়া তাও হয়না মনে!
হায় কোথা সেই যাদুর মায়া, মান ক'রে জল নয়না-কোণে?
দোস্তের অরূপ রূপ-দরিয়ায় দুষমনে ভাই পায়না রতণ;
রবির শিখায় স্তিমিত প্রদীপ জ্বালতে সে ভাই খাম্‌খা যতন্।
সেবের মতন্ স-টোল চিবুক-কূপটী প্রিয়ার রাস্তাতে না?
আশেক পথিক, সামলে চলিস্! আস্তে! পড়েই যাস্ তাতে বা।
সুর্মা আঁখির অঞ্জন আমার, পীতম্, তোমার চরণ রেণু!
এই মদিনা মক্কা, হেথাই বাজবে আমার মরণ-বেণু।
আশ্ করোনা বন্ধু আমার, হাফিজ হ'তে চুম্-ভরা ঘুম,
শান্তি কী চীজ? আরাম কোথায়? কল্‌জেতে মোর জ্বলছে আগুন।

মূল কবিতার ছন্দ :

আগর আঁ তুর্ক শীরাজী বদস্ত আরদ দিলে মারা

যদিই কান্তা শিরাজ সজনী ফেরৎ দেয় মোর চোরাই দিল ফের,
সমরকন্দ আর বোখারায় দিই বদল তার লাল গালের তিলটের।
লে আও শাকী সারাব শেষটুক্ ! কোথাও নাই ভাই বেহেশতেও সে
নহর 'রোক্না-আবাদ্'-তীর আর এমন্ ঈদ্গাহ্, এ দেশ সেও সে!
বাঁচাও বন্ধু! নিলাজ চঞ্চল চটুল চুলবুল মুখ চোখ
তুর্কি সৈন্যের 'লুটের খাঞ্চা'র মতই বিলকুল লুটলে সুখ-লোক!
অপূর্ণ-ই মোর এশ্ক্ গুলবাগ তাতেই মশগুল ভোমর্ চঞ্চল;
হুর যে চায়না স-টোল লাল গাল; হরিণ চোখ, মুখ কোল ঢল ঢল।
আগেই জানতাম ব্যাকুল দিন দিন আকুল যৌবন হাসীন 'ইউসফ্',
প্রেমের টান তার নাশ্বে হ'রবে 'জুলায়খা'র্ সব শরীর গৌরব।
চলুক শেহলীর সরাব সংগীত, কালের কুঞ্জি নাই তলাস্ তার
না-হক্ কস্রৎ গ্রন্থি খুলবার রহস্যের এই রশির ফাঁসটার!
নীতির গীত শোন্ পীতম চঞ্চল! শান্ত সুন্দর তারই ঠিক্ প্রাণ,
জ্ঞানের বৃদ্ধের নীতির বশ যে সৎ কথায় যার প্রাণ-অধিক জ্ঞান।
মন্দ কও? আহ, তাতেই জান্ তর্র্! আবার গাল দাও হো মোর লক্ষ্মী;
গাল তো নয় ও, মিষ্টি শর্ব্বৎ ঢাল্চে পান্নার শিরীন ঠোঁটটী!
গজল গীত নয়, মুক্তো গাঁথ্চিস, হাফিজ আয়, ফের্ মধুর তান্ ধর!
তারার লাখ হার ছুড়বে বার বার অধীর আস্মান শুন্লে গান্ তোর্!

মোসলেম ভারত
১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।
মাঘ, ১৩২৭।

৬নং গজলের টীকা : রোক্‌না-আবাদ—হাফিজের জন্মস্থান। সিরাজ শহরে রোক্‌না আবাদ নামে এক কৃত্রিম ঝর্ণা ছিল, এখানে বসে তিনি গজল গাইতেন। ঈদ্‌গাহ—যে স্থানে ঈদের নামাজ পড়া হয়। এশ্‌ক্‌—প্রেম। গুল্‌বাগ—ফুল বাগিচা। হাসীন—নবম সুন্দর। ইউসুফ—এক পয়গম্বরের নাম, ইনি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ছিলেন বলে প্রকাশ। জুলায়খা—ইউসুফের প্রেমে উন্মাদিনী এক সুন্দরীর নাম। সেহ্‌লী—সখি।

অভিমানী

টুকরো মেঘে ঢাকা সে
ছোট্ট নেহাৎ তারার মতন সাঁজ-বেলাকার আকাশে

সে ছিল ভাই ইরাণ দেশের পার্ব্বতী এক মেয়ে !
রেখেছিল পাহাড়-তলীর কুটীর খানি ছেয়ে'
ফুল-মুলুকের ফুল-রাণী তার এক ফোঁটা ঐ রূপে ;
সুদূর হাওয়া পথিক হাওয়া ঐ সে পথে যেতে চুপে চুপে।

চম্‌কে কেন থম্‌কে যেত, শ্বাস ফেল্‌ত, তাকে দেখে' দেখে,
যাবার বেলায় বনের বুকে তার কামনার কাঁপন যেত রেখে'।
দুলে' দুলে' ডাকতো তা'রে বনের লতাপাতা,
তোর তরে ভাই এই আমাদের সারাটী বুক পাতা,
আয় সজনী আয় !
কইত সে 'সই' ! এমনই ত বেশ দিন-রজনী যায়,
তোদের বুক যে বড্ডো কোমল, তোরা এখন কচি,
কাজ কি ভাই এ কঠিন আমার সেথায় শয়ন রচি' ?
বলেই চোখের জল-কণাটীর লাজে
মানিনী সে বন্-বিহগী পালিয়ে যেত গহন বনের মাঝে।
কাঁদন—ভরা বিদ্রোহী সে মেয়ের চপল চলায়
শুকনো পাতা মরমরিয়ে কাঁদতো পায়ের তলায়।
দোল-ঢিলা তার সোহাগ বেণীর জরীন ফিতার লোভে
হরিণগুলি ছুটতো পাছে, কে আগে তায় ছোঁবে।
আচমকা তার নয়না পানে চেয়ে' সুদূর হতে
ভির্ম্মি খেত হরিণ-বালা মূর্চ্ছা যেত পথে।

বনের মেয়ে বনের সনে এমনি ক'রে থাকে
একলাটি হায় জান্‌ত না কেউ তাকে।
দিন-দুনিয়ায় সে ছাড়া আর কেউ ছিল না তার,
তবু কিন্তু ভাবতো সে ভাই—
"আর কি আমার চাই ?
বনের হরিণ, তরু-লতা এই তো সব আমার,
আকাশ, আলো, নিঝর, নদী, পাহাড়-তলীর বন,
এইতো আমার সবই ভাল সবাই আপন জন।
নাই বা দিল কেউ এসে গো একাকিনী আমার ব্যথায় সান্ত্বনা !"

বলেই কেন ঠোঁট ফুলাতো ; হায় অভাগী জান্‌ত না—
পলে পলে আপনাকে সে দিচ্ছে ফাঁকি কতই—
অথই মনের থই মেলে না বুঝতে সে চায় যতই।

দুষ্টু একটি দেবতা তখন ফুল-ধনুটি হাতে
বধূর বুকে পড়ত লুটি' হেসে' হেসে' ফুল-কুঁড়িদের ছাতে
বুঝ্‌ত না তার কি ছিল না কেন পিষছে বুকের তলা,
ভাব্‌ত আমার কাকে যেন অনেক কিছু বলার আছে
এখনো তার হয়নি কিছু বলা।
এমনি করে ভার হ'ল গো ক্রমেই বলার একাকিনী
জীবন-পথে চলা।

কুঁড়ির বুকে প্রথম এবার কাঁদল সুরভি,
জাগল ব্যথা-অরুণ, যেন বেলা-শেষের করুণ পূরবী।
একটু খানি বুকটী তাহার অনেকখানি ভালোবাসার গন্ধ-বেদনাতে
টন্‌টনিয়ে উঠলো, ওগো স্বস্তি নাই আর কোথাও দিনে রাতে।

কস্তুরী সে হরিণ-বালা উন্মনা আজ উদাস হয়ে ফিরে
নাম-হারা ক্ষীণ নিঝর-তীরে-তীরে।
বুঝ্ল না হায়, কি তার ক্ষুধা. বুক যেন চায় কি,
সে বুঝি বা অনেক দূরের সুদূর-পারের বাঁশীর সুরের ঝি।

এমনি ক'রে কাটে বেলা—
শুধু কেন হঠাৎ কখন যায় ভুলে সে খেলা—
চেয়ে' থাকে অনেক দূরে, চোখ ভরে' যায় জলে,
কে যেন তার দূরের পথিক বিদায় বেলায় 'আসি তবে' বলে
গেছে চলে ঐ অজানা অনেক দূরের পথে
আকাশ-পারে চড়ে' কুসুম-রথে।
ব্যঙ্গমা আর ব্যঙ্গমীও পথ জানে না তার
কতই সে পথ সুদূর, ওগো কতই সে যে সাত সমুদ্দুর
তের নদীর পার।

আজ সে ভাবে মনে,
(ভাবতে ভাবতে চমকে কেন ওঠে ক্ষণে ক্ষণে)—
পারিনিক বাসতে অনেক ভালো সেবার তারে,
অভিমানে তাই সে চলে গেছে সুদূর পারে,
এবার এলে ছায়ার মতন ফিরবো সাথে সাথে,
খুবই ভালো বড্ডো ভালো বাসব তারে—
ভাবতে সে আর পারে নাক
চমকে দেখে ছুটতে নিযুত পাগল বোবা যুগল নয়ন-পাতে।

দিনের পরে দিন চলে যায়
এমনি করেই সুখে দুঃখে, হায়!

একদিন না সাঁঝ-বেলাতে ঝর্ণা-ধারে ঘর না গিয়ে সে—
কিসমিস আর আঙুর-ক্ষেতে ধন্না দিয়েছে।
গাচ্ছিল গান ঘুরিয়ে নয়ান সুর্মা-টানা ডাগর-পানা,
শুন্‌ছিল গান ঘাসেয় বুকে এলিয়ে পড়ে বনের যত হরিণ-ছানা।
বীণ্‌ ছাপিয়ে উঠছিল মীড় নিবিড় গমকে—
আজ যেন সে আনবে ডেকে গানের সুরে সুদূরতমকে!
সুর-উদাসী ঘূর্ণী-বায়ু নাচ ছিল তায় ঘিরে' ঘিরে,'
বুলবুলি সব ঘায়েল হয়েছিল সুরের তীরে।

সেদিন পথিক দেখলে তারে হঠাৎ সেই সে সাঁজে,
বললে, "আমার চেনা কুসুম কেমন করে ফুটলো
ওগো নামহারা এই সুদূব বনের মাঝে?"
অভিমানে অশ্রু এসে কণ্ঠ গেল চেপে,
রুধ্‌তে গিয়ে সে জল আরো নয়ন-জলে উঠলো দু'চোখ ছেপে
আজকে আবার পড়লো তাহার মনে—
সেবার অকারণে
কেন দিয়েছিল আমায় অনাদরের বেদন
এই সে মেয়ে, সবার চেয়ে আপন আমার যে জন!
সইতে সে গো পারেনিক আমার ভালবাসা,
তাই সেবারে মধ্য দিনেই শুকিয়েছিল আমার সকল আশা।
আজো কি হায় তবে
ভালোবেসে অবহেলা অনাদরই সইতে শুধু হবে?
জাঁতা দিয়ে কে যেন তায় বিপুল বলে পিষলে কলজে-তল,
দারুণ অভিমানে সে তাই বল্‌লে, "ও মন আবার দূরে
আরো দূরে চল্‌।"
আরেকটি দিন উষায়

বনের মেয়ে বাহির হ'ল সেজে সবুজ ভূষায়।
আঙুর পাকায় লাবণ্য আর ডালিম ফুলের লাল
রাঙিয়ে দিলে মৌনা মেয়ের তুইটী ঠোঁট আর গাল।

মউল ফুলের মন-মাতানো বাসে
শিশির ভেজা খসখস আর ঘাসে
যৌবনে তার ঘনিয়ে দিল কেমন বেদনা সে।
সেদিন নিশি ভোর
পথহারা সেই পথিক বেশে এলো মনোচোর,
চোখ-ভরা তার অভিমানের ঘোর।
অনেক দিনের অনেক কথাই উতল বাতাস লেগে
হৃদ্-পদ্মায় চড়ার মতন উঠ্‌ল জেগে' জেগে'।
তাই সে আবার উঠ্‌লো গেয়ে দূরে যাবার গান,
গভীর ব্যথায় বনের মেয়ের উঠলো কেঁদে প্রাণ।
বললে, "প্রিয়তম !
ক্ষম আমায় ক্ষম।"
"তোমায় আমি ভালবাসি"—এই কথাটী তবু
কোন মতেই কভু
বল্‌তে নারে হতভাগী, বুক ফেটে যায় তুখে !
কইতে নারার প্রাণ-পোড়ানী কণ্ঠ শুধু রুখে !
মুক হ'ল গো মৌন ব্যথায় মুখর বনের বালা
কাজের জ্বালা জ্বালিয়ে দিল অনেক আশার গাঁথা কুসুম মালা।

আজ সকালে ফুল দেখে' তার কেন—
বুকের তলা মোচড়ে ওঠে যেন।
এক নিমিষের ভুলের তলে ফুলমালা আজ শূলের মত বাজে।

মনে পড়ে, কখন সে এক ভুলে-যাওয়া সাঁজে
পথিক-প্রিয় চেয়েছিল তাহার হাতের মালা ;
এতই কিরে পোড়া লাজের জ্বালা ?
অভাগিনী পারেনিক রাখতে সেদিন প্রিয়ের চাওয়ার মান !
অম্‌নি তাহার দয়িত—হিয়ায় জাগলো অভিমান—
হঠাৎ হলো ছাড়াছাড়ি,
ভালোবাসা রইল চাপা বুকের তলায়, অভিমানটী নিয়ে শুধু
জীবন-ভরে চললো আড়াআড়ি।
আগুন-পাথার পেরিয়ে পথিক যখন অনেক দূরে
কাঁদ্‌লো ব্যথার সুরে
বনের মেয়ের ভালোবাসা নাম্‌লো তখন বাঁধনহারা
শ্রাবণ ধারার মত,
অ-বেলা হায় সময় তখন গত !
সকাল-সাঁজে নিতুই এমনি করে
ভাবত এবার পথিক-বঁধু আস্‌বে বুঝি ঘরে।
পথ চাওয়া তার শেষ হ'ল না, পথের হ'ল শেষ,
হঠাৎ সেদিন লাগ্‌লো বুকে যমের ছোঁয়ার দেশ।
সব হারিয়ে হতভাগী পাড়ি দিল "সব-পেয়েছি"র দেশ
তৃপ্তি-হারা তৃষ্ণা-আতুর মলিন হাসি হেসে' !

হায়রে ভালোবাসা
এমনি সর্ব্বনাশা।
ভালোবাসার চেয়ে শেষে অভিমানই হয়ে ওঠে বড়,
ছাড়াছাড়ির বেলা দোঁহে দুইজনারই আঘাতগুলোই
বুকে করে জড়।
এমনি তা'রা বোকা

ভাবেনাক এই বেদনাই সুখ হয়ে তার মনের খাতায় রইবে
লেখা জোকা

জীবন-পথে ক্লান্ত পথিক ঘরের পানে চেয়ে'
অনেক দিনের পরে এলো বনের পানে ধেয়ে'
পড়লো সেদিন অভিমানের মস্ত দেওয়াল ভেঙে।
দেখলো আহা, উঠে কি লাল লালে লাল ব্যথায় হিয়া রেঙে
নিজের উপর নিজের নিদয় নির্ম্মমতার শাপে
কল্‌জেতে সব ছিন্ন শিরা,
মর্ম্ম-জোড়া যা শুধু আর বাঁধন-ছেঁড়ার গিরা,
আজ নিরাশায় মুহুমূহুঃ বক্ষ শুধু কাঁপে!
ছুটে এলো হা হা করে তাই
আজ যে গো তার অপওয়াকে বুকে পাওয়াই চাই
ছুটে এলো মানিনী সেই চাপল বালার আঁধার কুটীর কোণে
হায়, অভাগী গিয়েছিল চলে তখন যমের নিমন্ত্রণে।
ইরান-দেশের ওপারে যে কোকাফ্ মুল্লুকে
নাশপাতি আর খোর্ম্মা খেজুর কুঞ্জে ঘুরলো সে।
হায় সে কোথাও নাই,
ঝর্ণাধারের কুটীরে তার ফিরে এলো তাই।
আল্‌-বোরজের নীচে
বাঁধ-দেওয়া সে ক্ষীণ ঝর্ণার নীল শেওলা ছিঁচে।
বাঁধ মানে না, চোখ ছেপে জল ঝরে,
অভাগী আজ ফুটে আছে গোলাপ হয়ে ঘরে!
বনের মেয়ে কইতে নারে বুকের চাপা ব্যথা,
রক্ত-রঙীন গোলাপ হয়ে ফুটে আছে সেথা।

আর ঐ পাতা সবুজ
ও বুঝি তার নতুন পাওয়া মুক্তি-পুলক অবুঝ।
ভাগ্যহত পথিক যুবার শেষের নিশান উঠলো বাতাস ছিঁড়ে,
সে সুর আজো বাজে যেন সাঁজের উদাস পূরবীটিরে মীড়ে।
নেইক কোন ইতিহাসে লেখা
এই যে দুটি চির-অভিমানী
ওগো কোথায় আবার হবে এদের দেখা।

সহচর
ফাল্গুন, ১৩২৮।

ভগ্ন-স্তূপ

(ঐ) গাঁয়ের দখিনে দাঁড়ায়ে কে তুমি যুগ যুগ ধরি একা গো?
তোমার বুকে ও কিসের মলিন রেখা গো?
এ কোন দেশের ভগ্নাবশেষ?
কোন্ দিদিমার কাহিনীর দেশ?
যায় অতীতেরি আবছায়াটুকু পাষাণেরি গায় দেখা গো—
তোমারি উরসে কোন চিতোরের চিতারি ভসম্-রেখা গো?

(ওগো) কে তুমি আমার পল্লী মায়ের দুখেরি কাহিনী কহিছ?
নীরব নিঝুম গভীর ব্যথাটি বহিছ?
মাতা নাকি ছিল রাজার দুলালী,
আজ অনাথিনী পথের কাঙালী,
স্মৃতির আগুন বুকে চাপি বুঝি—ধিকি ধিকি তাই দহিছ?
শত বরষের পুঞ্জিত জ্বালা বুক পেতে নিজে সহিছ।

(বুঝি) বক্ষে শোভিত 'নো-রতন' আর অগনিত শত 'বিহার'-ই,
ছিল বুঝি রাজ-কেয়ারিটী পাশে ইহারই—
আঁকড়ের ঝোঁপ এখন তথায়
ঘিরেছে "বোয়ান"— আলগ্ লতায়—
ফুটে ঝাড় খেত যথায় নিখুত্, সুরভী ফুলের ঝিয়ারী
বুক বেয়ে তার বেয়ে বেয়ে খেত—পতি-সাথে রাজ-পিয়ারী।

(বুঝি) তোমারে ঘিরিয়া করিত সোহাগ নহর, লহর নাচিত—
বাঁধা ঘাটে তার বধূর বাউটি বাজিত;
কোথা সে নহর?—আঁধার গহ্বর,
জানায় সে কথা আটটি পহর,

শাখে কাক ডাকে, গাগরীটি কাঁখে, চমকে বউটী আজি তো
সভয়ে কৃষক হেথায় আজিকে গড়ে আলেয়ার বাজিতো।
(ওগো) তোমারি শিয়রে এখনো জাগিয়া বিশাল শিমুল গাছটি,
সব গেছে শুধু—সেইতো ছাড়েনি কাছ্‌টি
এখনো নিশীথে কে তার শা॰ায়,
আকুল কাঁদনে গ্রামটি কাঁপায়,
স্বপনেরি ঘোরে চমকিয়া ওঠে মায়ের কোলের বাছ্‌টি
কেউ জানে না চরে কত যুগ ধরে দাঁড়ায়ে শিয়রে গাছটি।

(বুঝি) একদিন ছিলে লোক-মুখরিত বিরাট ও বিশাল নগরী,
(ছিল) খোশবাগ্‌-ভরা কত যূঁথী আর টগরই—
মর্ম্মর বেদী তার মাঝে কত
হর্ম্ম্য শোভিত রাজ পথে শত,
বিলাস বিতানে বেড়াত যুবতী এলায়ে অলস কবরী
বধূ অজয়ের ঘাটে যেত ওগো নিয়ে কাঁখে তার গাগরী

(ওগো) যে বর্গীর নবমে আজো সাধ্‌ জাগে, হতে মা'র কোলে
ছেলেরে
(তারা) আঁধিয়ার রেতে ঘর-দোর দিল জ্বেলেরে—
হাঁটিয়া আসিল রাজা সিপাই,
যত সে বর্গী ঘিরে গড়খাই,
কচি শিশুটিরে মা'র কোল কেড়ে কাটে তায় অবহেলেরে
জীয়ন-বাঁধিয়া পূরবাসী সব চিতা জ্বেলে দেয় ফেলে রে॥

(ওগো) পোড়া ঝাউগুলি ছড়ানো রয়েছে আজ সারাগ্রাম ব্যাপিয়া
উড়েছে কোথায়—কপোত দোয়েল পাপিয়া,

ঝরে গেঁয়ো ফুল রাজারি চিতায়—
শিশির-অশ্রু মাখানো কি তায়?
আঁকড় শিমুল ভোরে জাগি দেয় ফুলে সমাধিটী ঝাঁপিয়া,
ভেসে আসে কার মৃদু হাহাকার নৈশ সমীরে কাঁপিয়া।

(আজি) পল্লীর পথে রাজারি কুণ্ডাবী চোখে আসে জল ভরি মা!
তবু নতশিরে—আজ পায় গড় করি মা—
উদাসী পবন ধীরে বয়ে যায়,
অতীতের স্মৃতি পরাণে জাগায়,
তোরি শোকে পড়ে নিশির শিশির ঝর্‌ঝর্ ঝরি' মা—
চোখে আসে জল, নেহারি মা তোর আজ পূতগত গরিমা। ক

পল্লীশ্রী
১ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩২৯ সাল।

ক সংগ্রাহকঃ জহির-বিন কুদ্দুস।

মৌলবী সাহেব

ওয়ালেদেরই মতন বুজুর্গ্
মক্তবের ঐ মৌলবী সাহেব,
তাই উঁহারে কেতাবে কয়,
"হজরত রসুলের নায়েব।"
দুনিয়াদারীর কাজ নিয়ে সব
দুনিয়ার লোক থাকে মাতি',
মৌলবী সাহেব দুনিয়া ভুলে'
জ্বালিয়ে রাখেন দীনের বাতি।
উনিই জ্বালান জ্ঞানের আলো
আমাদের এই আঁধার মনে,
ওঁরই গুণে মানুষ ব'লে
পরিচিত হই ভুবনে!
গাফ্‌লিয়তের ঘুমে যখন
গ্রামের সবাই রয় ঘুমিয়ে,
উনিই জানান ফজর হ'ল
ভোরে উঠে' আজান দিয়ে।
মৌলুদ শরীফে উনিই,
ওঁরেই ডাকি ফাতেহাতে,
সান্ত্বনা দেন দুঃখে শোকে
উনিই মোদের ধ'রে হাতে।
ধন-দৌলত চান না উনি,
র'ন মশগুল্ খোদার নামে,
ওয়াজ্ নসিহত্ ক'রে তিনি
ঠিক রেখেছেন মোদের গ্রামে।

শিক্ষা দিয়ে দীক্ষা দিয়ে
ঢাকেন মোদের সকল আয়েব,
পাক কদমে সালাম জানাই
নবীর নায়েব মৌলবী সাহেব।

—(মক্তব-সাহিত্য)

চাষী

চাষীকে কেউ চাষা ব'লে
করিয়ো না ঘৃণা,
বাঁচতাম না আমরা কেহ
ঐ সে কৃষাণ বিনা।
রৌদ্রে পুড়ে', বৃষ্টিতে সে
ভিজে' দিবা-রাতি
মোদের ক্ষুধার অন্ন যোগায়,
চায় না ক সে খ্যাতি।

—(মক্তব-সাহিত্য)

চাষীর গীত

॥ ১ ॥

চাষ কর দেহ-জমিতে।
হবে নানা ফসল এতে ॥

নামাজে জমি 'উগালে',
রোজাতে জমি 'সামালে',
কলেমায় জমিতে মই দিলে
চিন্তা কি হে এই ভবেতে।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাতে
বীজ ফেলা তুই বিধি-মতে,
পাবি 'ঈমান' ফসল তাতে
আর রইবি সুখেতে ॥

নয়টা নালা আছে তাহার
ওজুর পানি সিয়াত যাহার,
ফল পাবি নানা প্রকার
ফসল জন্মিবে তাহাতে ॥

যদি ভালো হয় হে জমি
হজ্ জাকাত লাগাও তুমি,
আরো সুখে থাকবে তুমি
কয় নজরুল ইসলামেতে ॥

॥ ২ ॥

জীবন যাপন করিতে
চাষ কর বিধি-মতে
র'বে যদি সুখেতে
এ পৃথিবী মাঝার।
জমি 'উগালে' 'সামালে'
বীজ ফেলাও কুতূহলে;
পাবে তবে সেই ফসলে
মেহনতের সার ॥
লাগাও ধান প্রধান ফসল
তরকারী কলাই সকল;
দাও সময়-মতো জল
যাতে প্রাণ বাঁচে তার ॥
অরি হতে ফসলে
রক্ষা কর সকলে;
নজরুল ইসলাম বলে—
নইলে বাঁচা হবে ভার ॥

—("চাষার সঙ" নাটক)

চড়ুই পাখীর ছানা

মস্ত বড় দালান-বাড়ীর উই-লাগা ঐ কড়ির ফাঁকে
ছোট একটি চড়াই ছানা কেঁদে কেঁদে ডাকছে মাকে।
'চুঁ চা' রবের আকুল কাঁদন যাচ্ছিল নে' বসন-বায়ে,
মায়ের পরাণ ভাবলে—বুঝি দুষ্টু ছেলে নিচ্ছে ছা-য়ে।
অমনি কাছের মাঠটি হতে ছুটলো মাতা ফড়িং মুখে,
স্নেহের আকুল আশীষ-জোয়ার উথলে ওঠে মা'র সে বুকে!
আধ-ফুরফুরে ছা'টি নীড়ে দেখছে মা তার আসছে উড়ে,
ভাবলে আমিই যাই ছুটে, বসি গে মা'র বক্ষ জুড়ে।
হৃদয়-আবেগ রুধতে নেরে উড়তে গেল অবোধ পাখী
ঝুপ করে সে গেল পড়ে --ঝরল মায়ের করুণ আঁখি!
হায় রে মায়ের স্নেহের হিয়া হিয়া বিষম ব্যথায় উঠলো কেঁপে,
রাখলে না কো প্রাণের মায়া, বসল ডানায় ছা'টি ঝেঁপে।
ধরতে ছোটে ছানাটিরে ক্লাসের যত দুষ্টু ছেলে;
ছুটছে পাখী প্রাণের ভয়ে ছোট্ট দু'টি ডানা মেলে।
বুঝতে নারি কি সে ভাষায় জানায় মা তার হিয়ার বেদন,
বুঝে না কেউ ক্লাসের ছেলে—মায়ের সে যে বুক-ভরা ধন।
পুরছে কেহ ছাতার ভিতর, পকেটে কেউ পুরছে হেসে,
একটি ছেলে দেখছে, আঁসু চোখ দু'টি তার যাচ্ছে ভেসে।
মা মরেছে বহুদিন তার ভুলে গেছে মায়ের সোহাগ
তবু গো তার মরম ছিঁড়ে উঠলো বেজে করুণ বেহাগ।
মই এনে সে ছানাটিরে দিল তাহার বাসায় তুলে;
ছানার দু'টি সজল আঁখি করলে আশীষ পরাণ খুলে।
অবাক-নয়ান মা'টি তাহার রইলো চেয়ে পাঁচুর পানে,
হৃদয়-ভরা কৃতজ্ঞতা দিল দেখা আঁখির কোণে।

পাখীর মায়ের নীরব আশীষ যে ধারাটি দিল ঢেলে,
দিতে কি তার পারে কণা বিশ্বমাতার বিশ্ব মিলে! *

* শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে, কবি যখন রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল-রাজ স্কুলের ছাত্র তখন (আজ থেকে প্রায় বিয়াল্লিশ বছর আগে) তিনি এই কবিতাটি রচনা করেন।

লাল সালাম

বাস্ রে বাস্!
কোন্ উদাস
উঠলো আজ
মোদের মাঝ?
আজ নূতন
উদ্বোধন
বীণ্-পাণির
সুর বাণীর।
দুব-ঘাসে
কোন্ হাসে?
নারকেলের
পত্রে ফের
বয় বাতাস,
চায় আকাশ।
জারুল ফুল
পারুল ফুল
ফুটল রে,
আসলো কে?
এই মাঠে
এই নাটে
কোন্ পরী
পাঁচ-নোরি
বাজিয়ে যায়,
চমকে চায়?

আজ মোদের
মুখ চোখের
ভাব হাসি
নেয় আসি'
ঐ অথির
ভোর-সমীর
আম কাঁঠাল
ভরলো ডাল।
বাহ্‌বা কি
সব পাখী
গাচ্ছে গীত
ভাব্‌-মোহিত্‌।
বুলবুলি
বিল্‌কুলি
সুর-মগন,
আজ লগন
কার বিয়ের?
কার ঝিয়ের?
সোনার ফুল
তাই আকুল,
ঐ তো বোন
হলদে কোণ
তার শাড়ি
যায় নাড়ি'।
তার চোখের
অশ্রু ঢের

মান-পাতায়
টলমলায়।

শোন্ রে শোন্
আজকে কোন্
মন-মোহন
এই মিলন।
আজকে বোন্
সাবাস জন
লুটবে তার
পুরস্কার,—
গুণ আদর
আর কদর।
সাবাস ভাই
এই তো চাই,
হয় বছর
এমনি জোর
নেবই সই
কাপড় বই।

বাহ্‌বা রে
আজ কারে
মিলন বই
বললো সই!
লক্ষ্মী ভাই
হওয়াই চাই,

নৈলে ছাই
মিলবে নাই
গুরু জনে
সদা মনে
ভক্তি চাই
নৈলে ভাই
সুখ সে নাই
কোনই ঠাঁই।
এই সভায়
আজ সবায়
কর প্রণাম
লাল সালাম।
বাহ্‌বা কি
আজ খুশী!
এমনি জোর
সব বছর—
চাই হাসি
আর খুশী।
আজকে তবে বিদায় ভাই
লক্ষ্মী মেয়ে হও সবাই! †

দৌলতপুর,
১৩২৮।

† কবি আজিজুল হাকিমের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

মুকুলের উদ্বোধন

বীণা-পাণির সুর-মহলের কোন্ দুয়ার আজ খুল্‌লো রে!
কোন্ সুখে আজ মন আমাদের দোদুল-দোলায় দুল্‌লো রে!
সবুজ শাড়ীর ধানী আঁচল জারুল ফুলের বেগ্‌নী পা'ড়—
উড়িয়ে কে ঐ আসলো রে ভাই আকাশ বীণায় বাজিয়ে তার!
সোনার ফুলে লুটালো তার হল্‌দী-রাঙা উত্তরী—
খাপছাড়া ঐমেঘগুলি যায় ভেসে তারি দূর তরী।
* * দোয়েল কোয়েল গাচ্ছে তারি বন্দনা,
কাঁঠাল-পাকা আমের সুবাস তাঁরি দেহের গন্ধ না!

কও দেখি বোন্ কোন্ মেয়ে এই আস্‌লো মোদের আঙ্গিনায়—
এত স্নেহ উছলে পড়ে কাহার তনুর ভঙ্গিমায়?

এ যে মোদের ভারতী মা, টলেছে আজ আসন তাঁর,—
আমরা যদি ডাক দি' রে বোন্ রইতে কি মা পারেন আর?
গগন-জোড়া তাঁরি চাওয়া বুক জুড়ানো মাটির কোল,
দখিন হাওয়ায় বাতাস করেন দুলিয়ে পাতার নীল আঁচল।
আয় বোন্ আয় মোরা আজ সালাম করি সেই মাতায়,
দুলাল তার আজ আস্‌লো যারা সাজাই তাদের ফুল পাতায়।

ছোট ছোট বোনগুলি সব আহ্লাদে আজ আটখানা,
কচি হাসির বাঁশী কাঁপায় পুলক দিয়ে মাঠখানা।
আজ কি বাণীর সোহাগটুকুন্ লুটলি তোরা লুটলি, হায়,
গরবিনী বোনগুলি মোর তোদের দেখে চোখ জুড়ায়।

কিসের এত আনন্দ আজ জান কি তা জান বোন্?
লক্ষ্মী যত মেয়েদের আজ জ্ঞান-মুকুলের উদ্বোধন।

যা পাও আজ হাত পেতে নাও, আবার যেন ফের বছর
এমনি মেলে গুণের আদর পুরস্কার সে তর-বেতর।
রাখবো মনে আমরা সবাই সব ঠাঁই যদি লক্ষ্মী হই,
দুখের ধরা সুখের হ'বে, নারী যে বোন দুঃখ-জয়া।
মেয়ের ঘরের লক্ষ্মী—মোরা * * ফুল ফুটায়,
মঙ্গল আর কল্যাণ সব নারীর পায়েই মুখ লুটায়।

তোমরা এখন কচি মেয়ে, এসব হয়তো বুঝবে না,
ভালো যদি না হই রে বোন্, কেউ তা' হলে পূজবে না।
পড়া লেখার সকল কাজে' হব মোরা লক্ষ্মী সব,
দেখবে তখন কুটীর মাঝেই ফুটবে এসে রাজ্-বিভব।

সভায় মোদের স্নেহের বশে এলেন যে-সব মহান প্রাণ
তাঁদের পায়ে প্রণাম করে গাও গো তাদের বোধন-গান।
আয় বোন্ সব আয় তবে আজ গাঁথবো স্নেহের পুষ্প-হার,
আনবো কেড়ে লক্ষ্মী মায়ের পদ্ম-বাণীব স্তব-বাহার। †

দৌলতপুর,
১৩২৮।

† কবি আজিজুল হাকিমের সৌজন্যে প্রাপ্ত। মনে হয়, কোনো বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী উপলক্ষে কবিতাটি রচিত। তারকা চিহ্নিত অংশের পাঠোদ্ধার করা গেল না।

মুক্তি

রাণীগঞ্জের অর্জ্জুন পটির বাঁকে
যেখান দিয়ে নিতুই সাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে
রাজার বাঁধে জল নিতে যায় শহুরে বৌ কলস কাঁখে।
সেই সে বাঁকের শেষে
তিন দিক হতে তিনটে রাস্তা এসে,
ত্রিবেণীর ত্রিধারার মত গেছে একেই মিশে।
তেপথের সেই 'দেখা শুনা' স্থলে
বিরাট একটা নিম্ব গাছের তলে,
জটওয়ালা সে সন্ন্যাসীদের জটলা বাঁধত সেথা,
গাঁজার ধুয়ায় পথের লোকের আঁতে হোত বেথা;
বাবাজিদের 'ধূনি' দেওয়ার তাপে
না সে তপের প্রতাপে
গাছে মোটেই ছিল নাক পাতা,
উলঙ্গ এক প্রেত সে যেন কঙ্কালসার তুলেছিল মাথা।
ভুলে যাওয়ার সে কোন নিশি ভোরে,
"আজান" যখন শহুরেদের ভাঙলে ঘুমের ঘোর,
অবাক হ'য়ে দেখলে সবাই চেয়ে,
শুক্‌নো নিমের গাছটা গেছে ফলে ফুলে ছেয়ে!
বাবাজিরাও তল্পি বেঁধে রাতেই
সট্‌কেছেন সব; বোধহয় পড়েছিলেন বেজায় কাতেই!
অত ভোরেও হোথা
হট্টগোলের লাগল একটা বিষম জনতা!
দেখে কিন্তু লাগল সবার তাক্‌,
এ কোন মহাব্যাধিগ্রস্ত অবধূত নির্বাক?

সে কি ভীষণ মূর্ত্তি!—
ঈষৎ তার এক চাহনিতে থেমে গেল গোলমাল সব স্ফূ!
জটপাকান বিপুল জটা,
মেদিনী চুম্বিত শ্মশ্রু, গুম্ফগুলো কটা,
সে এক যেন জটিলতার সৃষ্টি—
অনায়াসে সইতে পারে ঝড় ঝঞ্ঝা বৃষ্টি,
পা-দুটা তার বেজায় খাটো বিঘৎ খানিক মোটে,
দন্ত প্রাচীর লঙ্ঘি অধর ছুঁতেই পায় না ঠোঁটে।
চক্ষু ডাগর, নাকটা বেজায় খাঁদা
মস্ত দু'টো লোহার শিকল দিয়ে হাত দুটো তার
সব সময়ই বাঁধা।
ভাষাটা তার এতই বাধো বাধো,
কইলে কথা বোঝাই যায় না আদৌ
ও পথ বেয়ে যেতে
দুষ্টু ছেলে যা' তা' দেয় খেতে
ফকিরও সে এমনি সোজা নেবেই তা' মুখ পেতে,
বিষ হোক্ চাই অমৃত হোক,
দেখে অবাক লোক!
শহরে সে কতই কাণা ঘুষি,
কেউ বলে, 'চাঁদ, তলপী বাধো, তুমি শুধুই ভুসি'
কেউ বলে, 'ভাই কাজ কি বকাবকির?
হতেও পারে জবরদস্ত ফকির!'
এই রকম সে নানান কথা বলে যার যা' খুশি!
মৌন ফকির হাসে মুচকি হাসি!
দেখতে দেখতে এমনি করে'
নিমগাছটার দুবার পাতা গেল ঝরে।

ফকির তেমনি থাকে, —
হঠাৎ সেদিন সেই পথেরি বাকে
নিশি ভোরেই
বোঝাই গরুর গাড়ি হেঁকে যাচ্ছিল খুব জোরেই,
খোট্টা গাড়োয়ান
ভৈরবীতে গেয়ে গজল গান।
'হো হো' করে হঠাৎ ফকির উঠ্‌ল বিষম হেসে
গাড়ী শুদ্ধ দামড়া বলদ চমকে উঠে এসে
পড়ল হঠাৎ ফকিরেরি ঘাড়ে,
চাকা দু'টো চলে গেল একেবারে বুকের হাড়ে,
মড়মড়িয়ে উঠ্‌ল পাঁজর যত।
গাড়োয়ান বুদ্ধি হত
ক্ষ্যাপার মত ছুটোছুটি করছে থতমত!
পুলিশ ছিল কাছেই
গাড়োয়ানে ধরে বাঁধলে ঐ নিম্ব গাছেই।
লাগল হুড়াহুড়ি
তেমন ভোরেও লোক জমল সারাটা পথ জুড়ি।
রক্তাক্ত সে চূর্ণ বক্ষে বদ্ধ দুটি হাত
থুয়ে ফকির পড়ছে শুধু কোরানেরই আয়ত,
হয়নি মুখে আদৌ বেথার কোমল কিরণপাত।
স্নিগ্ধ দীপ্তি সে কোন জ্যোতির আলোয়,
ফেল্‌ল ছেয়ে বাইরের সব কুৎসিত আর কালোয়।
সে কোন দেশের আনন্দ গীত বাজল তারি কানে,
সেই-ই জানে
শিশুর মত উঠ্‌ল হেসে চেয়ে শূন্য পানে।

ধ্যানমগ্ন ফকির হঠাৎ চম্‌কে উঠে' চায়
কুণ্ঠিত সে গাড়ীওয়ালা গাছে বাঁধা হায়,
প্রহার ক্ষতে রক্ত বয়ে যায়।
আকুল কণ্ঠে উঠ্‌ল ফকির কেঁদে
'ওগো আমার মুক্তিদাতায় কে রেখেছ বেঁধে,
এ কোন জনার ফন্দি,
বাঁধন যে মোর খুলে দিলে তায় করেছে বন্দি!'
ভোরের সারা আকাশ আলো ব্যেপে—
উঠ্‌ল কেঁপে কেঁপে
দরবেশের সে ব্যাকুল বাণী অমৃত নিষ্যন্দী!
চিরবদ্ধ হাতের শিকল অমনি গেল খুলে,
ঝুলি হতে দশটি টাকা তুলে,
লাল পাগড়ির হাতে গুঁজে বল্‌লে, 'শুন ভাই,
কোন দোষ এর নাই,
নির্দ্দোষ এ অবোধ গাড়োয়ান,
এ মলে যে মরবে শেষে তিনটি ছোট জান!'
নিমের ডালে হাজার পাখী উঠ্‌ল গেয়ে গান!
পায়ে ধরে কেঁদে পুলিশ কয়,
'এও কখন হয়?
ওগো সাধু, অর্থ লালসায়
আমিই শুধু হব কি আজ বঞ্চিত দয়ায়।
তা' হবে না কভু,
পরশ মনির বিনিময়ে পাথর নেব প্রভু?'
বুক বেয়ে তার ঝরে অশ্রুনীর
দুহাত ধরে তুলে তায় ফকির
বলে, 'বাবা, মোছ এ অশ্রুলোর
মুক্তি হ'বে তোর।

ঐ যে মুদ্রাগুলি,
গাড়োয়ানে দে তুলি'—
নিম্বগাছের সকল পাতা
ঝরঝরিয়ে পড়ল ঝরে—আর হ'ল না কথা ?*

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩২৬।

* 'মুক্তি' কবিতাটি কবির সর্বপ্রথম মুদ্রিত কবিতা। কবিতাটির পাদটীকায় কবি লিখেছিলেন: "ইহা সত্য ঘটনা। ১৯১৬ সালে এই দরবেশের কথিত রূপ শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। তাহার পবিত্র সমাধি এখনও 'হাত বাঁধা ফকিরের মাজার শরীফ' বলিয়া কথিত হয়।"

অভিযান

নতুন পথের যাত্রা-পথিক
চালাও অভিযান!
উচ্চকণ্ঠে উচ্চারো আজ—
"মানুষ মহীয়ান!"

— · —

চারিদিকে আজ ভীরুর মেলা
খেলবি কে আয় নতুন খেলা?
জোয়ার জলে ভাসিয়ে ভেলা
বাইবি কে উজান?
পাগল ওরে চলবি মাতাল
স্বর্গে দিবি টান।।

— · —

সমর-সাজের নাই রে সময়
বেরিয়ে তোরা আয়,
আজ বিপদের পরশ নেব
নাঙ্গা আদুল গায়।
আসবে রণ-সজ্জা করে,
সেই আশায়ই রইলি সবে ।

রাত পোহাবে প্রভাত হবে
গাইবে পাখী গান
আয় বেরিয়ে, সেই প্রভাতে
ধরবি যারা তান।

— . —

আঁধার ঘোরে আত্মঘাতী
যাত্রাপথিক সব
এ উহারে হানছে আঘাত
করছে কলরব।

অভিযানের বীর সেনাদল!
জ্বালাও মশাল, চল্ আগে চল্
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল,
গাও প্রভাতের গান!
ঊষার দ্বারে পৌঁছে গাবি
"জয় নব উত্থান!"

নজরুল ইসলাম

নারায়ণগঞ্জ,
২-৭-২১

আজান

অকাজের সে-কাজের মাঝে ডুবে' যখন থাকি,
ভাবি না ক কি যে ছিলুম, আবার হবই বা কি !
শুধু মোহ চোখের কালোয় মায়ারই জাল বুনে.
কাঁচা বুকের 'খুন' পিয়ে নেয় বিষাক্ত কাম-ঘুণে।
বুঝেও বুঝি নাক এ যে এক এক পা ক'রে—
পলে পলে গোরের দিকেই যাচ্ছি ক্রমে সরে।
শুনি তখন আজানের কি বজ্র-গভীর স্বর -
'আল্লাহু আকবর'—আল্লাহু আকবর !'

বুঝি আর সে নাই-বা বুঝি, তবু প্রাণের মাঝে
চঞ্চল সে গুমরে মরে কী আকুলতা যে !
অবুঝ হিয়ায় উদাস-করা কি জানে এ ডাক,
প্রাণের মাঝে ফাঁকা বেদন খায় শুধু ঘুরপাক !
কি সে বেদন প্রাণই জানে, কইতে কিছু নারি,
তবু বিয়োগ-ব্যথায় কিসের মন হয় হায় ভারি !
ছেড়ে যেতে হ'বে রে হায় এ-বিশ্ব সুন্দর—
'আল্লাহু আকবর'—ঐ শোনো -'আল্লাহু আকবর !'

ওগো পাগল-উদাস-করা পবিত্র আহ্বান !
কেমন করে ভক্তি-ক্ষীরে ডুবিয়ে দাও জ্ঞান !
বক্ষে কি সে পাগল-ঝোরার উজান বয়ে' যায়,
ভোর-বেলাকার আবছায়া আর সাঁঝের ম্লানিমায় ;
দুপুর-বেলার রোদ আর বৈকালের পূরবীয়
রাতের ডাকে ছড়াও বিশ্বে কতই সুরভিই।

মাটির মানুষ প্রভুর কাজে পাছে করি হেলা,
তাইতে তুমি ডেকে ডেকে জাগাও পাঁচই বেলা।

তোমার ডাকে একটি বেলা না দিলে যে সায়,
বক্ষ বিঁধে অনুতাপের তীক্ষ্ণ ছুরিকায়!
তুমি আছ 'ইসলাম' তাই তেমনি আজো জেগে,
ডুবেনি ক' অবহেলার ঘোর ঝাপটা লেগে'।
ওগো পূত! ওগো গভীর! ওগো উদাস ডাক!
ওগো আজান! তোমার বিষাণ বিশ্বে বেজে যাক-
যতদিন না ইসরাফিলের প্রলয়-বিষাণ বাজে
এমনি ক'রে ব্যাকুল স্বরে দিন-দুনিয়ার মাঝে। *

সাধনা
৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
বৈশাখ, ১৩২৮।

* এই কবিতাটির প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন 'পূর্ব-পাকিস্তান' সম্পাদক কবি আবদুস সালাম।

বন্ধন

অনন্তকাল এ-অনন্ত লোকে
মন-ভোলানোরে তা'র খুঁজে' ফিরে মন;
দক্ষিণা বায় চায় ফুল-কোরকে,
পাখী চায় শাখী, লতা-পাতা-ঘেরা বন।
বিশ্বের কামনা এ -এক হ'বে দুই;
নূতনে নূতনতর দেখিবে নিতুই॥

তোমারে গাওয়াত গান যার বিরহ,
এড়িয়ে চলার ছলে যাচিয়াছ যা'য়,
এল সেই সুদূরের মদির-মোহ
এল সেই বন্ধন জড়াতে গলায়।
মালা যে পরিতে জানে, কণ্ঠে তাহার
হয় না গলার ফাঁসি চারু ফুলহার॥

জলময়, নদী তবু নহে জলাশয়,
কূল কূলে বন্ধন তবু গায় গান;
বুকে তরুণীর বোঝা কিছু যেন নয়—
সিন্ধুর সন্ধানী চঞ্চল-প্রাণ।
দুই পাশে থাক্ তবু বন্ধন-পাশ,
সমুখে জাগিয়া থাক্ সাগর-বিলাস॥

বিরহের চখা-চখী রচে তা'রা নীড়,
প্রাতে শোনে নির্মল বিমানের ডাক,
সেই ডাকে ভোলে নীড়, ভোলে নদী-তীর,
সন্ধ্যায় গাহে: 'এই বন্ধন থাক্।'
আকাশের তারা থাক্ কল্পলোকে,
মাটীর প্রদীপ থাক জাগর-চোখে॥ †

† আবদুল কাদিরের বিবাহ উপলক্ষে আশীর্বাণী।

চিত্রপট

তোমার মৌন ছবিতে ফুটুক কবির চপল ছন্দ,
তোমার তুলির কালিতে উঠুক কুহু ও কেকার দ্বন্দ্ব।
তোমার ধ্যানের সুন্দর যেন আসে
তোমার তুলির স্পর্শে তোমার পাশে,
তোমার চিত্রপটে থাকে যেন প্রভাতী পদ্ম-গন্ধ ॥ *

কলিকাতা
৫ই ফাল্গুন, ১৩৭৮।

* চৌধুরী ওসমানের সৌজন্যে।

জয়দেবপুরের পথে

কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে গগনের নীল গাঙে,
হাবুডুবু খায় তারা-বুদ্বুদ্, জোছনা সোনায় রাঙে।
তৃতীয়া চাঁদের 'সাম্পানে' চড়ি' চলিছে আকাশ-প্রিয়া,
আকাশ-দরিয়া উতলা হ'ল গো পুতলায় বুকে নিয়া।
নীলিম্-প্রিয়ার নীলা গুল-রুখ্ নাজুক নেকাবে ঢাকা
দেখা যায় ঐ নতুন চাঁদের কালোতে আব্ছা আঁকা।
সপ্তৃষির তারা-পালঙ্কে ঘুমায় আকাশ-রাণী,
'লায়লা' সেহেলি দিয়ে গেছে চুপে কুহেলি-মশারি টানি।
নীহার-নেটের ঝাপসা মশারি, যেন 'বর্ডার' তারি
দিক্-চক্রের ছায়া-ঘন ঐ সবুজ তরুর সারি।

সাতাশ-তারার ফুল-তোড়া হাতে আকাশ নিশুতি রাতে
গোপনে আসিয়া তারা-পালঙ্কে শুইল পিয়ার সাথে।
'উঁহু উঁহু' করি' কাঁচা ঘুম হ'তে জেগে ওঠে নীলা হুরী,
লুকায়ে দেখে তা 'চোখ গেল' ব'লে হাসিছে পাপিয়া-ছুঁড়ি।
'মঙ্গল' তারা মঙ্গল-দীপ জ্বালিয়া প্রহর জাগে,
ঝিকিমিকি করে মাঝে মাঝে, বুঝি বধূর নিশাস লাগে।

উল্কা-জ্বালার সন্ধানী আলো লইয়া আকাশ-দ্বারী
'কাল-পুরুষ' সে জাগি' বিনিদ্র ক'রে ফেরে পায়চারী।
সেহেলীরা রাতে পালায়ে এসেছে উপবনে কোন্ আশে,
হেথা হোথা ছোটে, পিকের কণ্ঠে ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসে।
আবেগে সোহাগে আকাশ-প্রিয়ার চিবুক বহিয়া ওকি
শিশিরের রূপে ঘর্ম্মবিন্দু ঝ'রে ঝ'রে পড়ে, সখি!

নবমী চাঁদের 'সসারে' ওকে গো চাঁদিনী-শিরাজী ঢালি'
বঁধুর অধরে ধরিয়া কহিছে, "তহুরা পিও লো আলি!"
কার কথা ভেবে তারা-মজলিসে দূরে একাকিনী সাকী
চাঁদের 'সসারে' কলঙ্ক-ফুল আনমনে যায় আঁকি'!
মস্তানা শ্যামা দধিয়াল টানে বায়ু-বেয়ালায় মীড়,
ফরহাদ-শিরীঁ লায়লি-মজনুঁ মগজে ক'রেছে ভিড়!
ছুটিতেছে গাড়ী, ছায়াবাজি-সম কত কথা ওঠে মনে,
দিশাহারা-সম ছোটে ক্ষ্যাপা মন জলে থলে নভে বনে!
এলোকেশে মোর জড়ায়ে চরণ কোন্ বিরহিণী কাঁদে,
যত প্রিয়-হারা আমারে কেন গো বাহু-বন্ধনে বাঁধে!
নিখিল বিরহী ফরিয়াদ করে আমার বুকের মাঝে,
আকাশে-বাতাসে তাদেরি মিলন তাদেরি বিরহ বাজে।

আনমনা সাকি, শূন্য আমার হৃদয়-পেয়ালা-কোণে
কলঙ্ক-ফুল আন্‌মনে সখি লিখো মুছো খনে খনে।

অভিযান
১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৩৩৩।

আজ চলে যাই

আর জিজ্ঞাসা করিব না কোন কথা,
আপনার মনে ক'য়ে যাব আমি আপন মনের ব্যথা।

ভোরের প্রথম ফোটা ফুলগুলি গোপনে তুলিয়া আনি'
অঞ্জলি দিতে তোমার দুয়ারে দাঁড়াই যুক্ত-পানি।
আমার চেয়েও সকরুণ চোখে ফুলগুলি চেয়ে' থাকে,
মোর সাথে ওরা তব পায়ে চাহে অর্পিতে আপনাকে।
তব তনু হেরি' ফুলগুলি যেন অধিক ফুল্ল হয়,
মনে ভাবে, ঐ অঙ্গের সাথে কবে হবে পরিচয়।
তুমি দ্বিধাভরে যেন ভয়ে ভয়ে যাও উহাদের কাছে ;
ভাব বুঝি, ঐ ফুলের ঝাঁপিতে লোভের সাপিনী আছে।
মুখ ফুটে তাই বলিতে পারে না, "ঐ ফুলগুলি দাও!"
আমার হাতের ফুলগুলি বোঝে, উহাদের ভয় পাও।
চেয়ে' দেখি হায়, বেদনায় মোর ফুল্ল ফুলের গুছি
সূর্যের নামে শপথ করিয়া কাঁদে, "শুচি মোরা শুচি।"
ছড়াইয়া দিই পথের ধূলাতে প্রেম-ফুল-অঞ্জলি,
"দেখ সাপ নাই, নাই কাঁটা" —আমি ফিরে' যেতে' যেতে' বলি।

অবুঝ ভিখারী মন যেতে' যেতে' পিছু ফিরে' ফিরে' চায়,
ছড়ানো একটি ফুল তুলে' সেকি লুকালো এলো-খোঁপায়!
দূর হতে দেখে, পাষাণ-মূরতি তেমনি দাঁড়ায়ে আছে ;
ফুল এড়াইয়া চলে গেলে তুমি, কলঙ্ক লাগে পাছে!
তোমার চলার পথে পড়ে যত এই পৃথিবীর ধূলি,
তারও চেয়ে কিগো মলিনতা-মাখা আমার কুসুমগুলি?

ধূলায় তোমায় ভুলায় না পথ, পথ ভুলাবে কি ফুল !
ভয় পাও কিগো, যদি শোনো পথে গাহে বন-বুলবুল ?

তুমি শুনিলে না, তবু মোর কথা থামিতে চাহে না কেন,
তোমার ফুলের ফাল্গুন মাসে আমি চড়া মেঘ যেন !
তব ফুল-ভরা উৎসবে কেন জল ছিটিয়ে সে যায়,
তব সাথে তার কোন্ সে জীবনে কোন্ যোগ ছিল, হায় !
ভয় করিওনা, মেঘ আসে—মেঘ শেষ হয়ে যায় গলে',
আমার না-বলা কথা বলা হলে আমিও যাইব চলে।'

আমি জানি, এই ফাল্গুন ফুরাবে, খর বৈশাখ এসে'
কি যেন দারুণ আগুন জ্বালাবে তোমাদের এই দেশে।
ভালো লাগিবে না কিছু সেই দিন উৎসব হাসি-গান ;
ফাল্গুনে যে মেঘ এসেছিল তার তরে কাঁদিবে গো প্রাণ !
ডাকিবে, "এস হে ঘন শ্যাম বারিবাহ
জ্বলে' গেল বুক, জুড়াও জুড়াও দাহ !"

অভিমানী মেঘ সেদিন যদিগো নাহি আসে আর ফিরে',
যে সাগর থেকে মেঘ এসেছিল, যেও সে সাগর-তীরে !
তোমারে হেরিলে হয়ত আমার অভিমান যাব ভুলে',
তব কুন্তল-সুরভিতে সাড়া পড়িবে সাগর-কূলে।
আমি উত্তাল তরঙ্গ হয়ে আছাড়ি' পড়িব পায়ে,
জলকণা হয়ে ছিটায়ে পড়িব তব অঞ্চল গায়ে।
এই উদাসীর কথা শুনি' আজ আসিবে হয়ত প্রিয়া,
তবু বলি, তুমি কাঁদিয়া উঠিবে সাগর-তীর্থে গিয়া।
মনে পড়ে' যাবে, তোমার আকাশে মেঘ হয়ে কোনদিন,
কেঁদেছিল এই সাগর, তোমারে ঘিরিয়া বিরাম-হীন।

তোমারে না পেয়ে শত পথ ঘুরে কেঁদে' শত নদী-নীরে
সাগরের জল সাগরে এসেছে ফিরে'।
তোমারে সিনান করায়েছিল সে অমৃত-ধারা রূপে,
ছেয়ে' দিয়েছিল তোমার ভুবন ফুল হয়ে চুপে চুপে।
তব ফুলময় তনু লয়ে ওঠে আজ ধরায় যে গীতি,
তোমারে যে আজ নিবেদন করে সকলে শ্রদ্ধা-প্রীতি,
মেঘ-ঘনশ্যাম কোনো বিরহীর স্মৃতি আছে তার সাথে,
মেঘ হয়ে দিনে এসেছিল, গেছে আঁধারে মিশায়ে রাতে।

সাগরে সেদিন ঝাঁপায়ে পড়িবে, তোমার পরশ পেয়ে'
প্রলয়-সলিলে রূপ ধরে আমি উঠিব গো গান গেয়ে'।
আমার হৃদয় ছোঁয় যদি প্রিয়া তোমার তনুর মায়া
পরম শূন্যে ভাসিয়া উঠিবে আবার আমার কায়া।

আজ চলে যাই, এই পৃথিবীরে আর লাগে নাকো ভালো,
হেথা মানুষের নিঃশ্বাসে নিভে যায় গো প্রেমের আলো।
সে নিরাধার শ্যাম শ্রীরাধার প্রেমে
রূপ ধরে আসে পৃথিবীতে নেমে,
যদি কোনদিন দেখা পাও তার, মোর স্মৃতি থাকে মনে,
রোদনের বান আনে যদি তব আনন্দ-নিকেতনে ;
'কোথায় হারায়ে গেছি আমি, তাঁরে শুধায়ো নিরালা ডাকি :
খুঁজিয়া আনিবে হয়ত আমারে তাঁহার পরম আঁখি।

সেদিন যেন গো দ্বিধা নাহি আসে,
কোনো লোক যেন নাহি থাকে পাশে .
যে নামে আমারে ডাকিবে না আজ, সেদিন ডেকো সে নামে,
কি বলে ডাকিলে বেঁচে উঠি আমি, শুধাইও রাধাশ্যামে।

রূপায়ণ
১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা
১৯৪০।

হাতে সোনার চুড়ি যে মা
হাসান হোসেন মা ফাতেমা,
(মোর) অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী, মা,
নবীর চার ইয়ার ॥

শমশের ॥ সাবাস গুল্‌শন। ঈদ মোবারক হো! ঈদ মোবারক—গুল্‌শন মোবারক!

গুল্‌শন ॥ বিদৌরা মোবারক বলো! নৈলে পর্দার আড়ালে তার রাগ তিন পর্দা চড়ে যাবে।

বিদৌরা ॥ শমশের ভাই! ভয়ে আসেনি, যা ঝলমল করছ।

শমশের ॥ বিদৌরা মোবারক! মহবুব মোবারক! না বিদৌরা, গুল্‌শনে এসে শমশেরের ঝলমলকে মলমল ক'রে তুলেছে।

মহ্‌বুব ॥ সব মোবারক হ'ল—মাহতাব মোবারক হো, বল্‌লে না যে কেউ। মাহতাব মানে চাঁদ, এই মাহতাব, এই চাঁদই আমাদের নিরাশার আঁধার রাতে ঈদের চাঁদ এনেছে।

শমশের ॥ নিশ্চয়ই! আমি ত ওরই হাতের শমশের, তলোয়ার!

মহ্‌বুব ॥ আমি ত ওরই প্রেমে মহ্‌বুব।

গুল্‌শন ॥ আমি ওরই রচিত গুলশন—শীর্ণ প্রান্তরকে ওরই আদর, ওরই যত্ন গুলশনে ফুলবনে পরিণত করেছে। বিদৌরা, চুপ ক'রে রইলি যে!

বিদৌরা। আল্লাহ্‌ জানেন, ঐ মাহতাবের মহিমাই আমায় বিদৌরা করেছে।

মহ্‌বুব ॥ এস, আমরা সকলে মিলে ঐ আল্লার দান মাহ্‌তাবকে মোবারকবাদ দিই!

সকলে॥ ঈদ মোবারক হো! মাহ্‌তাব মোবারক হো! মাহ্‌তাব মোবারক!

শমশের॥ আজকার ঈদগাহে তুমিই ত আমাদের ইমাম!

মাহ্‌তাব॥ আল্লাহু আকবর! আমি ইমাম নই, আমি মুয়াজ্জিন। আমি আজান দিয়ে তোমাদের আনন্দের ঈদগাহে ডেকে এনেছি। মুয়াজ্জিন যে কেউ হতে পারে, ইমাম হয় আল্লার ইচ্ছায়।

মহ্‌বুব॥ আমরা যদি বলি, আল্লার সেই ইচ্ছা তোমাতে অবতরণ করেছে!

মাহ্‌তাব॥ আল্লাহ্‌ আমায় সব অহঙ্কার সব প্রলোভন থেকে রক্ষা করুন। ইমাম তোমাদের মাঝেই লুকিয়ে আছেন। তিনিই এই নবযুগের সর্ব-ভ্রাতৃত্বের ঈদগাহে আত্মপ্রকাশ করবেন আল্লাহর ইচ্ছায়। জমায়েত সেদিন সার্থক হবে। সেই দিন আমরা এই মহামিলনের ঈদগাহে সর্ব জাতি ধর্ম, হানাহানি ঈর্ষা ভেদ ভুলে', সর্ব ধর্মের পূর্ণ সমন্বয়—সেই পরম নিত্য পরম পূর্ণ সনাতন আল্লাহ্‌কে এক সাথে সিজ্‌দা করব—নামাজের শেষে অশ্রুসিক্ত চোখে পরস্পরকে আলিঙ্গণ করবো। কোথায় সেই সর্বত্যাগী ফকির, কোথায় সেই মহা ভিক্ষু? এক আল্লাহ্‌ জানেন। আমি তাঁর বান্দা, হুকুম-বর্দার! যেদিন তাঁর হুকুম আসবে—সেদিন এই বান্দা তাঁর সিংহাসনের দিকে শির উঁচু ক'রে ক্রন্দন ক'রে উঠবে—আল্লাহ্‌, তোমার নিত্য দান তোমার হুকুম-বর্দার বান্দা হাজির!

মহ্‌বুব॥ ইন্‌শা আল্লাহ! মাশা আল্লাহ্‌। জাজা কাল্লাহ্‌! আল্লার হুকুম-বর্দারই অন্যকে হুকুম করতে পারে। সেই সর্বত্যাগী ফকীরই সামান্য জীবকে ইমাম ক'রে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারেন। তিনি যে সকলের, তাই সকলকে ছেড়ে', জামাতকে ছেড়ে' আগে গিয়ে দাঁড়ান না। আল্লাহ্‌ব ইচ্ছায় ইমাম হয়, আল্লাহ্‌ ত ইমাম হন না। আপনি যে আল্লার ইচ্ছা, আপনার সকল ইচ্ছা সেই পূর্ণ পরম ইচ্ছাময়কে সমর্পণ করেছেন। এক আল্লাহর্‌ ইচ্ছাই সকল ইমামকে পরিচালিত করে। মাহতাব ভাই, ক্ষমা করো, তুমি কি আল্লাহ্‌র সেই গোপন ইচ্ছা?

মাহ্‌তাব॥ (হাসিয়া) আল্লাহ্‌ জানেন। তোমরা যখন আমাকে এই সব কথা বলছিলে, আমার প্রতি অণু-পরমাণু কেঁপে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে বলছিল, "আল্লাহ্‌ তুমি জান, আমাদের ব্যক্ত-অবক্ত সর্ব-অস্তিত্ব তোমার ইচ্ছায় সৃষ্ট হয়, পরিবর্তিত হয়। আমরা যদি সুন্দর হই, সে যে তোমার সাধ, তোমাব ইচ্ছা, তোমার লীলা, তোমার বিলাস। তাই তোমরা যে ভালবাসা প্রেম শ্রদ্ধা আমায় দাও, তা আমি আল্লাহ্‌কে নিবেদন ক'রে দিই। আমাব সর্ব অস্তিত্বের যে তিনিই একমাত্র অধিকারী।

বিদৌরা॥ আচ্ছা মাহ্‌তাব ভাই, এই যে এত ছেলেমেয়ে কী যেন অজানা আকর্ষণে তোমায় জড়িয়ে ধরতে চায়, প্রেম দেয়, মালা দেয়—তুমি তার কিছুই গ্রহণ কর না?

মাহ্‌তাব॥ চাঁদকে দেখে ফুল ফোটে, চকোর-চকোরী কাঁদে। চাঁদ ফুল ফুটায়, চকোরীকে কাঁদায়—কিন্তু সে ফুলের

গন্ধ কি সে চকোরীর কাঁদন দেখে বিচলিত হয়? ঐ ফুলের গন্ধ, চকোরীর ক্রন্দন, চাঁদকে ছুঁয়ে আল্লাহর কাছে চলে যায়। চাঁদ যদি ঐ দান নিত, তা হলে চাঁদ শুকিয়ে মরা তারার মতো ঘুরে বেড়াতো আঁধারের প্রেতলোকে। নদীতে যে ফুল ঝরে, নদী কি তা নেয়? সেই ফুল নদী তার প্রিয়তম সাগরকে দেয়। উপনদী নদীতে পড়ে, সেই উপনদীর জল কি নদী নেয়? সেই উপনদীর জলকে সমুদ্রের জলে পৌঁছে দেয়।

গুল্‌শন ॥ একি করুণ বৈরাগ্য তোমার! কেন, কেন তুমি নিজেকে এত বেদনা দাও? কেন এমন নিষ্ঠুরের মতো তুমি নিজেকে অবহেলা কর, বঞ্চিত কর? তোমার এই নিজেকে এমন অবহেলাই আমাদের এমন ক'রে কাঁদায়!

মাহ্‌তাব ॥ (হাসিয়া) আমি খুলে বলি। তোমরা যে প্রেম আমায় দাও, তা যদি আমার কামনার অগ্নিতে পুড়ে দগ্ধ হয়ে যেত, তা হলে তোমরাও আমাকে হারাতে, আমিও তোমাদের হারাতাম। আল্লাহ্‌কে দিয়েছি বলে তোমাদের প্রেম আজ এত বিপুল প্রবাহের আকার ধারণ করেছে। তোমাদের দেওয়া প্রেম আল্লাহকে দিয়েছি বলে সেই প্রেম আজ সকলে পাচ্ছে। আল্লাহ্ যে সর্বময়। যেখানে আল্লাহ্ নাই, তার অস্তিত্বও নাই, যেখানে অস্তিত্ব সেখানেই আল্লাহ্। কাজেই আল্লাহ্‌র দেওয়া তোমাদের এই প্রেম তাঁকে দিলে তাঁর সকল অস্তিত্ব অর্থাৎ সমস্ত জড় জীব ফেরেশতা মানুষ সেই প্রেমের স্বাদ পায়। সেই প্রেমে তা'রা গলে যায়—তাদের সমস্ত মন্দ ভালো হয়ে যায়।

গুল্‌শন। বুঝলাম। কিন্তু তুমি কি পেলে?

মাহ্‌তাব॥ আমি আল্লাহ্‌কে পেলাম। অর্থাৎ তাঁরই অস্তিত্ব তাঁরই ইচ্ছার সৃষ্টি তোমাদের সকলকে পেলাম। তাই আমার ঈদ ফুরায় না। আমার ঈদ ফুরায় আবার আসে। নদী যেমন সাগরকে নিত্য পেয়ে আবার নিত্য তার পানে 'পাইনি পাইনি' বলে কেঁদে কেঁদে ধায়, আমার মিলন-বিরহ তাঁর সাথে তেমনি নিত্য। এ বোঝাবার ভাষা নাই; নদী হও, তখন বুঝবে। বিরহের রোজা না রাখলে কি প্রেমের চাঁদ দেখতে?

মহ্‌বুব॥ ভাগ্যিস তুমি স্নিগ্ধ চাঁদ, প্রখর সূর্য নও, তা' হলে এতক্ষণ গলে মোম হয়ে যেতাম। বিদৌরা! এ কি! তুমি কাঁদছ কেন? চাঁদের এত স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাও এমন ক'রে গলায়! গোসলের সময় হয়ে এল, আল্লাহ্‌র লীলা-সাগরে অবগাহন করলাম তবু গোসল করতেই হবে, এও তাঁর ইচ্ছা। এখন তাঁরই ইচ্ছায় "এল ঈদ ঈদ" গানটা গাও ত!

(বিদৌরার গান)

এল ঈদল-ফেতর এল ঈদ ঈদ ঈদ।
সারা বছর যে ঈদের আশায় ছিল না ক নিঁদ॥

রোজা রাখার ফল ফলছে দেখ রে ঈদের চাঁদ,
সেহরী খেয়ে কাটল রোজা, সেহেরা বাঁধ।
ওরে বাঁধ আমামা বাঁধ।
প্রেমাশ্রুতে ওজু ক'রে চল্‌ ঈদগাহ্‌ মসজিদ॥

(আজ) ছিটায় মনের গোলাব-পাশে খুশীর গোলাব-পানি

(আজ) খোদার ইস্কের খশবু-ভরা প্রাণের আতর-দানী।
ভরল হৃদয়-তশ্‌তরীতে শিরণী তৌহীদ ॥

(দেখ্‌) হজরতের হাসির ছটা ঈদের চাঁদে জাগে,
সেই চাঁদেরই রং যেন আজ সবার বুকে লাগে।
(এই) দুনিয়াতেই মিট্‌ল ঈদে বেহেশ্‌তী উমিদ ॥

প্রবন্ধ ও আলোচনা

তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা

গত ভাদ্র সংখ্যা "ভারতবর্ষে" সুলেখক হেমেন্দ্র বাবুর 'সঞ্চয়ে' "তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে' বোধ হয় অনেকেই ক্ষুন্ন হয়েছেন। ততোধিক মর্মাহত হয়েছেন বোধ হয় আমাদের নতুন কবি ভায়ারা। লেখাটা যেন তাঁদের নাকের ডগায় মূর্তিমান রসভঙ্গের মত আবির্ভূত হয়ে তাণ্ডব নৃত্য ক'রে গেছে! সই 'মান্ধাতার আমলের পুবানো' এক মহাকবি-প্রসিদ্ধিতে এমন একটা প্রচণ্ড লাঠ্যাঘাত, কি সাংঘাতিক কথা!

তবে ও সম্বন্ধে এ গবীবের যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

প্রথমতঃ, New York Herald নামক আমেরিকান সংবাদ-পত্রেব অচিন লেখকের তুর্কদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিয়েই আমার ভয়ানক একটা খটকা বেঁধে গেছে আজকাল অনেক লেখক ঘরে বসেই ছুনিয়াব যে কোন স্থানের ভ্রমণ-কাহিনী অসঙ্কোচে লিখে থাকেন, এ একটি নিষ্করুণ সত্যি কথা। তাঁরা হয় বিখ্যাত ভ্রমণ-কারীর কাছ থেকে শুনে' নতুবা কোন ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ে' এবং তাতে কিছু ঘবের তেল-মসলা সংযোগ ক'বে আমাদের সামনে এনে হাজির কবেন এবং আমবাও "কৃতার্থ" হয়ে যাই। আমিও ঐ লেখা পড়েছি, তাতে তিনি যে তুর্কদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তা কিছুতেই বোঝা যায় না। হতে পারে তিনি কিছুদিন বা খুব বেশীদিন সেখানে ছিলেন, কিন্তু তিনি—আমার যতদূর সম্ভব—সাদা চোখে কিছুই দেখেন নি।

'সাহেব' তুর্কদের সম্বন্ধে অন্যান্য যে সব বাজে বকেছেন, সে সম্বন্ধে কিছু না ব'লে আমি কেবল তুর্ক মহিলার সৌন্দর্য সম্বন্ধে ছ'চারটি কথা বলে' এই নিরস গদ্যের অবসান করব।

পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে যে পৌরাণিক প্রবাদের মত তুর্ক তরুণীর

বিশ্ব-বিমোহিনী সৌন্দর্যের গুণকীর্তন হয়ে আসছে, আর শুধু পাশ্চাত্ত্য প্রদেশ কেন, জগতের সমস্ত দেশের নূতন পুরাতন সকল কবি ও লেখকই যে "পঞ্চমুখে" তুর্ক রমণীর ভুবনে অতুল সুষমার বর্ণনা ক'রে যাচ্ছেন, সব কি তা' হলে বিলকুল মিথ্যা ? তবে কি তাঁরা কোন কিছু না দেখে-শুনেই চক্ষু বুঁজে' শুধু কল্পনার নেশায় মনের চোখে বেচারী তুর্ক তরুণীদের মূর্তি এঁকে তা'দিগকে একেবারে হুরপরীর সঙ্গে সমান আসন দিয়েছেন ? এমন অনেক জগদ্বিখ্যাত কবি ও লেখক তুর্ক মহিলার রূপ বর্ণনা করতে করতে তন্ময় হয়ে গিয়েছেন, যাঁরা দস্তুরমত তুর্ক দেশে ভ্রমণ করেছিলেন, তাঁরা যে নেহাৎ কবিত্বপূর্ণ মোলায়েম ধরণে চক্ষু বুঁজে বেড়িয়ে বেড়ান নি, এ বোধহয় বিশ্বাস করা যেতে পারে। তা'ছাড়া তুর্কদের দেশ পাশ্চাত্ত্য দেশেরই অন্তর্গত, আর তা নেহাত দূরও নয়, অথচ বাবা আদমের কাল হতে আজ পর্যন্ত তুর্ক রমণীদের মুখচন্দ্র কেউ দেখেন নি ? এবং খামাখা ঘরের খেয়ে বেচারীদের রূপ বর্ণনায় মুখে ফেনা উঠিয়েছেন ? আর ঐ আমেরিকান লেখক মহাশয় একজন "হাম্বা চোম্বা" অবতারের মত সটান তুর্কস্থানে অবতীর্ণ হয়ে সারা তুনিয়ার চোখের উপরকার একটা মস্ত পর্দা ফাঁক ক'রে ধরলেন ? লেখকের "কেরদানী'কে বাহাতুরী দিতে হয় কিন্তু। আর হেমেন্দ্র বাবুও সানাইয়ের পোঁ ধরার মত তাঁর দগ্ধ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়েছেন যে, হুর-পরী দেখা আর তাঁর ভাগ্যে ঘটলো না। তাই তুধের সাধ ঘোলে মিটানোর মত গানে গল্পে কবিতায় প্রসিদ্ধা, হুর-পরী নামে আখ্যাতা তুর্ক রমণীর রূপ-মাধুর্য শুনেই কোন রকমে নিজের 'আকুল পিয়াসা' দমন ক'রে রেখেছিলেন,—এমন সময় 'দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠে'র মত সশরীরে আমেরিকান লেখক মশায় মৃত্তিকা ভেদ ক'রে উঠে একেবারে 'চিচিং ফাঁক' করে দিলেন বা মাঝ মাঠে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলেন। আসল তুর্ক রমণীরা (দো-আঁসলা

নয় অবশ্য!) বাস্তবিকই হুরপরীর চেয়েও সুন্দরী। ও বিষয়ে আমার মত অধমাধমের অদৃষ্ট দগ্ধ না হয়ে খুব স্নিগ্ধই বলতে হবে, কারণ আমি আমার এই চর্মচক্ষে বাস্তব-জগতে যে কয়জন তুর্কী রমণীকে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তার অন্ততঃ একজন এবং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টকে বাঙলার ষ্টেজে হাজির করতে পারলে অনেকেরই 'মূর্চ্ছা ও পতন' হ'ত এবং মাথা খারাপ হয়ে যেত, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। দুনিয়ার সকল জাতির রমণীই (বিশেষতঃ যাঁরা সৌন্দর্যের জন্য বিশ্ববিশ্রুত, উদাহরণ স্বরূপ—পার্শী, ইরাণী, ইহুদী, আরবী প্রভৃতি) দু'দশজন ক'রে আপনাদের পাঁচ জনের আশীর্বাদে দেখবার সুযোগ পেয়েছি এবং তা স্বপ্নে নয়, দিবালোকে,—কল্পনায় নয়, বাহাল খোশ-তবিয়তে, আর প্রাণপণে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে। কিন্তু কই, তুর্ক মহিলার মত এমন ভুবন-ভোলানো রূপ, অতুলনীয় সৌন্দর্য ত আর পোড়া চোখে পড়লো না! তবে হতেও পারে, হয়ত ঐ তরুণীদের রূপাগ্নি আমার চোখ ঝলসে দিয়েছে, তাই আর দুনিয়ার কোথাও সুন্দরী দেখতে পাই না।

হেমেন্দ্রবাবু পরের মুখে ঝাল খেয়ে একেবারে লম্ফঝম্ফ দিয়ে বলে ফেলেছেন, "তুর্কী রমণীরা মোটেই সুন্দরা নয়।" কেননা একজন সাহেব বলেছেন যখন, তখন তা বেদবাক্য। একটু রসিকতার লোভে তাঁর মত লোকের পক্ষে একজন খামখেয়ালী লেখকের ছেঁদো কথায় সায় দেওয়া উচিত ছিল না। সাহেবের সুরারাগরঞ্জিত নয়নে ওঁদেরই স্বজাতির মত 'ওল ছিলা' চেহরা হলেই বোধহয় বেশ সুন্দরীটি হ'ত। তবে এর সবিশেষ প্রমাণ পেতে হলে আমাদের দুইজনকেই আবার 'আস্তানা' পর্যন্ত ছুটতে হয়; সেও ত এক সাংঘাতিক ব্যাপার। হেমেন্দ্রবাবু ইচ্ছা করলে অন্ততঃ সিরাজী সাহেবের কাছেও এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জানতে পারতেন।

পিকিং হতে আমদানী বেঢপ্ মুখ, হাবশির দেশ হতে রপ্তানী বিটকেল কুচকুচে মুখ, "লিভান্টিয়ান," সার্কেসিয়ান বা "স্কান্ডিনেভি-য়ান" দেশের চ্যাপটা বে-খাপ্পা মুখ ইত্যাদি যে সব পাঁচমিশেলী মুখ সাহেব-পুঙ্গব তুর্কীদের মাঝে দেখেছেন, তাই নিয়ে যদি তুর্ক তরুণীর সুষমা সম্বন্ধে ঐ রকম বীভৎস মত পোষণ করেন, তা হলে আমাদের বলবার কিছুই নাই। তা হলে সাহেবেরই জয়! তা'ছাড়া লেখক জানেন এবং স্বীকারও করেছেন, "তুর্কীরা নানা দেশ হতে নানা জাতের বন্দিনী জোগাড় ক'রে আনত, আর তাদেরই সঙ্গে অবাধ রক্তমিশ্রণের ফলে এই অসংখ্য ও বিচিত্র মুখাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে।" অতএব সকলেই পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে, এই 'গজঘণ্ট' রংবেরংয়ের মুখ আদৌ তুর্কীর নয়, ওসব হচ্ছে বাঁদীদের মিশ্র মুখ। ঐ সব পাঁচমিশেলী মুখই বোধহয় ঘোমটা খুলে বাইরে বেরিয়ে সাহেবের মেজাজ বিগড়ে দিয়েছিল।

তুর্কীরা আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কায়দা-কানুনে কেতাদুরস্ত হলেও এখনও তাদের মেয়েরা পথে ঘোমটা খুলে বেরোয়নি, আর বেরুলেও এমন সাধারণ জায়গায় বেরোয়নি যাতে তাদের ঐ স্বর্গীয় সুষমা-মাধুরী সাহেবের বিড়াল-নয়ন সার্থক করে দিয়েছিল! সম্ভ্রান্ত আসল তুর্কী মহিলারা হাজার শিক্ষিতা হলেও এখনও রীতিমত বোরকা দিয়ে পথে বের হন। কাজেই অন্যান্য দেশের মত "ঘোমটার আড়ালে খেমটার নাচ" দেখা লেখকের আর পোড়া কপালে জোটেনি!

এই সব খামখেয়ালি লেখকের কাণ্ড দেখে আমি নির্ভয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে, সেই সাহেব যদি বাঙলায় আসেন, তা হলে দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার নমুনা স্বরূপ আমাদের কুললক্ষ্মীদের রূপ বর্ণনা নিম্নলিখিত রূপে করবেন:

"বাঙালী মেয়েগুলো বিশ্রী কালো, তদুপরি তৈলচিক্কণ হওয়ায় বোধ হয় যেন আবলুস কাঠে ফ্রেঞ্চপালেস বুলানো হয়েছে। এই জাতীয় স্ত্রীলোক পাড়াগাঁয়ে থাকে। (বাগ্দীদের মেয়ে দেখে সাহেব আমাদের বনফুলের মত সুন্দরী কুলবধূদের সম্বন্ধে এই রকম সাংঘাতিক ধারণায় উপনীত হবেন।) তারপর শহুরে তাবৎ স্ত্রীলোকই খুব বেশী রকমের স্থূলাঙ্গিনী, দেহের অনুপাতে উদর ঢক্কা-সম ভীষণ প্রশস্ত, পরিধানে কম্‌সেকম্‌ দুই তিন থান কাপড়, অঙ্গে খুব ভারি ভারি অলঙ্কার, মুখটি চন্দ্রের মত নয়ই –তবে অনেকটা মালসার মত!" (মাড়োয়ারী মেয়েদের দেখে' এ কথাই লিখবে সাহেব, কারণ তারাই বেশীর ভাগ বাইরে বেরিয়ে রাস্তার ধূলো উড়োতে উড়োতে কাঁইয়ো মাইয়ো করে যায়।) সাহেবের এ বর্ণনা ডাহা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়াও চলবে না, আর তাই পড়ে আমাদের সুন্দরী তরুণীরা হাত-পা কামড়িয়ে মরবেন।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, যদি কখনও আমার নসিবে হুর-পরী দেখা থাকে, তবে তাঁরা কখনও তুর্কী যুবতীর চেয়ে সুন্দরী হবেন না, এ বিষয়ে আমি স্থির-সিদ্ধান্ত হয়ে বসে আছি। এমন ডাঁশা আঙ্গুর আর পাকা ডালিমের মত মিশানো লাবণ্য, আর আয়নার মত স্বচ্ছ তরল সৌন্দর্য বোধহয় বেহেস্তেও দুষ্প্রাপ্য। রমণী-বিশ্বে সৌন্দর্যের সার যে কত বেশী সুন্দরী হতে পারে তা তুর্কী তরুণী না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। আমি যদি কবি হতুম, তা'হলে আমিও আমার সোনার বীণার তারে ঘা দিয়ে আকুল কণ্ঠে গেয়ে উঠতাম, –

"আগর্ ফেরদৌস্ বর রুয়ে জমিন আস্ত।
তো হামিনাস্ত তো হামিনাস্ত তো হামিনাস্ত॥"

সওগাত
কার্তিক, ১৩২৬।

'হারামণি'

ভৈরব নদীর তীরে ঝাউ-তলায় নিরালায় বসে' 'হারামণি' দেখছিলাম। মাথার উপর ঝাউশাখার করুণ মরমর-ধ্বনি, দূরে গো-চারণের মাঠে রাখালের তলতা বাঁশের বাঁশীর সুর, সামনে উদাস মাঠের বুকে হাটুবে পথিকের পায়ে-চলা পথ ; মনে হচ্ছিল— 'হারামণি'র গান যদি শুনতে হয়, তা হলে এমনি নিরালা একটু স্থান খুঁজে নিতে হয়। সাথে থাকবে এমনি 'একতারা'র মত অপ্রখর নদী-স্রোতের মৃদুল গুঞ্জন।

এ গানে বাঙ্‌লার স্নেহ-সিঞ্চিত ভেজা মাটির গন্ধ, বাঙ্‌লার নিরক্ষর পল্লী-কবির অনাড়ম্বর প্রকাশ-স্বচ্ছতা, নিরাবিল প্রাণ, নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতা ; এ তো কোলাহল-মুখর জলসার জন্য নয়। কাকাতুয়ার স্বর শুনে যারা অভ্যস্ত, 'একতারা'র এই ভ্রমর-গুঞ্জন তা'রা হয়তো শুনতেই পাবে না। *

ক্ল্যারিওনেট আর তানপুরার আসরে মেঠো রাখালকে তিনি ধরে এনেছেন ; আর কার কেমন লাগবে জানিনে, কিন্তু আমার চোখে জল এসেছে।

জয়তী
শ্রাবণ, ১৩৩৭।

* হারামণি—(গ্রাম্য গানের সংগ্রহ) মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন এম. এ. সম্পাদিত। কবিসম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। প্রাপ্তিস্থান : প্রবাসী কার্যালয় ; ১২।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য ১।০ টাকা।

বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য

বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্যের দিকে একটু ভাল করে দেখ্‌লে সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তার দু'টি রূপ। এক রূপে সে শেলীর Skylark-এর মত, মিল্টনের Bird of Paradise-এর মত এই ধূলিমলিন পৃথিবীর ঊর্ধ্বে উঠে স্বর্গের সন্ধান করে, তার চরণ কখনো ধরার মাটি স্পর্শ করে না, কেবলি ঊর্ধ্বে উঠে স্বপন-লোকের গান শোনায়। এইখানে যে স্বপন-বিহারী।

আর এক রূপে সে এই মাটির পৃথিবীকে অপার মমতায় আঁকড়ে ধরে থাকে– অন্ধকার নিশীথে, ভয়ের রাতে বিহ্বল শিশু যেমন করে তাব মাকে জড়িয়ে থাকে—তরু-লতা যেমন করে সহস্র শিকড় দিয়ে ধরণী-মাতাকে ধরে থাকে- তেমনি ক'রে। এই খানে সে মাটির দুলাল।

ধূলি-মলিন পৃথিবীর এই কর্দমাক্ত শিশু যে সুন্দরকে অস্বীকার করে, স্বর্গকে চায় না—তা নয়। তবে সে এই দুঃখের ধরণীকে ফেলে সুন্দরের স্বর্গ-লোকে যেতে চায় না। সে বলে: স্বর্গ যদি থাকেই তবে তাকে আমাদের সাধনা দিয়ে এই ধূলার ধরাতেই নামিয়ে আন্‌ব। আমাদের পৃথিবীই চিরদিন তার দাসীপণা করেছে, আজ তাকেই এনে আমাদের মাটির মায়ের দাসী করব। এর এ ঔদ্ধত্যে সুরলোকের দেবতারা হাসেন। বলেন অসুরের অহঙ্কার, কুৎসিতের মাতলামী! এরাও চোখ পাকিয়ে বলে: আভিজাত্যের আস্ফালন, লোভীর নীচতা!

গত মহাযুদ্ধের পরের যুদ্ধের আরম্ভ এইখান থেকেই।

ঊর্ধ্বলোকের দেবতারা ভ্রূকুটি হেনে বলেন: দৈত্যের এ ঔদ্ধত্য কোন কালেই টেকেনি।

নীচের দৈত্য-শিশু ঘুষি পাকিয়ে বলে: কেন যে টেকেনি,

তার কৈফিয়তই তো চাই, দেবতা! আমরা তো আজ তারই একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই।

দুই দিকেই বড় বড় রথী মহারথী। এক দিকে নোগুচি, ইয়েট্‌স্‌, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি dreamers স্বপ্নচারী; আর-দিকে গোর্কি, যোহান বোয়ার, বার্ণার্ডশ, বেনাভাঁতে প্রভৃতি।

আজকের বিশ্ব-সাহিত্যে এই দুটো রূপই বড় হয়ে উঠেছে।

এর অন্য রূপও যে নেই, তা নয়। এই দুই extreme-এর মাঝে যে, সে এই মাটির মায়ের কোলে শুয়ে স্বর্গের কাহিনী শোনে। রূপকথার বন্দিনী রাজকুমারীর দুঃখে সে অশ্রু বিসর্জন ক'রে, পক্ষীরাজে চড়ে' তাকে মুক্তি দেবার ব্যাকুলতায় সে পাগল হয়ে ওঠে। সে তার মাটির মাকে ভালোবাসে, তাই বলে' স্বর্গের বিরুদ্ধে অভিযানও করে না। এই শিশু মনে করে—স্বর্গ এই পৃথিবীর সতীন নয়, সে তার মাসিমা। তবে সে তার মায়ের মত দুঃখিনী নয়, সে রাজরাণী, বিপুল ঐশ্বর্যশালিনী। সে জানে, তারই আত্মীয় স্বর্গের দেবতাদের কোন দুঃখ নেই, তারা সর্বপ্রকারে সুখী— কিন্তু তাই বলে তার ওপর তার আক্রোশও নেই। সে তার বেদনার গানখানি একলা ঘরে বসে বসে গায়—তার দুঃখিনী মাকে শোনায়। তার আর ভাইদের মত, তার অশ্রুজলে কর্দমাক্ত হয় যে মাটি—সেই মাটিকে তাল পাকিয়ে উদ্ধত রোষে স্বর্গের দিকে ছোঁড়ে না।

এঁদের দলে—লিওনিঁদ আঁদ্রিভ্‌, ন্যুট হামসুন, ওয়াদিশ্‌ল রেমঁদ প্রভৃতি।

বার্ণার্ড শ', আনাতোল ফ্রাঁস, বেনাভাঁতের মত হলাহল এঁরাও পান করেছেন, এঁরাও নীলকণ্ঠ, তবে সে হলাহল পান ক'রে এঁরা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, সে হলাহল উদ্‌গার করেন নি।

যাঁরা ধ্বংসব্রতী—তাঁরা ভৃগুর মত বিদ্রোহী। তাঁরা বলেন,—

এ দুঃখ, এ বেদনার একটা কিনারা হোক। এর রিফর্ম হবে ইভোলিউশন দিয়ে নয়, একেবারে রক্তমাখা রিভোলিউশন দিয়ে। এর খোল্ নলচে দু'ই বদলে একেবারে নতুন ক'রে সৃষ্টি করব। আমাদের সাধনা দিয়ে নতুন সৃষ্টি নতুন স্রষ্টা সৃজন করব।

স্বপ্নচারীদের Keats বলেন :

A thing of beauty is a jo,' for ever :
(ENDYMION).

Beauty is truth, truth beauty.

প্রত্যুত্তরে মাটীর মানুষ Whitman বলেন,—

Not Physiognomy alone—
Of Physiology from top to toe I sing,
The modern man I sing.

গত Great War-এর ঢেউ আরব-সাগরের তীব অতিক্রম করেনি, কিন্তু এবারকার এই idea-জগতের Great War বিশ্বের সকল দেশের সবখানে শুরু হয়ে গেছে।

দশ মুণ্ড দিয়ে খেয়ে, বিশ হাত দিয়ে লুণ্ঠন করেও যার প্রবৃত্তির আর নিবৃত্তি হ'ল না, সেই capitalist রাবণ ও তার বুর্জোয়া রক্ষ-সেনারা এদেরে বলে হনুমান। এই লোভী-রাবণ বলে, ধরণীর কন্যা সীতা ধরণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানের ভোগ্যা, ধরার মেয়ে প্রুজারপাইন যমরাজা প্লুটোরই হবে সেবিকা। সীতার উদ্ধারে যায় যে তথাকথিত হনুমান, রুক্ষ-সেনা দেয় তার ল্যাজে আগুন লাগিয়ে। তথাকথিত হনুমানও বলে, ল্যাজে যদি আগুনই লাগালি, আমার হাত মুখ যদি পোড়েই— তবে তোর স্বর্ণলঙ্কাও পোড়াব। ব'লেই দেয় লম্ফ।

আজকের বিশ্ব-সাহিত্যে এই হনুমানও লাফাচ্ছে, এবং সাথে সাথে স্বর্ণলঙ্কাও পুড়ছে—এ আপনারা যে-কেউ দিব্যচক্ষে দেখছেন

বোধহয়। না দেখতে পেলে চশমাটা একটু পরিস্কার ক'রে নিলেই দেখতে পাবেন। দুর্বীনের দরকার হবে না।

রামায়ণে উল্লেখ আছে, সীতাকে উদ্ধার করায় পুণ্যবাণ মুখ-পোড়া হনুমান অমর হয়ে গেছে। সে আজ পূজাও পাচ্ছে ভারতের ঘরে ঘরে। আজকের লাঞ্ছনার আগুনে যে দুঃসাহসীদের মুখ পুড়ছে তারাও ভবিষ্যতে অমর হবে না, পূজো পাবে না—এ কথা কে বলবে ?

এইবার কিন্তু আপনাদের সকলেরই আমার সাথে লঙ্কা ডিঙ্গাতে হবে। অবশ্য, বড় বড় পেট যাঁদের, তাঁদেরে বলছিনে, হয়ত তাতে ক'রে তাঁদের মাথা হেঁটই হবে! - - -

এই সাগর ডিঙাবার পরই আমাদের চোখে সর্বপ্রথম পড়ে—14th December—১৮২৫ খৃষ্টাব্দের 14th December. এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি : Merezhkovsky-র বেদনা-চীৎকার—"14th December. !" এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি বর্বর রুশ-সম্রাট নিকোলাসের দণ্ডাজ্ঞায় সাইবিরিয়ায় নির্বাসিত শতাধিক প্রতিভা-দীপ্ত কবির ও সাহিত্যিকের মর্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাস! এইখানে দাঁড়িয়ে দেখি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি পুশকিনের ফাঁসির রজ্জুতে (?) লট্‌কানো মৃত্যু-পাণ্ডুর মূর্তি!

এই দিনই নির্যাতনের কংস-কারায় জন্ম নেয় অনাগত বিপ্লবী-শিশু। বীণাবাদিনী সরস্বতী এই দিন বীণা ফেলে খড়গ হাতে চামুণ্ডা-রূপ পরিগ্রহ করে। এর পরেই পাতাল ফুঁড়ে আসতে লাগল দলে দলে অগ্নি-নাগ-নাগিনীর দল কেতকীবিতানের শাখায় শাখায় তুলে উঠল বিষধর ভুজঙ্গের ফণা।

এই নির্বাসনের সাইবিরিয়ায় জন্ম নিল দস্তয়ভস্কির Crime and Punishment। রাস্কলনিকভ্‌ যেন দস্তয়ভস্কিরই দুঃখের উন্মাদ মূর্তি, সোনিয়া যেন ধর্ষিতা রাশিয়ারই প্রতিমূর্তি। যেদিন

রাস্কলনিকভ্ এই বহু-পরিচর্যা-রতা সোনিয়ার পায়ের তলায় পড়ে' বল্‌লো,—"I bow down not to thee but to suffering humanity in you!" সেদিন সমস্ত ধরণী বিস্ময়ে ব্যথায় শিউরে উঠ্‌ল। নিখিল মানবের মনে উৎপীড়িতের বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে ফেনিয়ে উঠলো। টলষ্টয়ের God এবং Religion কোথায় ভেসে গেল এই বেদনার মহাপ্লাবনে! সে মহাপ্লাবনে নূহের তরণীর মত ভাসতে লাগল সৃষ্টি—প্লাবন-শেষে নতুন দিনের প্রতীক্ষায়।

তারপর এল এই মহাপ্লাবনের ওপর তুফানের মত—ভয়াবহ সাইক্লোনের মত বেগে ম্যাক্সিম গোর্কি। শেকভের নাটমঞ্চ ভেঙ্গে পড়ল, সে বিস্ময়ে বেরিয়ে এসে এই ঝড়ের বন্ধুকে অভিবাদন করলে। বেদনার ঋষি দস্তয়ভস্কি বললেঃ তোমার সৃষ্টির জন্যই আমার এ তপস্যা। চালাও পরশু. হনো ত্রিশূল! বৃদ্ধ ঋষি টলষ্টয় কেঁপে উঠলেন। ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে বলে উঠলেনঃ That man has only one God and that is Satan! কিন্তু এই তথাকথিত শয়তান অমর হয়ে গেল, ঋষির অভিশাপ তাকে স্পর্শও করতে পারল না।

গোর্কি বললেনঃ "দুঃখ-বেদনার জয়গান গেয়েই আমরা নিরস্ত হব না—আমরা এর প্রতিশোধ নেব। রক্তে নাইয়ে অশুচি পৃথিবীকে শুচি করব।"

লক্ষ কণ্ঠে "গুরুজির জয়" শব্দে আবার বাসুকীর ফণা দোল খেয়ে উঠ্‌ল।

দূর সিন্ধুতীরে বসে ঋষি কার্ল মার্কস্ যে মারণ-মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তা এতদিনে তক্ষকের বেশে এসে প্রাসাদে লুক্কায়িত শত্রুকে দংশন করলে! জার গেল—জারের রাজ্য গেল—ধনতান্ত্রিকের প্রাসাদ হাতুড়ি-শাবলের ঘায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ধ্বংসক্লান্ত পরশুরামের মত গোর্কি আজ ক্লান্ত শ্রান্ত—হয়ত বা

নব-রামের আবির্ভাবে বিতাড়িতও। কিন্তু তাঁর প্রভাব আজও রাশিয়ার আকাশে বাতাসে।

কার্ল মার্ক্‌সের ইকনমিক্‌সের অঙ্ক এই যাদুকরের হাতে পড়ে আজ বিশ্বের অঙ্কলক্ষ্মী হয়ে উঠেছে! পাথরের স্তূপ সুন্দর তাজমহলে পরিণত হয়েছে। ভোরের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকের মত এর করুণ মাধুরী বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত ক'রে ফেলেছে!

গোর্কির পরে যে সব কবি-লেখক এসেছেন তাঁদের নিয়ে বিশ্বের গৌরব করবার কিছু আছে কিনা, তা আজও বলা দুষ্কর!

রাশিয়ার পরেই আসে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া। আইডিয়ার জগতে বিপ্লবের অগ্রদূত বলে দাবী রাশিয়া যেমন করে—তেমনি নরওয়েও করে। ফ্রান্স-জার্মানীও এ অধিকারের সবটুকুই পেতে দাবী করে।

আজকের নরওয়ের ন্যুট্ হ্যামসুন—যোহান বোয়ার—শুধু নরওয়েব ওঁরাই বা কেন বলি, আজকের বিশ্বের জীবিত ছোট-বড় সব Realistic লেখকই বুঝি বা ইবসেনের মানস-পুত্র।

হ্যামসুন বোয়ারের প্রত্যেকেই অর্ধেক Dreamer, অর্ধেক ঔপন্যাসিক। যোহান বোয়ারের Great Hunger এর Swan যেন ভারতেরই উপনিষদের আনন্দ। তাঁর The Prisoner Who Sang-এর নায়ক যেন পাপে-পুণ্যে অবিশ্বাসী নির্বিকার উপনিষদের সচ্চিদানন্দ। হ্যামসুনের Growth of the Soil-এর, Pan-এর ছত্রে ছত্রে যেন বেদের ঋষিদের মত স্তবের আকৃতি। যে করুণ-সুন্দর দুঃখের, যে পীড়িত মানবাত্মার বেদনা এঁদের লেখায় সিন্ধুতীরের উইলো তরুর মত দীর্ঘশ্বাস ফেলছে—তার তুলনা জগতে কোন কালে কোন সাহিত্যেই নেই।

এই দুঃসহ বেদনা আমরা লাঘব করি লেগারলফের রূপকথা পড়ে'—মাতৃহারা শিশু যেমন ক'রে তার দিদিমার কোলে শুয়ে রূপকথার আড়ালে নিজের দুঃখকে লুকাতে চায়, তেমনি।

রাশিয়া দিয়েছে revolution-এর মর্মান্তিক বেদনার অসহ্য জ্বালা, স্ক্যানডিনেভিয়া দিয়েছে অরুন্তুদ বেদনার অসহায় দীর্ঘশ্বাস। রাশিয়া দিয়েছে হাতে রক্ত তরবারি, নরওয়ে দিয়েছে দু'চোখে চোখ-ভরা জল। রাশিয়া বলেঃ এ বেদনাকে পরুষ শক্তিতে অতিক্রম করব,—ভুজবলে ভাঙব এ দুঃখের অন্ধ কারা! নরওয়ে বলেঃ প্রার্থনা কর! ঊর্ধ্বে আঁখি তোল! সেথায় সুন্দর দেবতা চির-জাগ্রত—তিনি কখনো তাঁর এ অপমান সহ্য করবেন না!

এই প্রার্থনার সব স্নিগ্ধ প্রশান্তিটুকু উবে যায়—হঠাৎ কোন্ অবিশ্বাসীর নির্মম অট্টহাস্যে। সে যেন কেবলি বিদ্রূপ করে! চোখের জলকে তারা মুখের বিদ্রূপ-হাসিতে পরিণত করেছে। মেঘের জল শিলাবৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে! পিছন ফিরে দেখি চার্বাকের মত, জাবালির মত, দুর্বাসার মত, দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি-কুটিল বার্ণাড শ'—আনাতোল ফ্রাঁস—জেসিতো বেনাভাঁতে। তাঁদের পেছন থেকে উঁকি দেয় ফ্রয়েড! শ' বলেনঃ Love টাভ কিছু নয়—ও হচ্ছে মা হবার instinct মাত্র, ওর মূলে Sex. আনাতোল ফ্রাঁস বলেনঃ কি হে ছোকরারা! খুব তো লিখছ আজকাল! বলি, ব্যালজ্যাক জোলা পড়েছ?

বেনাভাঁতেও হাসেন, কিন্তু এ বেচারা ওঁদের মধ্যেই একটু ভীরু। লুকাতে গিয়ে কেঁদে ফেলে' Leonardo-র মুখ দিয়ে বলে— "বন্ধু! যে জীবন মরে ভূত হয়ে গেল তাকে ভুলতে হলে ভালো ক'রে কবরের মাটি চাপা দিতে হয়। মানুষের যতক্ষণ আশা-আকাঙ্খা থাকে ততক্ষণ সে কাঁদে, কিন্তু সব আশা যখন ফুরিয়ে যায়, সে যদি প্রাণ খুলে হেসে আকাশ ফাটিয়ে না দিতে পারে—তবে তার মরাই মঙ্গল!"

তাঁর মতে হয়তো আমাদের তাজমহল—শাজাহানের

মোমতাজকে ভাল ক'রে কবর দিয়ে, ভাল ক'রে ভুলবারই চেষ্টা!

বেনাভাঁতে হাসে, সে নির্মম, কিন্তু সে বার্ণার্ডশ'র মত অবিশ্বাসী নয়।

এরি মাঝে আবার শান্ত লোক চুপ ক'রে কৃষাণ-জীবনের সহজ সুখ-দুঃখের কথা বলে যাচ্ছে—তাদের একজন ওয়াদিশ্‌ল্ রেমণ্ট—পোলিশ আর একজন গ্র্যাৎসিয়া দেলেদ্দা ইতালীয়ান।

কিন্তু গল্প শোনা হয় না—হঠাৎ চমকে উঠে শুনি, আবার যুদ্ধ-বাজনা বাজছে এ যুদ্ধ-বাদ্য বহু শতাব্দীর পশ্চাতের। দেখি, তালে তালে পা ফেলে আসছে—সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ত সেনা। তাদের অগ্রে ইতালির দ্যআননতসিও, কিপলিং প্রভৃতি। পতাকা ধরে মুসোলিনী এবং তাঁর কৃষ্ণ-সেনা।

ক্লান্ত হয়ে নিশীথের অন্ধকারে ঢ'লে পড়ি। হঠাৎ শুনি দূরাগত বাঁশীর ধ্বনির মত শ্রেষ্ঠ স্বপন-চারী নোগুচির গভীর অতলতার বাণী—The sound of the bell, that leaves the bell itself! তারপরেই সে বলে: "আমি গান শোনার জন্য তোমার গান শুনি না, ওগো বন্ধু, তোমার গান সমাপ্তির যে বিরাট স্তব্ধতা আনে, তারি অতলতায় ডুব দেওয়ার জন্যই আমার এ গান শোনা!" শুনতে শুনতে চোখের পাতা জুড়িয়ে আসে! ধূলার পৃথিবীতে সুন্দরের স্তব-গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি নতুন প্রভাতের নতুন রবির আশায়। স্বপ্নে শুনি—পারস্যের বুলবুলের গান, আরবের উষ্ট্র-চালকের বাঁশী, তুরস্কের নেকাব-পরা মেয়ের মোমের মত দেহ!

তখনো চারপাশে কাঁদা-ছোঁড়াছুঁড়ির হোলিখেলা চলে। আমি স্বপনের ঘোরেই বলে উঠি—Thou wast not born for death, immortal Bird!

প্রাতিকা
১৩৩৯।

'দিলরুবা'

তরুণ কবিদের মধ্যে যাঁরা সত্যিকার কবি, কবি আবদুল কাদির তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এঁর 'দিলরুবা' অবশ্য এঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নয়। কবি যখন নীহারিকালোকে থেকে হয়ে-ওঠার স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেন, সেইদিনের প্রকাশ-অপ্রকাশ-বিজড়িত, ইঙ্গিত-সঙ্গীত রহস্যমাখা, কইতে-পারা-না-পারার আভাস এর অনেক কবিতায় পাওয়া যায়। তবু 'দিলরুবা'র হৃদয়-তন্ত্রীতে যে সুর শুনি, এ যুগের নাম-করা বহু কবির বাঁশীতে সে সুর শুনতে পাইনে। এঁর ভাগ্যলক্ষ্মীর চোখে অতল রহস্য, নিবিড় গভীরতা। প্রথম প্রথম আলাপ করতে একটু ভয় হয়, কিন্তু ভয় ভেঙে গেলে তখন আর পৃথিবীর কোনো কিছু মনে থাকে না। এ-সুর মাঠের রাখালের তলতা বাঁশীর মেঠো সুর নয়; গুণীর হাতের 'দিলরুবা'র আলাপ শুনে' বুঝবার মত সমঝদার যাঁরা, এ তাঁদেরই জন্য।

আমরা এ-যুগে যে-কয়জন শুভ্র-মুক্তবুদ্ধি কবি ও সাহিত্যিকের জন্য গৌরব অনুভব করি, আবদুল কাদির তাঁদেরই একজন। কাজেই এর চিন্তায় ভাষায় ভাবে যে স্বাধীনতা যে পালিশ দেখতে পাই, তা আর কোথাও দেখতে পাইনে। হয়তো সেইজন্যই এঁকে অনেকের ভালো লাগবে না, কারণ আমাদের চোখ জবরজং জিনিস দেখে দেখেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। অত পালিশের জৌলুস আমাদের অনেকেরই সইবে না। এঁর ঃ

> "সে রূপ-দুলালী কভু দিসের বিলাস-পাণ্ডুর
> দূর অস্তপারে
> দেহ-সন্ধ্যাগ্নিতে তার লুকাইত বিরহ-বিধুর
> রাত্রির অঙ্গারে।

বসন্তে ঐশ্বর্য সাথে সে আসিত, ঝরিত শ্রাবণে
তার অশ্রুধারা;
শারদ-সুষমা-শেষে হেমন্তের হিম আবরণে
হইত সে হারা॥"

পড়ে' বুঝবার ও বুঝে' রস গ্রহণ করার মত রসিক খুব বেশী নেই।

জলসায় বসেই চম্‌কিলা সুরের চটক লাগিয়ে যাঁরা তাক্ লাগিয়ে দেন, কাদির তাঁদের দলের নন। এঁর সঙ্গীতের সুর আচ্ছন্ন করে এঁর গান হয়ে যাওয়ার বহু পরে—কোলাহল যখন স্তব্ধ হয়ে যায়। এঁর 'দিলরুবা'র সুর শুনতে হয় তমসা-ঘন নিথর নিশীথে। দিনে যে সমুদ্রের গর্জন শুনি ভীতি-বিহ্বল চিত্তে, রাত্রে শুনি সেই কল্লোল-ধ্বনি সঙ্গীত রূপে। তবু মনে হয়, এঁর 'দিলরুবা'-কে দিল্ দিবার মত দিলদার এ যুগেও অনেক জন্মেছে।*

মাসিক 'মোহাম্মদী'
কার্তিক, ১৩৪০।

* দিলরুবা (কাব্যগ্রন্থ) – আবদুল কাদির প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—পি. সি. সরকার এণ্ড কোম্পানী, ২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

আগামীবারে সমাপ্য

এম্পায়ার বুক হাউস হইতে মৌলভী মাহ্ফুজার রহমান খান কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীমান কাসেমের "আগামীবারে সমাপ্য" পড়লাম। পড়ে ভাল লাগলো এইটুকু বল্‌লেই যেখানে যথেষ্ট বলা হয়, সেখানেও বিনিয়ে বিনিয়ে সেই ভালো লাগাটাকে বোঝাবার আপ্রাণ পরিশ্রম করতে হবে—এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর নেই।

শ্রীমান কাসেম তরুণ কথা-শিল্পী! কয়েকটি স্থন্দর গল্প লিখে তিনি যথেষ্ট স্থনাম অর্জন করেছেন। তাঁর লেখা ধারালো, ভাষা জোরালো। কথার মাঝে মাঝে উপমাগুলি ঝর্ণার স্বচ্ছ জলে উপল-নুড়ির মত কাঁকন চুড়ির ছন্দ স্বষ্টি করে চলেছে।

এঁর লেখায় সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ করে—পীড়িত অসহায় মানুষের সত্যিকার বেদনাবোধ। এই বেদনাবোধের আবেগে কথার স্রোত আপনি ছুটে চলেছে উদ্দাম ফেনিল গতিতে।

"আগামীবারে সমাপ্য" সত্যিই আগামীবারে সমাপ্য। উপন্যাসের যেখান থেকে শুরু হবার, লেখক সেখানেই এসে থেমে গেছেন। হয়তো আগামী বারেই সমাপন হবে—বই-এর নামে ও তাড়াতাড়ি বই শেষ করায় তাই মনে হয়।

সত্যিকার উপন্যাস কোন মুসলমান লেখক লেখেননি, লিখ্‌তে পারেন নি। তবু যে কয়খানি ভালো উপন্যাস তাঁরা লিখেছেন, তার মধ্যে আগামীবারে সমাপ্য অন্যতম।

এঁর হৃদয়ে আবেগ আছে, ভাষার তীক্ষ্ণতা আছে; তারো বড়—অন্তর আছে। কাজেই শ্রীমান কাসেম অদূর ভবিষ্যতে একজন সত্যিকার গল্পী হয়ে উঠবেন—এ আমার সত্যিকার

বিশ্বাস। আমাদের কবি-কণ্টকিত বনে তিনি সত্যিকার কথা কাহিনীর ফুল ফুটিয়ে তুলুন, এই আশীর্বাদ করি।

(স্বাক্ষর) কাজী নজরুল ইসলাম

মোয়াজ্জিন
৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা।
পৌষ, ১৩৪০।

বর্ষারম্ভে

'বুলবুল'-এর চতুর্থ বার্ষিক জন্মোৎসব এল। বাঙলা দেশে সাপ্তাহিক মাসিক সব রকম পত্রেরই পরমায়ু বৃক্ষ পত্রেরই মত খুব জোর এক বৎসর। এদেশে সাহিত্য-পত্রিকার মৃত্যুর হার বাঙালী শিশুর চেয়েও অধিক। 'বুলবুল' এখন যে চলছে তা নয়, তার মুখে বাণীও ফুটেছে—আর সে বাণী আধো আধো নয়। তার চলায় ভাষায় কোথাও আর জড়তা নেই। আজ তার এই জন্মোৎসবে আমার লেখা কবচ-তাবিজের প্রয়োজন ছিল না, তবু এঁদের নয় অনেকেরই বিশ্বাস যে, সাহিত্য ছেড়ে এসে যার চর্চা করছি তা সঙ্গীত নয় জ্যোতিষ এবং অকালেই সাহিত্যিক সাহিত্য ছেড়ে গরুর গাড়ী চালিয়েছেন হয়তো তারও নজীর দুষ্প্রাপ্য নয়; কিন্তু সাহিত্যিক হাত দেখে, কোষ্টি ক'রে ভবিষ্যতে জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করছে- এ বোধ হয় শোনা যায়নি। পুরুষের দশ দশা, কিন্তু অপৌরুষ-সম্পন্ন সাহিত্যিকের দশ দশে একশ দশা।

কোনো সাহিত্যিক উৎসবে আমার আমন্ত্রণ অপরাধ, হয়ত তার চেয়েও বেশী। কেননা, আমি ধর্ম ভ্রষ্ট, সাহিত্য-সমাজের পতিত। যখন সাদর আমন্ত্রণ আসে এই কবর থেকে উঠে ফেলে আসা-আনন্দ-নিকেতনে ফিরে যাওয়ার, তখন খুব কষ্ট হয়, বড়ো বেদনা পাই। আমার মৃত সাহিত্য দেহকে যথেষ্টরও অধিক মাটি চাপা দিতে কসুর করিনি, তবু তাকে নিয়ে আমার বন্ধুরা টানাটানি করেন, কেউ কেউ দয়া করে আঘাতও করেন। উপায় নেই। মৃত লোক নাকি মিডিয়াম ছাড়া কথা বলতে পারে না। আজ যে কথা বলছি, তা মিডিয়মের মারফতই মনে করবেন। অপরিসীম শ্রদ্ধা নিয়ে সাহিত্যকে আমি বিসর্জন দিয়ে এসেছি সেই বিসর্জনের ঘাটে এই প্রেত লোকচারীকে ডেকে যেন বেদনা না দেন, আজ বলবার

অবকাশ পেয়ে বন্ধুদের কাছে সেই নিবেদন জানিয়ে রাখি। 'বুলবুল'এর সাথে আমার স্বর্গত প্রিয়তম আত্মজের স্মৃতি জড়িত। এই বুলবুলিস্তানের গুল্-বনে আমার এমন কোনো দান নেই, যাতে এর একটি কুসুম বিকাশেরও সহায়তা করেছে, তবু ওর নামের জন্যই ওর উপর আমার হৃদয়ের টান নিত্য জোয়ারের মত।

'বুলবুল' সাহিত্য শিল্পে তাজা-ব-তাজার গান শুনিয়েছে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের মন্ত্র-সঙ্গীত গেয়েছে। তার কণ্ঠে আরো বহু বৎসর এই মিলনের গান আনন্দের সুর ঝঙ্কৃত হোক, 'বুলবুল' শতায়ু হোক, এই প্রার্থনা।

বুলবুল
চতুর্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৪৪।

সুজনের গান

শ্রীমান গিরীন চক্রবর্তী সঙ্গীত শিল্পী রূপেই বিশেষভাবে পরিচিত। এই পরিচিতির ঊর্ধে তাঁরা যে নির্বিশেষ রূপ সেখানে তিনি কবি। পল্লী সঙ্গীতের প্রতি তাঁর প্রীতি—তিনি নিজে পল্লী কবি বলে। ভূঁইচাঁপার মালা পরা ভূঁইমালীর মেয়ের মত তাঁর কবিতার নিরাভরণ রূপ—'কালচারের' কাল্‌চে পড়া আভরণ বহুল বিলাসী মনের কাছে হয়তো নিখুঁত মনে হবে না। পল্লী মায়ের মত এর ছন্দ ও গতি স্বচ্ছন্দ। তাতে নাগরিকার কৃষ্টি ক্লিষ্ট নৃত্যময়ী রূপ খুঁজতে গেলে মন ও চোখ দুই-ই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। শহুরে সভ্যতায় ক্লান্ত চোখ—ছুটিতে গ্রামে গিয়ে তার অর্ধ অনাবৃত সহজ সুন্দর রূপ দেখে যেমন জুড়িয়ে যায়, আমার চোখ তেমনি জুড়িয়ে গেছে শ্রীমান গিরীনের সংগ্রহ ও স্বরচিত গানগুলির অনাড়ম্বর রূপ দেখে। এঁর গানগুলি পড়ে মনে হয়, পল্লী সঙ্গীত সংগ্রহ করতে করতে এর রসের আনন্দের ছোওয়া এঁর হৃদয় স্পর্শ করেছে। সভ্যতার আওতায় মানুষ হয়ে আমরা আমাদের অনুভূতিকে প্রকাশ করি—যত রকমে পারি জটিল কুটিল করে। প্রকাশের জটিলতাই আধুনিক সভ্য কবিদের ভঙ্গি বা 'ডিক্‌শান'।

পল্লী কবিদের প্রকাশ ভঙ্গি পল্লীবাসিনীর মতোই সহজ, সরল—কোথাও হয়তো অর্ধনগ্ন। 'কিন্তু সে নগ্নতায় কামনার আমন্ত্রণ নাই—আছে আত্মভোলা মগ্ন মনের মাধুরী। আজ-কালকার কবিতার মিলের 'মিল-এরিয়া' পেরিয়ে যে উদার আকাশ উন্মুক্ত প্রান্তর, নগ্ন খাল বিলের সহজ শ্রী, তাকে দেখতে হলে আমাদের পড়তে হয় নিরক্ষর পল্লী কবিদের গান ও কবিতা। এরা যেন প্রকৃতির অন্তরঙ্গ—একেবারে ভিতর ঘরের আত্মীয়। বাহিরের

দাওয়ায় সম্মানের শুষ্ক আসন এঁদের নেই—এঁরা প্রকৃতির অন্তরে স্থান পেয়েছেন। সেই আন্তরিকতার প্রেম শ্রীমান গিরীন পেয়েছেন। শ্রীমান গিরীনকে জানি-চিনি, তাঁর লেখাতেও তাঁর সেই সহজ সাবলীল পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তিনি নিজেকে ফাঁকি দেন নি, যা নন তা হতে চান নি; এতেই তাঁর লেখা সার্থক হয়েছে। †

ভোরের আলো
১ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
পৌষ, ১৩৪৭।

† স্বজনের গান (পল্লী কাব্য): সংগ্রহ ও রচনা—শ্রীমান গিরীন চক্রবর্তী

অভিভাষণ

প্রতিভাষণ

(১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর মোতাবেক ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ২৯শে অগ্রহায়ণ রবিবার কলিকাতা এলবার্ট হলে বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ থেকে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বিপুল সমারোহ ও আন্তরিকতা সহকারে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্বর্ধনা-সভার সভাপতি বিজ্ঞান'চার্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণের পর জাতির পক্ষ থেকে 'নজরুল-সম্বর্ধনা-সমিতির সভ্যবৃন্দ' কবিকে একটি মানপত্র প্রদান করেন। সভায় মানপত্রটি পাঠ করেন মিঃ এস্. ওয়াজেদ আলী। অভিনন্দনের উত্তরে কবি নিম্নলিখিত 'প্রতিভাষণ' দান করেন। কবির প্রত্যুত্তরের পর শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু আবেগোচ্ছল কণ্ঠে কবির স্বদেশী সঙ্গীত ও দেশাত্মবোধমূলক কবিতার প্রশংসা ক'রে এক বক্তৃতা দেন।)

বন্ধুগণ!

আপনারা যে সওগাত আজ হাতে তুলে' দিলেন, আমি তা' মাথায় তুলে' নিলুম। আমার সকল তনু-মন-প্রাণ আজ বীণার মত বেজে উঠেছে। তাতে শুধু একটিমাত্র সুর ধ্বনিত হয়ে উঠ্ছে, আমি ধন্য হলুম, আমি ধন্য হলুম।

এক-বন ফুল মাথা পেতে নেবার মত হয়ত মাথায় আমার চুলের অভাব নেই, কিন্তু এত হৃদয়ের এত প্রীতি গ্রহণ করি কি দিয়ে? আমার হৃদয়-ঘট যে ভরে' উঠ্লো! নদীর জল মঙ্গল-অভিষেকের ঘটে বন্দী হয়ে তার ভাষা হারিয়েছে। আজ যদি আমি কিছু বল্তে না পারি, আপনারা আমার সে অক্ষমতাকে ক্ষমা করবেন। আমি যে নদীর জলধারা, সেই নদীকূলে যাবেন আপনারা, তবে না চাইতেই আমার ভাষা, আমার গান সেখানে শুন্তে পাবেন।

আজ বলবার দিন আপনাদেরই, আমার নয়। তা ছাড়া, আপনাদের ভালোবাসার অতিশয়োক্তিকে অন্ততঃ আজ্কের দিন

যে হারিয়ে দিতে পারব. সে ভরসা আমার নেই। আজ আমার ভাষা শুভ-দৃষ্টির বধূর মত লাজকুণ্ঠিতা এবং অবগুণ্ঠিতা। সে যদি নাচুনে মেয়েই হয়, অন্ততঃ আজকের দিন তাকে নাচতে বল্‌বেন না।

আজ হয়ত সত্যি-সত্যিই আমার অভিনন্দন হয়ে গেল। এ শুধু আপনাদের—যাঁরা এ-সভায় এসেছেন ফুলের সওগাত নিয়ে, তাঁদের বল্‌ছিনে। আমি নেপথ্যের সেই বড় বন্ধুদের কথা বল্‌ছি, যাঁরা এখানে না এলেও আমার কথা ভুলতে পারছেন না এবং হয়ত একটু বেশী ক'রেই স্মরণ করছেন ;—ফুল ফোটানোর চেয়ে হুল-ফোটানোতেই যাঁদের আনন্দ !

ও-দিক দিয়ে আমার ভাগ্যলক্ষ্মী সত্যিই একটু বেশী রকমের প্রসন্ন। যাঁরা আমার বন্ধু তাঁরা যেমন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমায় ভালোবাসেন, যাঁরা বন্ধুর উল্টো, তাঁরা তেমনি চুটিয়ে বিপক্ষতা করেন। ওতে আমি সত্যি-সত্যিই আনন্দ উপভোগ করি। পান্‌সে বন্ধুত্বের চেয়ে চুটিয়ে শত্রুতা ঢের ভালো। বড় বন্ধুত্ব আর বড় শত্রুতা বেশ বাগসই ক'রে জড়িয়ে ধরতে না পারলে হয় না। যিনি আমার হৃদয়ের এত কাছাকাছি থাকেন, তিনি আমার নিশ্চয়ই পরম অথবা চরম আত্মীয়। আজকের দিনে তাঁদেরও আমার অন্তরের শ্রদ্ধা-নমস্কার নিবেদন করছি।

আমার বন্ধুরা যেমন পাল্লার একধারে প্রসংশার পর প্রসংশার ফুলপাতা চড়িয়েছেন, অন্য পাল্লায় অ-বন্ধুর দল তেমনি নিন্দার ধূলো-বালি-কাদা-মাটি চড়িয়েছেন, এবং ঐ দুই তরফের সুবি-বেচনার ফলে দুই ধারের পাল্লা এমন সমভার হয়ে উঠেছে যে, মাঝে থেকে আমি ঠিক থেকে গেছি, এতটুকু টল্‌তে হয়নি।

আমায় অভিনন্দিত আপনারা সেই দিনই করেছেন, যেদিন আমার লেখা আপনাদের ভালো লেগেছে। সেই 'ভালো লেগেছে'-

টাকে ভালো ক'রে বল্‌তে পারার এই উৎসবে আমার একটি মাত্র করণীয় কাজ আছে। সে হচ্ছে সবিনয়ে সস্মিত মুখে সশ্রদ্ধ প্রতি-নমস্কার নিবেদন করা। আমার কাছে আজ সেইটুকুই গ্রহণ ক'রে মুক্তি দিন। আমাকে বড়-বলার বড়-বলি করবেন না। সভার যূপকাষ্ঠে বলি হবার ভয়েই আমি সভার এবং সবার অন্তরালে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি পলাতক ব'লেই যদি আমায় ধরে এনে শাস্তির ব্যবস্থা ক'রে থাকেন, তা'হলে আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। প্রফুল্ল চন্দ্রের কাছে কলঙ্কী চাঁদকে ধরে এনে তাঁকে যথেষ্ট লজ্জা দিয়েছেন।...

শুধু লেখা দিয়ে নয়, আমায় দিয়ে যাঁরা আমায় চেনেন, অন্ততঃ তাঁরা জানেন যে, সত্যি-সত্যিই আমি ভালো মানুষ। কোনো অনাসৃষ্টি করতে আসিনি আমি। আমি যেখানে ঘা দিয়েছি, সেখানে ঘা খাবার প্রয়োজন অনেক আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল। পড়-পড় বাড়ীটাকে কর্পোরেশনের যে-কর্মচারী এসে ভেঙ্গে দেয়, অন্যায় তার নয়, অন্যায় তার, যে ঐ পড়-পড় বাড়ীটাকে পুষে রেখে আরো দশজনের প্রাণনাশের ব্যবস্থা ক'রে রাখে।

আমাকে 'বিদ্রোহী' ব'লে খামখা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতিটাকে আঁচ্‌ড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোনো দিনই নেই। তাড়া যারা খেয়েছে, অনেক আগে থেকেই মরণ তাদের তাড়া করে নিয়ে ফিরছে। আমি তাতে এক-আধটু সাহায্য করেছি মাত্র।

এ-কথা স্বীকার করতে আজ আমার লজ্জা নেই যে, আমি শক্তি-সুন্দর রূপ-সুন্দরকে ছাড়িয়ে আজো উঠ্‌তে পারিনি। সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কীট্‌সের মত আমারও মন্ত্র —"Beauty is truth, truth beauty.

আমি যেটুকু দান করেছি, তাতে কার কতটুকু ক্ষুধা মিটেছে

জানিনে; কিন্তু আমি জানি, আমাকে পরিপূর্ণরূপে আজো দিতে পারিনি, আমার দেবার ক্ষুধা আজো মেটেনি। যে উচ্চ গিরি-শিখরের পলাতকা সাগর-সন্ধানী জলস্রোত আমি, সেই গিরি-শিখরের মহিমাকে যেন খর্ব না করি! যেন মরু-পথে পথ না হারাই!—এই আশীর্বাদ আপনারা করুন।

বিংশ-শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরি অভিযান-সেনাদলের তূর্য-বাদকের একজন আমি—এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি জানি, এই পথ-যাত্রার পাকে পাকে বাঁকে-বাঁকে কুটিল-ফণা ভুজঙ্গ প্রখর-দর্শন শার্দুল পশুরাজের ভ্রূকুটি! এবং তাদের নখর-দংশনের ক্ষত আজো আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব।

ঈশান-কোণের যে কালো মেঘ পাহাড়ের বুকে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে অভিশাপ দেবেন না তার তুষার-ঘন প্রশান্তি দেখে', নির্লিপ্ততা দেখে'। ঝড়ের বাঁশী যেদিন বাজবে, ও উন্মাদ সেদিন আপনি ছুটে আস্‌বে তার পূর্ব-পরিচয় নিয়ে। নব-বসন্তের জন্য সারা শীতকাল অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়।

যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন তাঁদের মত হলুম না বলে'—তাঁদেরকে অনুরোধ, আকাশের পাখীকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের ক'রে দেখেন। আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি ব'লেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তব-গানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পেরেছি ব'লেই কবি। বনের পাখী নীড়ের উর্ধ্বে উঠে গান করে ব'লে বন তাকে কোনোদিন অনুযোগ করে না।

কোকিলকে অকৃতজ্ঞ ভেবে কাক তাড়া করে ব'লে কোকিলের কাক হয়ে যাওয়াটাকে কেউই হয়ত সমর্থন করবেন না। আমি যেটুকু দিতে পারি, সেইটুকুই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন। আম গাছকে চৌ-মাথায় দাঁড় করিয়ে বেঁধে যতই ঠেঙান, সে কিছুতেই প্রয়োজনের কাঁঠাল ফলাতে পারবে না। উল্টো এ ঠ্যাঙানি খেয়ে তার আম ফলাবার শক্তিটাও যাবে লোপ পেয়ে।---

যৌবনের রক্ত-শিখা মশাল ধ'রে মৃত্যুর অবগুণ্ঠন মোচন করতে চলেছে যে বরযাত্রী, আমি তাদের সহযাত্রী নই ব'লে যাঁরা অনুযোগ করেন, তাঁরা জানেন না—আমিও আছি তাঁদের দলে; তবে হাতের মশাল হয়ে নয়, কণ্ঠের কুণ্ঠাহীন গান হয়ে। ফুল-মেলার নওরোজে আমায় খরিদ্দার রূপে না দেখতে পেয়ে যাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাঁদেরও বলি, আমার ভাবী তাজমহলের ধ্যান-মূর্তি আজো পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। যেদিন উঠ্‌বে, সেদিন আমিও আস্‌ব ঐ মেলায় শাহজাদা খুর্‌রমের মতই আমার চোখে তাজের স্বপ্ন নিয়ে।

আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখ-ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্তানের পথে, তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্ত্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ-ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে-রূপে অপরূপ ক'রে দেখার স্তব-স্তুতি।

কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি, ও-দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাণ্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে হাত-মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে, তা হলে ওরা

আপনি আলাদা হয়ে যাবে। আমার গাঁট-ছড়ার বাঁধন কাটতে তাদের কোনো বেগ পেতে হবে না। কেননা, একজনের হাতে আছে লাঠি, আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি।--

বর্তমানে সাহিত্য নিয়ে ধুলো-বালি, এত ধোঁওয়া, এত কোলাহল উঠেছে যে, ওর মাঝে সামান্য দীপ-বর্তিকা নিয়ে পথ খুঁজতে গেলে আমার বাতিও নিভ্‌বে, আমিও মর্‌ব।

কিন্তু এ যদি বেদনা-সাগর-মন্থনের হলাহলই হয় তা হলে ঐ সমুদ্র-মন্থনের সব দোষ অসুরদেরই নয়, অর্ধেক দোষ এর দেবতাদের। তাঁদের সাহায্য ছাড়া ত এ সমুদ্র-মন্থন-ব্যাপার সহজ হ'ত না। তবু তাঁদের বলি, আজকের হলাহলটাই সত্য নয়, অসহিষ্ণু হবেন না দেবতা—রসে খান, অমৃত আছে, সে উঠ্‌ল বলে'।

আমি আবার আপনাদের আমার সমস্ত অন্তরের শ্রদ্ধা-প্রীতি-নমস্কার জানাচ্ছি।

আমি ধন্য করতে আসিনি, ধন্য হতে এসেছি আজ। আপনাদের আমার অজস্র ধন্যবাদ।

তরুণের সাধনা

(১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ও ৬ই নভেম্বর সিরাজগঞ্জের নাট্যভবনে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতি-রূপে কবি নজরুল ইসলাম এই অভিভাষণ প্রদান করেন।)

আমার প্রিয় তরুণ ভ্রাতৃগণ!

আপনারা কি ভাবিয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে আপনাদের সভাপতি নির্বাচন করিয়াছেন, জানি না। দেশের জাতির ঘনঘোর-ঘেরা দুর্দিনে দেশের জাতির শক্তি-মজ্জা-প্রাণ-স্বরূপ তরুণদের যাত্রা-পথের দিশারী হইবার স্পর্ধা বা যোগ্যতা আমার কোনদিন ছিল না, আজও নাই। আমি দেশকর্মী--দেশনেতা নই, যদিও দেশের প্রতি আমার মমত্ববোধ কোন স্বদেশপ্রেমিকের অপেক্ষা কম নয়। রাজ-লাঞ্ছনা ও ত্যাগস্বীকারের মাপকাঠি দিয়া মাপিলে হয়ত আমি তাঁহাদের কাছে খর্ব pigmy বলিয়া অনুমিত হইব, তবু দেশের জন্য অন্ততঃ এইটুকু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি যে, দেশের মঙ্গল করিতে না পারিলেও অমঙ্গল-চিন্তা কোনদিন করি নাই, যাঁহারা দেশের কাজ করেন তাঁহাদের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াই নাই। রাজ-লাঞ্ছনার চন্দন-তিলক কোনদিন আমারও ললাটে ধারণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আজ মুছিয়া গিয়াছে। আজ তাহা লইয়া গৌরব করিবার অধিকার আমার নাই।

আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে, আমি আজ তাঁহাদেরই দলে যাঁহারা কর্মী নন—ধ্যানী। যাঁহারা মানব জাতির কল্যাণসাধন করেন সেবা দিয়া, কর্ম দিয়া, তাঁহারা মহৎ; কিন্তু সেই মহৎ হইবার প্রেরণা যাঁহারা জোগান, তাঁহারা মহৎ যদি না-ই হন,

অন্ততঃ ক্ষুদ্র নন। ইঁহারা থাকেন শক্তির পেছনে রুধির-ধারার মত গোপন, ফুলের মাঝে মাটির মমতা-রসের মত অলক্ষ্যে। আমি কবি। বনের পাখীর মত স্বভাব আমার গান করায়। কাহারও ভালো লাগিলেও গাই, ভালো না লাগিলেও গাহিয়া যাই। বায়স-ফিঙে যখন বেচারা গানের পাখীকে তাড়া করে, তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে, তখনও সে এক গাছ হইতে উড়িয়া আর-গাছে গিয়া গান ধরে। তাহার হাসিতে গান, তাহার কান্নায় গান। সে গান করে, আপনার মনের আনন্দে,—যদি তাহাতে কাহারও অলস-তন্দ্রা মোহ-নিদ্রা টুটিয়া যায়, তাহা একান্ত দৈব। যৌবনের সীমা পরিক্রমণ আজও আমার শেষ হয় নাই, কাজেই আমি যে গান গাই তাহা যৌবনের গান। তারুণ্যের ভরা-ভাদরে যদি আমার গান জোয়ার আনিয়া থাকে তাহা আমার অগোচরে। যে চাঁদ সাগরে জোয়ার জাগায় সে হয়ত তাহার শক্তি সম্বন্ধে আজও না-ওয়াকিফ।--

আমি বক্তাও নহি। আমি কম-বক্তার দলে। বক্তৃতায় যাঁহারা দিগ্বিজয়ী-বক্তিয়ার খিলিজি, তাঁহাদের বাক্যের সৈন্য-সামন্ত অত দ্রুত বেগে কোথা হইতে কেমন করিয়া আসে বলিতে পারি না। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ সেন অপেক্ষাও আমরা বেশী অভিভূত হইয়া পড়ি। তাঁহাদের বাণী আসে বৃষ্টিধারার মত অবিরল ধারায়। আমাদের—কবিদের বাণী বহে ক্ষীণ ভীরু ঝর্ণাধারার মত। ছন্দের দুকূল প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া সে সঙ্গীতগুঞ্জন করিতে করিতে বহিয়া যায়। পদ্মা-ভাগীরথীর মত খরস্রোতা যাঁহাদের বাণী আমি তাঁহাদের বহু পশ্চাতে।

আমার একমাত্র সম্বল, আপনাদের—তরুণদের প্রতি আমার অপরিসীম ভালবাসা, প্রাণের টান। তারুণ্যকে যৌবনকে—আমি যেদিন হইতে গান গাহিতে শিখিয়াছি সেই দিন হইতে

বারে বারে সালাম করিয়াছি, তাজিম করিয়াছি, সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়াছি। গানে কবিতায় আমার সকল শক্তি দিয়া তাহারই জয় ঘোষণা করিয়াছি, স্তব রচনা করিয়াছি। জবাকুসুমসঙ্কাশ তরুণ অরুণকে দেখিয়া প্রথম মানব যেমন করিয়া সশ্রদ্ধ নমস্কার করিয়াছিলেন, আমার প্রথম জাগরণ-প্রভাতে তেমনি সশ্রদ্ধ বিস্ময় লইয়া যৌবনকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি, তাহার স্তব-গান গাহিয়াছি। তরুণ অরুণের মতই যে তারুণ্য তিমিরবিদারী সে যে আলোর দেবতা। রঙের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয়, রঙ ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত। যৌবন-সূর্য যথায় অস্তমিত দুঃখের তিমির-কুন্তলা নিশীথিনীর সেই ত লীলাভূমি।

আমি যৌবনের পূজারী কবি বলিয়াই যদি আমায় আপনারা আপনাদের মালার মধ্যমণি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই। আপনাদের এই মহাদান আমি সানন্দে শির নত করিয়া গ্রহণ করিলাম, আপনাদের দলপতি হইয়া নয়—আপনাদের দলভুক্ত হইয়া, সহযাত্রী হইয়া। আমাদের দলে কেহ দলপতি নাই; আজ আমরা শত দিক হইতে শত শত তরুণ মিলিয়া তারুণ্যের শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছি। আমরা সকলে মিলিয়া এক সিদ্ধি এক ধ্যানের মৃণাল ধরিয়া বিকশিত হইতে চাই।

আজ সিরাজগঞ্জে আসিয়া সর্বপ্রধান অভাব অনুভব করিতেছি আমাদের মহানুভব নেতা—বাংলার তরুণ মুসলিমের সর্বপ্রথম অগ্রদূত তারুণ্যের নিশান-বর্দার মৌলানা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেবের। সিরাজগঞ্জের শিরাজীর সাথে বাঙলার শিরাজ বাঙলার প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। যাঁহার অনল-প্রবাহ-সম বাণীর গৈরিক নিঃস্রাব জ্বালাময়ী ধারা মেঘ-নিরন্ধ্র গগনে অপরিমাণ

জ্যোতি সঞ্চার করিয়াছিল, নিদ্রাতুরা বঙ্গদেশ উন্মাদ আবেগ লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল, "অনল-প্রবাহের" সেই অমর কবির কণ্ঠস্বর বাণীকুঞ্জে আর শুনিতে পাইব না। বেহেশতের বুলবুলি বেহেশ্‌তে উড়িয়া গিয়াছে। জাতির কওমের দেশের যে মহাক্ষতি হইয়াছে, আমি শুধু তাহার কথাই বলিতেছি না, আমি বলিতেছি আমার—একার বেদনার ক্ষতির কাহিনী। আমি তখন প্রথম কাব্য-কাননে ভয়ে ভয়ে পা টিপিয়া টিপিয়া প্রবেশ করিয়াছি—ফিঙে, বায়স, বাজ পাখীর ভয়ে ভীরু পাখীর মত কণ্ঠ ছাড়িয়া গাহিবারও দুঃসাহস সঞ্চয় করিতে পারি নাই, নখচঞ্চুর আঘাতও যে না খাইয়াছি এমন নয়—এমনি ভীতির দুর্দিনে মনি-অর্ডারে আমার নামে দশটি টাকা আসিয়া হাজির। কুপনে শিরাজী সাহেবের হাতে লেখা: "তোমার লেখা পড়িয়া খুশী হইয়া দশটি টাকা পাঠাইলাম। ফিরাইয়া দিও না, ব্যথা পাইব। আমার থাকিলে দশ হাজার টাকা পাঠাইতাম।" চোখের জলে স্নেহসুধা-সিক্ত ঐ কয় পঙক্তি লেখা বারে বারে পড়িলাম; টাকা দশটি লইয়া মাথায় ঠেকাইলাম। তখনো আমি তাঁহাকে দেখি নাই। কাঙাল ভক্তের মত দূর হইতেই তাঁহার লেখা পড়িয়াছি, মুখস্থ করিয়াছি, শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি। সেইদিন প্রথম মানস-নেত্রে কবির স্নেহ-উজ্জ্বল মূর্তি মনে মনে রচনা করিলাম, গলায় পায়ে ফুলের মালা পরাইলাম। তাহার পর ফরিদপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে তাঁহার জ্যোতিঃ-বিমণ্ডিত মূর্তি দেখিলাম। দুই হাতে তাঁহার পায়ের তলার ধূলি কুড়াইয়া মাথায় মুখে মাখিলাম। তিনি আমায় একেবারে বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন, নিজে হাতে করিয়া মিষ্টি খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। যেন বহুকাল পরে পিতা তাহার হারানো পুত্রকে ফিরাইয়া পাইয়াছে। আজ সিরাজগঞ্জে আসিয়া বাঙলার সেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মনস্বী দেশ-প্রেমিকের কথাই বারে বারে মনে

হইতেছে। এ যেন হজ্ব করিতে আসিয়া কাবা শরীফ না দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া। তাঁহার রুহ মোবারক হয়ত আজ এই সভায় আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাঁহারই প্রেরণায় হয়ত আজ আমরা তরুণেরা এই যৌবনের আরফাত ময়দানে আসিয়া মিলিত হইয়াছি। আজ তাঁহার উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে শ্রদ্ধা তসলিম নিবেদন করিতেছি, তাঁহার দোওয়া ভিক্ষা করিতেছি।

আপনারা যে অপূর্ব অভিনন্দন আমায় দিয়াছেন, তাহার ভারে আমার শির নত হইয়া গিয়াছে, আমার অন্তরের ঘট আপনাদের প্রীতির সলিলে কানায় কানায় পূরিয়া উঠিয়াছে। সেই পূর্ণঘটে আর শ্রদ্ধা প্রতি-নিবেদনের ভাষা ফুটিতেছে না। আমার পরিপূর্ণ অন্তরের বাকহীন শ্রদ্ধা-প্রীতি সালাম আপনারা গ্রহণ করুণ। আমি উপদেশের শিলাবৃষ্টি করিতে আসি নাই। প্রয়োজনের অনুরোধে যাহা না বলিলে নয় শুধু সেইটুকু বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব।

আমি সর্বপ্রথমে বলিতে চাই, আমাদের এই তরুণ মুসলিম সম্মেলনের কোনো সার্থকতা নাই যদি আমরা আমাদের পরিপূর্ণ শক্তি লইয়া বার্ধক্যের বিরুদ্ধে, জরার বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করিতে না পারি। বার্ধক্য তাহাই—যাহা পুরাতনকে মিথ্যাকে মৃতকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই—যাহারা মায়াচ্ছন্ন নব-মানবের অভিনব জয়-যাত্রাব পথে শুধু বোঝা নয়–বিঘ্ন; শতাব্দীর নব-যাত্রীব চলাব ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচ-কাওয়াজ করিতে জানে না, পাবে না।। যাহারা জীব হইয়াও জড়। যাহারা অটল-সংস্কারের পাষাণ স্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারই– যাহারা নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ কবিয়া পড়িয়া থাকে। আলোক-পিয়াসী প্রাণ-চঞ্চল শিশুদের কল-

কোলাহলে য াহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাৎ করিতে থাকে, জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতি জ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কঙ্কালসার—বৃদ্ধ তাহারাই। ইহাদের ধর্মই বার্ধক্য। বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি—যাহাদের যৌবনের উর্দির নীচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি—যাঁহাদের বার্ধ্যকের জীর্ণাবরণের তলে মেঘ-লুপ্ত সূর্যের মত প্রদীপ্ত যৌবন। তরুণ নামের জয়-মুকুট শুধু তাহার—যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতি-বেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ়-মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড-প্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অতল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে। তারুণ্য দেখিয়াছি আরবের বেদুঈনের মাঝে, তারুণ্য দেখিয়াছি মহাসমরের সৈনিকের মুখে, কালাপাহাড়ের অসিতে, কামাল-করিম-জগলুল-সানইয়াৎ-লেনিনের 'শক্তিতে।' যৌবন দেখিয়াছি তাহাদের মাঝে—যাহারা বৈমানিক রূপে অনন্ত আকাশের সীমা খুঁজিতে গিয়া প্রাণ হারায়, আবিষ্কারক রূপে নব পৃথিবীর স ন্ধানে গিয়া আর ফিরে না, গৌরীশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষ-দেশ অধিকার করিতে গিয়া যাহারা তুষার ঢাকা পড়ে, অতল সমুদ্রের নীল মঞ্জুষার মণি আহরণ করিতে গিয়া সলিল-সমাধি লাভ করে, মঙ্গল গ্রহে চন্দ্রলোকে যাইবার পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, পবন গতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাহারা উড়িয়া যাইতে চায়, নব নব গ্রহ নক্ষত্রের সন্ধান করিতে করিতে যাহাদের নয়ন-মণি নিভিয়া যায়—যৌবন দেখিয়াছি সেই দুরন্তদের মাঝে। যৌবনের মাতৃরূপ দেখিয়াছি—শব বহন করিয়া যখন সে যায় শ্মশান-ঘাটে, গোরস্তানে, অনাহারে থাকিয়া যখন সে অন্ন পরিবেশন করে দুর্ভিক্ষ-বন্যা-পীড়িতদের মুখে, বন্ধুহীন রোগীর শয্যা-

পার্শ্বে যখন সে রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া পরিচর্যা করে, যখন সে পথে পথে গান গাহিয়া ভিখারী সাজিয়া দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য ভিক্ষা করে, যখন সে দুর্বলের পাশে বল হইয়া দাঁড়ায়, হতাশের বুকে আশা জাগায়।

ইহাই যৌবন, এই ধর্ম যাহাদের—তাহারাই তরুণ। আমাদের দেশ নাই, জাতি নাই, অন্য ধর্ম নাই। দেশকাল-জাতি-ধর্মের সীমার উর্ধ্বে ইহাদের সেনানিবাস। আজ আমরা—মুসলিম তরুণেরা যেন অকুণ্ঠিত চিত্তে মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি: ধর্ম আমাদের ইসলাম, কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য, যৌবন। আমরা সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্মের, সকল কালের। আমরা মুরীদ যৌবনের। এই জাতি-ধর্ম-কালকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে যাঁহাদের যৌবন তাঁহারাই আজ মহামানব, মহাত্মা, মহাবীর। তাঁহাদিগকে সকল দেশের, সকল ধর্মের সকল লোক সমান শ্রদ্ধা করে।

পথ-পার্শ্বের যে অট্টালিকা আজ পড়-পড় হইয়াছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেওয়াই আমাদের ধর্ম; ঐ জীর্ণ অট্টালিকা চাপা পড়িয়া বহু মানবের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। যে ঘর আমাদের আশ্রয় দান করিয়াছে তাহা যদি সংস্কারাতীত হইয়া আমাদেরই মাথায় পড়িবার উপক্রম করে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবার দুঃসাহস আছে একা তরুণেরই। খোদার দেওয়া এই পৃথিবীর নিয়ামত হইতে যে নিজেকে বঞ্চিত রাখিল, সে যত মুনাজাতই করুক, খোদা তাহা কবুল করিবেন না। খোদা হাত দিয়াছেন বেহেশ্‌ত বেহেশ্‌তী চীজ অর্জন করিয়া লইবার জন্য, ভিখারীর মত হাত তুলিয়া ভিক্ষা করিবার জন্য নয়। আমাদের পৃথিবীর আমরা আমাদের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইব! ইহাই হউক তরুণের সাধনা।

আমাদের বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে যে গোঁড়ামী, যে কুসংস্কার, তাহা পৃথিবীর আর কোনো দেশে, কোনো মুসলমানদের মধ্যে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আমাদের সমাজের কল্যাণ-কামী যে সব মৌলানা সাহেবান খাল কাটিয়া বেনো-জল আনিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি ভবিষ্যৎদর্শী হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন—বেনো-জলের সাথে সাথে ঘরের পুকুরের জলও সব বাহির হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু সেই খাল বাহিয়া কুসংস্কারের অজস্র কুমীর আসিয়া ভিড় করিয়াছে। মৌলানা মৌলবী সাহেবকে সওয়া যায়, মোল্লাও চক্ষুকর্ণ বুঁজিয়া সহিতে পারি. কিন্তু কাঠ-মোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইসলামের কল্যাণের নামে ইঁহারা যে কওমের জাতির ধর্মের কি অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা বুঝিবার মত জ্ঞান নাই বলিয়াই ইঁহাদের ক্ষমা করা যায়। ইঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই "মন-মন শাহ ফরীদ, বগলমে ইট!" ইঁহাদের নীতি "মুর্দা দোজখ-মে যায় য়্যা বেহেশ্‌ত-মে যায়, মেরা হালুয়া রুটি-সে কাম।"

"দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল" নীতি অনুসরণ না করিলে সভ্য-জগতের কাছে আমাদের ধর্ম, জাতি আরো লাঞ্ছিত ও হাস্যাস্পদ হইবে। ইহাদের ফতুয়া-ভরা ফতোয়া! বিবি তালাক ও কুফরীর ফতোয়া ত ইদাদের জাম্বিল হাতড়াইলে দুই দশ গণ্ডা পাওয়া যাইবে। এই ফতুয়া-ধারী ফতোয়া-বাজদের হাত হইতে গরীবদের বাঁচাইতে যদি কেহ পারে ত সে তরুণ! ইহাদের হাতের "আষা" বা যষ্টি মাঝে মাঝে অজদাহা রূপ পরিগ্রহ করিয়া তরুণ মুসলিমদের গ্রাস করিতে আসিবে সত্য, কিন্তু এই 'আষা" দেখিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিলে চলিবে না। এই ঘরোয়া-যুদ্ধ—ভাই-এর সহিত আত্মীয়ের সহিত যুদ্ধই— সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক। তবু উপায় নাই। যত বড় আত্মীয়ই হোক, তাহার

যক্ষ্মা বা কুষ্ঠ হইলে তাহাকে অন্যত্র না সরাইয়া উপায় নাই। যে হাত বাঘে চিবাইয়া খাইয়াছে, তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া প্রাণরক্ষার উপায় নাই। অন্তরে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিয়াই এ-সব কথা বলিতেছি। চোগা-চাপকান দাড়ি-টুপি দিয়া মুসলমান মাপিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর আর সব দেশের মুসলমানদের কাছে আজ আমরা অন্ততঃ পাঁচ শতাব্দী পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি। যাঁহারা বলেন, "দিন ত চলিয়া যাইতেছে, পথ ত চলিতেছি," তাহাদের বলি—ট্রেন মোটর এরোপ্লেনের যুগে গরুর গাড়ীতে শুইয়া দুই ঘণ্টায় এক মাইল হিসাবে গদাইলস্করী চালে চলিবার দিন আর নাই। যাহারা আগে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের সঙ্গ লইবার জন্য যদি আমাদের একটু অতিমাত্রায় দৌড়াইতে হয়, এবং তাহার জন্য পায়জামা হাঁটুর কাছে তুলিতে হয়, তাই না হয় তুলিলাম। ঐ টুকুতেই কি আমার ইমান বরবাদ হইয়া গেল? ইসলামই যদি গেল, মুসলিম যদি গেল, তবে ইমান থাকিবে কাহাকে আশ্রয় করিয়া? যাক্, আর শত্রু বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। তবে ভরসা এই যে, বিবি তালাকের ফতোয়া শুনিয়াও কাহারও বিবি অন্ততঃ বাপের বাড়ীও চলিয়া যায় নাই। এবং কুফরী ফতোয়া দেওয়া সত্ত্বেও কেহ "শুদ্ধি" হইয়া যান নাই।

আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল। আমাদের দুয়ারের সামনের এই ছেঁড়া চট যে কবে উঠিবে খোদা জানেন। আমাদের বাঙলা দেশের স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ, তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে, তাহাকে একেবারে শ্বাস-রোধ বলা যাইতে পারে। এই জুজুবুড়ীর বালাই শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও যেভাবে পাইয়া বসিয়াছে, তাহাতে ইহাকে তাড়াইতে বহু সরিষা-পোড়া ও ধোঁয়ার দরকার হইবে। আমাদের অধিকাংশ

শিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত লোকই চাকুরে, কাজেই খরচের সঙ্গে জমার অংক তাল সামলাইয়া চলিতে পারে না। অথচ ইঁহাদেরই পর্দার ফখর সর্বাপেক্ষা বেশী। আর ইঁহাদের বাড়ীতে শতকরা আশিজন মেয়ে যক্ষ্মায় ভুগিয়া মরিতেছে আলো-বায়ুর অভাবে। এই সব যক্ষ্মা-রোগগ্রস্তা জননীর পেটে স্বাস্থ্য-সুন্দর প্রতিভা-দীপ্ত বীর সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে কেমন করিয়া। ফাঁসির কয়েদীরও এই সব হত-ভাগিণীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা আছে। আমরা ইসলামী সেই অনুশাসনগুলির প্রতিই জোর দিয়া থাকি, যাহাতে পয়সা খরচ হইবার ভয় নাই।

কন্যাকে পুত্রের মতই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ, তাহা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিণীদের চির-বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শত শত বর্ষের এই অত্যাচারে ইহাদের দেহ-মন এমনি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে ইহারাই সর্বপ্রথম বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে। ইহাদের কি দুঃখ, কিসের যে অভাব, তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত ইহাদের উঠিয়া গিয়াছে। আমরা মুসলমান বলিয়া ফখর করি, অথচ জানি না— সর্বপ্রথম মুসলমান নর নহে—নারী।

বৃদ্ধদের আয়ুর পুঁজি ত ফুরাইয়া আসিল, এখন আমাদের— তরুণদের সাধনা হউক আমাদের এই চির-বন্দিনী মাতা-ভগ্নিদের উদ্ধার সাধন। জন্ম হইতে দাঁড়ে বসিয়া যে পাখা দুধ-ছোলা খাইয়াছে, সে ভুলিয়া গিয়াছে যে, সেও উড়িতে পারে। বাহিরে তাহারই স্বজাতি পাখীকে উড়িতে দেখিয়া অন্য কোন জীব বলিয়া ভ্রম হয়। এই পিঞ্জরের পাখীর দ্বার মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। খোদার দান এই আলো-বাতাস হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত

করিবার অধিকার কাহারও নাই। খোদার রাজ্যে পুরুষ আজ জালিম, নারী আজ মজলুম। ইহাদেরই ফরিয়াদে আমাদের এই দুর্দশা, আমাদের মত হীনবীর্য সন্তানের জন্ম।

শুধু কি ইহাই? আমাদের সম্মুখে কত প্রশ্ন, কত সমস্যা, তাহার উত্তর দিতে পারে তরুণ, সমাধান করিতে পারে তরুণ। সে বলিষ্ঠ মন ও বাহু আছে একা তরুণের। সম্মুখে আমাদের পর্বত প্রমাণ বাধা, নিরাশার মরুভূমি, বিধি-নিষেধের দুস্তর পাথার; এই সব লঙ্ঘন করিয়া অতিক্রম করিয়া যাইবার দুঃসাহসিকতা যাহাদের—তাহারা তরুণ।

ইহার জন্য চাই আমাদের একাগ্রতা, একনিষ্ঠ সাধনা, চাই সঙ্ঘ। আজ আমরা, বাঙলার মুসলিম তরুণেরা যূথভ্রষ্ট! আমাদের সঙ্ঘ নাই, সাধনা নাই, তাই সিদ্ধিও নাই। আমাদেরই চারিপাশে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু যুবকদের দেখিতেছি—কি অপূর্ব তাহাদের ঐক্য, ত্যাগ, সাধনা। তাহারা সকলে যেন এক দেহ, এক প্রাণ। সকল বৈষম্য বিরোধের উর্ধ্বে তাহারা তাহাদের যে সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। জগতের যে কোনো যুব-আন্দোলনের সঙ্গে তাহারা আজ চ্যালেঞ্জ করিতে পারে। এই সংঘ প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূলে কত বিপুল ত্যাগ স্বীকার রহিয়াছে তাহা হয়ত আমরা অনেকেই জানি না। ইহারা পিতা-মাতার স্নেহ, ভাই-ভগ্নির প্রীতি, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের ভালোবাসা, প্রিয়ার বাহু-বন্ধন, গৃহের সুখ-শান্তি, ঐশ্বর্যের বিলাস, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মোহ, সমস্ত ত্যাগ করিয়াছে জাতির জন্য, দেশের জন্য, মানবের কল্যাণের জন্য। এই তরুণ বীর সন্ন্যাসীর দল আছে বলিয়াই আজও আমরা দিনের আলোকে মুখ দেখিতে পাইতেছি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া ইহারা নচিকেতার মত প্রশ্ন করে, মৃত্যুর বজ্রমুষ্টি হইতে জীবনের সঞ্জীবনী ছিনাইয়া আনে। এই বনচারী

বীরাচারীর দলই দেশের যৌবনে ঘুণ ধরিতে দেয় নাই!-----আমাদের মত ইহাদের স্কন্ধে চাকুরীর দৈত্য সিন্ধবাদের মত চাপিয়া বসে নাই। ইহারাই সত্যকার আজাদ, বাঁধনহারা। সকল বন্ধন সকল মায়াকে অস্বীকার করিয়া তবে আজ ইহারা এত বড় হইয়া উঠিয়াছে। ইউনিভার্সিটীর কত উজ্জ্বলতম রত্ন—যাহারা আজ অনায়াসে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যারিষ্টার প্রফেসর হইয়া নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করিত -তাহারা রাস্তায় প্রাণ ফিরি করিয়া ফিরিতেছে। ইহারা আছে বলিয়াই ত মেরুদণ্ডহীন বাঙালী জাতি আজও টিকিয়া আছে। দীপ শলাকার মত ইহারা নিজেদের আয়ু ক্ষয় করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রাণ-প্রদীপ জ্বালাইয়া তুলিতেছে।----আমাদের মুসলমান তরুণেরা লেখাপড়া করে, জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, চাকুরী অর্জনের জন্য। গাধার "ফিউচার প্রসপেক্টের" মত আমরা ঐ চাকুরীর দিকে তীর্থের কাকের মত হা করিয়া চাহিয়া আছি। বি·এ, এম-এ, পাশ করিয়া কিছু যদি না হই অন্ততঃ সাবরেজিষ্টার বা দারোগা হইবই হইব, এই যাহাদের লক্ষ্য, এত স্বল্প যাহাদের আশা, এত নিম্নে যাহাদের গতি—তাহাদের কি আর মুক্তি আছে? এই ভূত ছাড়িয়া না গেলে আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইব। এই ভূতকে ছাড়াইবার ওঝা আপনারা যুবকের দল। আমাদেরই প্রতিবেশী তরুণ শহীদদের আদর্শ যদি আমরা গ্রহণ করিতে না পারি, তা হইলে আমাদের স্থান সভ্য জগতের কোথাও নাই। চাকুরীর মোহ, পদবীর নেশা, টাইটেলের বা 'টাই' ও 'টেলে'র মায়া যদি বিসর্জন না করিতে পারি, তবে আমাদের সংঘ প্রতিষ্ঠার আশা সুদূর-পরাহত। কোথায় আছ সেই শহীদের দল? বাহিরিয়া আইস আজ এই মুক্ত আলোকে, উদার আকাশের নীল চন্দ্রাতপ-তলে। তোমাদের অস্থি-মজ্জা-প্রাণ-দেহ, তোমাদের সঞ্চিত

জ্ঞান, অর্জিত ধন-রত্নের উপর প্রতিষ্ঠা হইবে আমাদের সংঘের—তরুণ সংঘের। সকল লাভ-লোভ-যশ-খ্যাতিকে পদদলিত করিয়া মুসাফিরের বেশে ভিক্ষুকের ঝুলি লইয়া যে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে—এ সাধনা তাহারই, এ শহীদী দরজা শুধু তাহারই।

আমাদের লক্ষ্য হইবে এক, কিন্তু পথ হইবে বহুমুখী। যে দুর্ধর্ষ, সে কাল-বৈশাখীর কেতন উড়াইয়া অসম্ভবের অভিযানে যাত্রা করুক; যে বীর তাহার জন্য রহিয়াছে সংগ্রামক্ষেত্র; যে কর্মী তাহার জন্য পড়িয়া রহিয়াছে কর্মের বিপুল উপত্যকা; কিন্তু যে ধ্যানী যে সুন্দরের পূজারী, সে কল্প-পাখায় ভর করিয়া উড়িয়া যাক স্বপ্ন-লোকে, উদার নিঃসীম নীল নভে। সেই স্বপ্নপুরী হইতে সে যে স্বপন-কুমারীকে রূপ-কুমারীকে জয় করিয়া আনিবে তাহার লাবণীতে আমাদের কর্মক্লান্ত ক্ষণগুলি স্নিগ্ধ হইয়া উঠিবে। যে গাহিতে জানে, গানের পাখী যে, তাহাকে ছাড়িয়া দিব দূর-বিথার বনানীর কোলে—আমাদেরই আশে-পাশে থাকিয়া আমাদের অবসাদক্লিষ্ট মুহূর্তকে সে গানে গানে ভরিয়া তুলিবে, প্রাণে নব প্রেরণার সঞ্চার করিবে। ইহারা আমাদের সুন্দর সাথী। বাড়ীর উঠানের ফুলে ফুলে ফুল্ল লতাটির পানে চাহিয়া যেমন রৌদ্র-দগ্ধ চক্ষু জুড়াইয়া লই, তেমনি করিয়া ইহাদের কবিতায় গানে ছবিতে আমরা আমাদের বুভুক্ষু অন্তরের তৃষা মিটাইব, অবসাদ ভুলিব।

বিধি-নিষেধের বাধা আমরা মানিব না। গান গাওয়াই যাহার স্বভাব, সেই গানের পাখীকে কোন্ অধিকারে গলা টিপিয়া মারিতে যাইব? সুন্দরের সৃষ্টির শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে, কে তাহার সৃষ্টিকে হেরিয়া কুফরীর ফতোয়া দিবে?

এই খোদার উপর খোদকারী আর যারা করুক, আমরা করিব না।

পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান-প্রধান দেশের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, এই ভারতেরই সকল প্রদেশের আজও যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ গুণী —কি কণ্ঠ-সঙ্গীতে, কি যন্ত্র-সঙ্গীতে—তাঁহাদের প্রায় সকলেই মুসলমান।

অথচ সে দেশের মৌলভী মৌলানা সাহেবান আমাদের দেশের মৌলভী সাহেবানদের অপেক্ষাও জবরদস্ত। তাঁহারা ঐসব গুণীদেরে অপমান বা সমাজচ্যুত করিয়াছেন বলিয়া জানি না। বরং তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান করেন বলিয়াই জানি। সঙ্গীত-শিল্পের বিরুদ্ধে মোল্লাদের সৃষ্টি এই লোকমতকে বদলাইতে তরুণদের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যাহা সুন্দর তাহাতে পাপ নাই। সকল বিধি-নিষেধের উপরে মানুষের প্রাণের ধর্ম বড়।

আজ বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে একজনও চিত্র-শিল্পী নাই, ভাস্কর নাই, সঙ্গীতজ্ঞ নাই, বৈজ্ঞানিক নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি আছে? এই সবে যাহারা জন্মগত প্রেরণা লইয়া আসিয়াছিল, আমাদের গোঁড়া সমাজ তাহাদের টুটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া যুঝিতে হইবে। নতুবা আর্টে বাঙ্গালী মুসলমানের দান বলিয়া কোনো কিছু থাকিবে না। পশুর মত সংখ্যা-গরিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া আমাদের লাভ কি, যদি আমাদের গৌরব করিবার কিছুই না থাকে। ভিতরের দিকে আমরা যত মরিতেছি, বাহিরের দিকে তত সংখ্যায় বাড়িয়া চলিতেছি। এক মাঠ আগাছা অপেক্ষা একটি মহীরুহ অনেক বড়—শ্রেষ্ঠ।

আমার অভিভাষণ হয়ত অতিভাষণ হইতে চলিল। আমার শেষ কথা—আমরা যৌবনের পূজারী, নব নব সম্ভাবনার

অগ্রদূত, নব নবীনের নিশানবর্দার। আমরা বিশ্বের সর্বাগ্রে চলমান জাতির সহিত পা মিলাইয়া চলিব। ইহার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে যে, বিরোধ আমাদের শুধু তাহার সাথেই। ঝঞ্ঝার নূপুর পরিয়া নৃত্যায়মান তুফানের মত আমরা বহিয়া যাইব। যাহা থাকিবার তাহা থাকিবে, যাহা ভাঙ্গিবার তাহা আমাদের চরণাঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িবেই। দুর্যোগ রাতের নিরন্ধ্র অন্ধকার ভেদ করিয়া বিচ্ছুরিত হউক আমাদের প্রাণ-প্রদীপ্তি! সকল বাধা-নিষেধের শিখর-দেশে স্থাপিত আমাদের উদ্ধত বিজয়-পতাকা। প্রাণের প্রাচুর্যে আমরা যেন সকল সঙ্কীর্ণতাকে পায়ে দলিয়া চলিয়া যাইতে পারি।

আমরা চাই সিদ্দিকের সাচ্চাই, উমরের শৌর্য ও মহানুভবতা, আলির জুলফিকার, হাসান-হোসেনের ত্যাগ ও সহনশীলতা। আমরা চাই খালেদ-মুসা-তারেকের তরবারি, বেলালের প্রেম। এইসব গুণ যদি অর্জন করিতে পারি, তবে জগতে যাহারা আজ অপরাজেয় তাহাদের সহিত আমাদের নামও সসম্মানে উচ্চারিত হইবে।

প্রতি-নমস্কার

(১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে চট্টগ্রাম বুলবুল সোসাইটির পক্ষ থেকে কবি নজরুল ইসলামকে যে মানপত্র দেওয়া হয়, তার উত্তরে কবি এই প্রতিভাষণ প্রদান করেন।)

ওগো বুলবুলিস্তানের নব বৈতালিক দল!

তোমরা আমার সানুরাগ প্রতি-নমস্কার গ্রহণ কর!

তরবারি গ্রহণ করতে হয় উচ্চশিরে—উদ্ধত হস্ত তুলে'; মালা গ্রহণ করতে হয় উচ্চশির অবনমিত ক'রে—উদ্ধত হস্ত যুক্ত ক'রে ললাটে ঠেকিয়ে।

তোমাদের যুক্ত-করের অঞ্জলির বিনিময়ে আমার যুক্ত-করের রিক্ত নমস্কার গ্রহণ কর।

তোমাদের এই দানের বিনিময়ে আমি যেন আমার গানের পাত্র পূর্ণ ক'রে তোমাদের ভেট দিতে পারি।

তোমরা নতুন বাগিচার নতুন বুলবুলি, তোমরা চাও শুধু রসের মধু, রূপের কুসুম, প্রাণের গুল-বাগিচা।---- তত্ত্ব-কথার ঢিল ছুঁড়ে আমি তোমাদের গীত-লোকে, ধেয়ানকুঞ্জে উৎপাতের সৃষ্টি করব না। তোমাদের রূপের হাটে রসের বাজারে আমি ক'রে যাব আমার পরিপূর্ণ হৃদয়ের স্তব-গান।

এই ক্ষণিকের অতিথি গানের পাখীকে তোমরা যে ফুলের সওগাত দিলে—ওগো বাহার-গুলিস্তানের উদাসী শিশুর দল, তার প্রত্যুত্তরে আমার একমাত্র সম্বল গান ছাড়া ত দেবার কিছুই নেই।---- আমার গানে যদি তোমাদের বনের কুসুম মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে, সেই ত আমার শ্রেষ্ঠ অভিবন্দনা।

সেদিন আমার কণ্ঠে হলাহলের তিক্ততা উঠেছিল, সেই

সুরাসুরের সাগর-মন্থনের প্রখর মধ্যাহ্নেও তোমরা নির্ভীক শিশুর দল আমার নীলকণ্ঠের কণ্ঠহার রচনা করেছিলে। আবার আজ যখন মৃতের শ্মশানচারী আমি অমৃতের সুর-লোকে যাত্রা শুরু করেছি, সেদিনও তোমরা এসেছ তোমাদের অর্ঘ্যের নির্মাল্য নিয়ে।

হে ভয়ে-নির্ভীক আনন্দে-শান্ত দেবশিশুর দল, তোমরা আমার প্রণম্য। আমার অভিবাদন গ্রহণ কর!

যে জবাকুসুম-সঙ্কাশ নবারুণের আদি উদয় দেখে বনের তাপস-বালকেরা স্তব-গানে শান্ত আকাশকে মুখর ক'রে তুলেছিল, সেই তাপস-কুমারদেরে আমি তোমাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করছি। আমি গানের পাখী, অনাগত অরুণোদয়ের স্পন্দন আমার কণ্ঠে গান হয়ে ফুটে উঠেছে—'সরাইখানার ঘুমন্ত মুসাফির, জাগো! সূর্যোদয়ের আর দেরী নেই. বন্ধু জাগো!" আমার গান শুনে' এই তন্দ্রাহত আলোক-বঞ্চিত মুসাফিরদের আগে জেগে ওঠ তোমরা—জীবন-শিশুর দল। তোমাদের সেই জাগর-চঞ্চল গানই হবে আমার সুন্দরতম আমন্ত্রণ-গাথা।

আমায় সাদর সম্ভাষণ করেছে তোমাদেরও আগে তোমাদেরি গিরি-সিন্ধু-নদী-কান্তার পরিশোভিত পরীস্থান।- - — - তোমাদেরি গিরিরাজের কোলের কাছটিতে সর্ষে-ফুলের আঁচল বিছিয়ে যে উদাসিনী বালিকাকে নদীর ঢেউ-খেল'নো চুল এলিয়ে বসে থাকতে দেখেছি, আমায় সর্বপ্রথম মৌন অভিনন্দন জানিয়েছে সে।- - - - তোমাদের কর্ণফুলীর তরঙ্গে যে তরুণী তার ভরা যৌবনের স্বপ্ন বিছিয়ে, কাননের কুন্তল এলিয়ে ঘুমিয়ে আছে, আমায় সর্বপ্রথম আমন্ত্রণ-লিপি পাঠিয়েছে সে-ই – তার সাম্পান মাঝির হাতে।- - - বুকে বাড়ব-কুণ্ডের হোমাগ্নি জ্বালিয়ে তোমাদের গিরিরাজি যে নব-সৃষ্টির ধ্যানে সমাধিমগ্ন, আমায় সর্বাগ্রে আশীষ জানিয়েছে তাদেরি ঊর্ধ্ববাহু দেওদার শাল পিয়াল

শাল্মলী সেগুন।-----তোমাদের বনে বনে ঘুরে ফেরে যে বালিকা বনলক্ষ্মী তার হলদে-পাখী বৌ-কথা-কও পিক্-পাপিয়ার নূপুর-কাঁকন বাজিয়ে, গুবাক-তরুর হাতছানি দিয়ে আমায় সবার আগে ডেকেছে সেই আলুলায়িত-কুন্তলা কপাল কুণ্ডলা।----তোমাদের উদার আকাশ মেঘের আল্পনা এঁকে আমার আসন রচনা করেছে, চণ্ড-বৃষ্টি-প্রপ্রাত-ছন্দে তোমাদের আসমানী মেয়েরা আমার শিরে পুষ্প-বৃষ্টি করেছে, তোমাদের জলপ্রপ্রাত নির্ঝরিণী আমার গজল-গানে সুর দিয়েছে, তোমাদের সিন্ধু-হিন্দোল আমার রক্তে নতুন দোলা দিয়েছে—তার ভাটির টানে আমায় অতলতলে টেনে নিয়ে গেছে!---- আমার আর অন্য অভিনন্দনের প্রয়োজন ছিল না।

আমার জন্য যদি আসনই দাও তোমরা, তবে তা যেন বুকের আসন হয় বন্ধু, সভার কোলাহলের নির্বাচন আমি চাই না!

কোনোদিন তোমাদের ঋণ পরিশোধ করতে পারব—এ ঔদ্ধত্য আমার নেই, সম্বলও নেই। আমি যাযাবর-কবি, আমার ঝুলি ভ'রে যে পাথেয় দিলে তোমরা, তাই যেন আমার ভাবী পথের সহায় হয়।

বিনিময়ে আমি রেখে গেলাম তোমাদের সিন্ধুতে তোমাদের কর্ণফুলীতে আমার দুই বিন্দু অশ্রু। তোমাদের হাতের দানকে চোখের জলে ভিজিয়ে গেলাম!

জীবনে কোন সাধই ত পূর্ণ হ'ল না; ভবিষ্যতে যে হবে, সে আশাও রাখিনে। তবু এই প্রার্থনাই ক'রে যাই আজ তোমাদের সিন্ধু-বেলায় দাঁড়িয়ে যে, মরতেই যদি হয় তবে শেলীর মত তোমাদের এই সিন্ধু-জলেই যেন আমার সে মৃত্যু-দেবতার দর্শন পাই।

বুলবুল,
বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৩১।

মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা

(১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম এই অভিভাষণ প্রদান করেন।)

আজ আপনাদের কাছে দাঁড়িয়ে সব চেয়ে আগে মনে হচ্ছে কবির একটা লাইন, "ঝড় আসে নিমিষের ভুল।" সেদিনের পশ্চিমে-ঝড় যখন এসেছিল বদ্ধ দ্বারের জিঞ্জীরে নাড়া দিতে, সেদিন যখন সে বহিরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে গেয়েছিল :

"কারাগারের দ্বারী গেলে
তখনি কি মুক্তি মেলে ?
আপনি তুমি ভেতর থেকে
চেপে আছ দ্বারখানা।"

তখন আপনারা তাকে বরণ করেছিলেন খাঞ্চা-ভরা সওগাত, রেকাবী-ভরা শিরণি দিয়ে, শিরীণ নজরের নজরানা দিয়ে। আপনাদের হাতের ফুলে তার কণ্ঠের নীল বুকের কাঁটা ঢাকা পড়ে গেছিল। আপনাদের শিরোপার ভারে তার শির সেদিন আপনি নুয়ে পড়েছিল। সে-বার শুধু সে তার সশ্রদ্ধ সালাম নিবেদন করা ছাড়া প্রতিদানে কিছুই দিয়ে যেতে পারেনি।

আজ সে আবার এসেছে সেই পরিচিত দুয়ারে—ফুলের লোভে নয়, মালার আশায় নয়, তার স্মরণ-তীর্থ জিয়ারত করতে। সে-বারে সে বলেছিল :

খুলব দুয়ার মন্ত্র বলে,
তোদের বুকের পাষাণ-তলে
বন্দিনী যে ঝর্ণাধারা
মক্তি দেবো মুক্তি তায়।

হারিয়ে গেছে দোরের চাবি,
তাই কেঁদে কি লোক হাসাবি ?
আঘাত হেনে খুলব দুয়ার,
আয় যাবি কে সঙ্গে আয় !
দ্বারের মায়া ক'রে তোরা
বন্দী র'বি নিজ কারায় ?
নাই ক চাবি, হাত আছে তোর,
খুলব দুয়ার তার সে ঘায়।

সেই ঝড় আবার এসেছে—হয়ত বা তেমনি নিমেষের ভুলেই। এবার সেই ঝোড়ো হাওয়া এসেছে "পূবের হাওয়া" হয়ে। তার রূপ সুর দুই-ই হয়ত বদলে গেছে। আজ হয়ত সে বলতে চায় :

"ঘা দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান গেয়ে দ্বার খুলবো !"

সে-বার যে এসেছিল তরবারির বোঝা নিয়ে, এবার সে এসেছে ফুল-ফোটানোর মন্ত্র শিখে।

এমনিই হয়। ফাল্গুনের মলয়-সমীর বৈশাখে দেখা দেয় কালবৈশাখী-রূপে, শ্রাবণে সেই আসে পূবের হাওয়া হয়ে। হৈমন্তীর আঁচল ভরে ওঠে তারি শিশিরাশ্রুতে, আঁচল দুলে ওঠে তারি হিমেল হাওয়ায়। পউষে তারি দীর্ঘশ্বাস পাতা ঝরায়।

* * *

ফুল ফোটানোই আমার ধর্ম। তরবারি হয়ত আমার হাতে বোঝা, কিন্তু তাই ব'লে তাকে ফেলেও দিইনি। আমি গোধূলি-বেলায় রাখাল-ছেলের সাথে বাঁশী বাজাই, ফজরে মুয়াজ্জিনের সুরে সুর মিলিয়ে আজান দিই, আবার দীপ্ত মধ্যাহ্নে খর তরবার নিয়ে রণভূমে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তখন আমার খেলার বাঁশী হয়ে ওঠে যুদ্ধের বিষাণ, রণশিঙ্গা।

সুর আমার সুন্দরের জন্য, আর তরবারি সুন্দরের অবমাননা করে যে—সেই অসুরের জন্য।

কিন্তু কিছু বলবার আগে আমি স্মরণ করি সেই বিরাট পুরুষকে, যাঁর কীর্তি শুধু তাঁকেই মহিমান্বিত করেনি, আপনাদের চট্টলবাসী মুসলমানদের—তথা বাঙলার সারা মুসলিম-সমাজকে নরনারী-নির্বিশেষে মহিমান্বিত করেছে। তিনি আপনাদেরই এবং আমাদেরও পুণ্যশ্লোক মরহুম খানবাহাদুর আবদুল আজিজ সাহেব। শাহজাহানের তাজমহল গড়ে উঠেছিল শুধু মোম-তাজের ভালবাসাকে কেন্দ্র ক'রে—তাজমহল সুন্দর। কিন্তু এই আত্মভোলা পুরুষের তাজমহল গড়ে উঠেছে সকল কালের সকল মানুষের বেদনাকে কেন্দ্র ক'রে। এ তাজমহল শুধু beautiful নয়, এ sublime—মহিমময়!

ব্যক্তিগত জীবনে আমি তাঁকে জানবার সুবিধা পাইনি। চাঁদ দেখিনি, কিন্তু সমুদ্রের জোয়ার দেখেছি। জোয়ার শুধু পূর্ণিমার চাঁদই জাগায় না, মৃত্যুর অমাবস্যার অন্তরালে ঢাকা পড়ে যে চাঁদ—সেও জোয়ার জাগায়। তাঁকে দেখিনি, কিন্তু তাঁকে অনুভব করেছি এবং আজও করছি আপনাদের জাগ-রণের মাঝে—আমাদের নারী-জাগরণের উদয়-বেলায়।

এমনি ক'রে এক একটা সর্বভোলা সর্বত্যাগী মানুষ আসে আমাদের মাঝে। আমাদের স্বার্থের কালো চশমা দিয়ে তখন তাঁকে দেখি মলিন ক'রে। তাঁকে বলি হয় পাগল নয় স্বার্থপর। কোকিল যখন আসে বাগে বাহারের খোশ-খবরী নিয়ে, কর্তব্য-পরায়ণ কাক তখন দল বেঁধে তাকে তাড়া করে। তার গানকে তারা মনে করে উৎপাত। অভিমানী কোকিল বসন্ত শেষে উড়ে যায় নতুন বুলবুলিস্তানের সন্ধানে, তখন সারা কানন জুড়ে জাগে বিরাট একটা অভাব-বোধ, পেয়ে হারানোর তীব্র বেদনা।

পাখী উড়ে যায়—তারপর আসে সেই সুদিন যার আগমনী গান সে গেয়েছিল। তখন সেই সুদিনের সুন্দর আলোকে স্মরণ করি সেই সকলের-আগে-জাগা গানের পাখীকে। কিন্তু পাখী তখন থাকে না ক, থাকে পাখীর স্বর।

আমি তাঁরির মত গানের পাখী—আপনাদের এই স্মরণ-বেলায় আমিও এসেছি তাই তীর্থযাত্রী হয়ে তাঁকেই স্মরণ করতে—যিনি আমাদের বহু আগে জেগেছিলেন। তাঁর পাক কদমে আমার হাজার সালাম।

তিনি আজ আমার সালাম নিবেদনের বহু ঊর্ধ্বে, বহু দূরে; তবু এ ভরসা রাখি যে, আমার এই অকূলে ভাসিয়ে দেওয়া ফুল তাঁর চরণ ছুঁয়ে ধন্য হবেই। আমি জানি, এ বিশ্বে কোন কিছুই নশ্বর নয়, কোনো কিছুই হারায় না কোনো দিন। যে-রূপে যে-লোকেই হোক তিনি আছেন, এবং আমার এই ভাসিয়ে-দেওয়া সালামী-ফুলও সেই না-জানার অকূলে কূল পাবেই পাবে।

আমরা বড় কাউকে যখন হারাই, তখন তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি—তাঁর সৃষ্টিকে তাঁর সাধনাকে শ্রদ্ধা ক'রে, তাঁকে বাঁচিয়ে রেখে। যে বিরাট আত্মার নৈকট্য থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি, তার দুঃখ বহু পরিমাণে ভুলতে পারব, যদি তাঁরই অসমাপ্ত সাধনাকে আমাদের সাধনা বলে' গ্রহণ করতে পারি। চট্টলের আজিজ নাই, কিন্তু বাঙলার আজিজরা— দুলাল ছেলেরা আজও বেঁচে আছে— তাদেরই মধ্যে তাঁকে ফিরে পাব পরিপূর্ণরূপে, এই হোক আপনাদের— এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সাধনা। এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার নেই।

তাঁর কাজ তিনি ক'রে গেছেন। তাঁর 'বাহারে'র মত বাহার হয়ত বা থাকতেও পারে, কিন্তু তাঁর 'নাহারে'র মত

'নাহার' আপনাদের চট্টলের মুসলমানের ঘরে কয়টি আছে আমার জানা নেই।

তিনি সুর ধরিয়ে দিয়ে গেছেন, এখন একে 'সমে' পৌঁছে দেওয়া আপনাদের কাজ। উস্তাদ নেই, শিষ্যরা ত আছেন। একজন উস্তাদের অভাব কি শত শিষ্যেও পূরণ করতে পারবে না?

বন্ধু-বান্ধব অনেকের কাছেই শুনেছি আপনাদের উস্তাদের লক্ষ্য ছিল অসীম, আশা ছিল বিপুল, আকাঙ্খা ছিল বিরাট।

সাগর যাদের চরণ ধোয়ায়, পর্বতমালা যাদের শিয়রের বিনিদ্র প্রহরী, নদী-নির্ঝরিণী যাদের সেবিকা, অগ্নিগিরি যাদের বুকের ওপর, উচ্ছল জলপ্রপাত যাদের অবিনাশী প্রাণ-ধারা, কানন-কুঞ্জ যাদের শ্রী-নিকেতন, বন্য-হিংস্র শার্দুল-সর্প যাদের নিত্য সহচর, তারা সেই মহান পুরুষের বিরাট দায়িত্বকে গ্রহণ করতে ভয় করে—এ কথা আর যে বলে বলুক, আমি বলব না।

* * *

আপনাদের শিক্ষা-সমিতিতে এসেছি আমি আর একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। সে হচ্ছে, আপনাদের সমিতির মারফতে বাঙলার সমগ্র মুসলিম সমাজের, বিশেষ ক'রে ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে,—আমি যে মহান স্বপ্ন দিবা-রাত্রি ধরে দেখেছি—তাই বলে যাওয়া। এ স্বপ্ন যে একা আমারই, তা নয়। এই স্বপ্ন বাঙলার তরুণ মুসলিমের, প্রবুদ্ধ ভারতের, এ স্বপ্ন বিংশ শতাব্দীর নব-নবীনের। আমি চাই, আপনাদের এই পার্বত্য উপত্যকায় সে স্বপ্ন রূপ ধরে উঠুক।

আমি চাই, এই পর্বতের বিবর থেকে বেরিয়ে আসুক তাজা তরুণ মুসলিম, যেমন ক'রে শীতের শেষে বেরিয়ে আসে জরার খোলস ছেড়ে বিষধর ভুজঙ্গের দল। বিশ্বের এই নব অভ্যুদয়-

দিনে সকলের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলুক আমার নিদ্রোত্থিত ভাইরা।

আপনাদের সমিতির উদ্দেশ্য হোক: আদাওতি ক'রে আসন জয় করা নয়—দাওত দিয়ে মনের সিংহাসন অধিকার করা।

আপনাদের ইসলামাবাদ হোক ওরিয়েন্টাল কালচারের পীঠস্থান—আর্‌ফাত ময়দান। দেশ-বিদেশের তীর্থযাত্রী এসে এখানে ভিড় করুক। আজ নব জাগ্রত বিশ্বের কাছে বহু ঋণী আমরা, সে ঋণ আজ শুধু শোধই করব না—ঋণ দানও করব, আমরাও আমাদের দানে জগৎকে ঋণী করব—এই হোক আপনাদের চরম সাধনা। হাতের তালু আমাদের শূন্য পানেই তুলে ধরেছি এতদিন, সে লজ্জা আজ আমরা পরিশোধ করব। আজ আমাদের হাত উপুড় করবার দিন এসেছে। তা যদি না পারি, সমুদ্র বেশী দূরে নয়, আমাদের এ-লজ্জার পরিসমাপ্তি যেন তারি অতল জলে হয়ে যায় চিরদিনের তরে। আমি বলি, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মত আমাদেরও কালচারের সভ্যতার জ্ঞানের সেণ্টার কেন্দ্রভূমির ভিত্তি স্থাপনের মহৎ ভার আপনারা গ্রহণ করুন—আমাদের মত শত শত তরুণ খাদেম তাদের সকল শক্তি-আশা-আকাঙ্খা জীবন অঞ্জলির মত ক'রে আপনাদের সে উদ্যমের পায়ে অর্ঘ্য দেবে।

প্রকৃতির এই লীলাভূমি সত্য সত্যই বুল্‌বুলিস্তানে পরিণত হোক—ইরাণের শিরাজের মত। শত শত সাদি, হাফিজ, খৈয়াম, রুমী, জামী, শমশি-তবরেজ এই শিরাজবাগে—এই বুলবুলিস্তানে জন্মগ্রহণ করুক। সেই দাওতের আমন্ত্রণের গুরুভার আপনারা গ্রহণ করুন। আপনারা রুদকীর মত আপনাদের বদ্ধ প্রাণ-ধারাকে মুক্তি দিন।

আমি এইরূপ "কালচারাল সেণ্টারের" প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নানা কারণে। একটি কারণ তার রাজনৈতিক।

পলিটিক্সের নাম শুনে কেউ যেন চমকে উঠবেন না। আমি জানি, আপনাদের এই সমিতি রাজনীতি আলোচনার স্থান নয়, তবু যেটুকু না বললে নয়, আমি শুধু ততটুকুই বলব। এবং সেটুকু কারুর কাছেই ভয়াবহ হয়ে উঠবে না। আমি তাই একটু খুলে বলব মাত্র।

ভারত যে আজ পরাধীন এবং আজো যে স্বাধীনতার পথে তার যাত্রা শুরু হয়নি—শুধু আয়োজনেরই ঘটা হচ্ছে এবং ঘটও ভাঙছে—তার একমাত্র কারণ আমাদের হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও অশ্রদ্ধা। আমরা মুসলমানেরা আমাদেরই প্রতিবেশী হিন্দুর উন্নতি দেখে হিংসা করি, আর হিন্দুরা আমাদের অবনত দেখে আমাদের অশ্রদ্ধা করে। ইংরেজের শাসন সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে এই যে, তার শিক্ষা-দীক্ষার চমক দিয়ে সে আমাদের এমননিই চমকিত ক'রে রেখেছে যে, আমাদের এই দুই জাতির কেউ কারুর শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতার অতীত মহিমার খবর রাখিনে। হিন্দু আমাদের অপরিচ্ছন্ন অশিক্ষিত কৃষাণ-মজুরদের—আর তাদের সংখ্যাই আমাদের জাতের মধ্যে বেশী —দেখে মনে করে, মুসলমান মাত্রই এই রকম নোংরা, এমনি মূর্খ, গোঁড়া। হয়ত বা যথা পূর্বং তথা পরং। দরিদ্র মুর্খ কালিমদ্দি মিয়াই তার কাছে এ্যাভারেজ মুসলমানের মাপকাঠি।

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শিল্পে-সঙ্গীতে-সাহিত্যে মুসলমানের বিরাট দানের কথা হয় তারা জানেই না, কিম্বা শুনলেও আমাদের কেউ তাদের সামনে তার সত্যকার ইতিহাস ধরে দেখাতে পারে না বলে বিশ্বাস করে না; মনে করে—ও শুধু কাহিনী।

হয়ত এক দিন ছিল, যখন হিন্দুরা মুসলমানদেরে অশ্রদ্ধা করত না। তখন রাজভাষা State Language ছিল ফার্সি, কাজেই হিন্দুরাও বাধ্য হয়ে ফার্সি শিখতেন—এখন যেমন আমরা ইংরেজী শিখি। আর ফার্সি জানার ফলে তাঁরা মুসলমানদের বিশ্ব-সভ্যতায় দানের কথা ভাল করেই জানতেন। কাজেই সে সময় অর্থাৎ ইংরেজ আসার পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা কোন মুসলমান নওয়ার বাদশার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেও সমগ্র মুসলমান জাতি বা ধর্মের উপর বিরূপ হয়ে ওঠেন নি। শিবাজী-প্রতাপ যুদ্ধ করেছিল আওরঙ্গজীব-আকবরের বিরুদ্ধে, মুসলমান ধর্ম বা ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে নয়। তখনকার সেই অশ্রদ্ধা ছিল ব্যক্তির বিরুদ্ধে person-এর against-এ—গোষ্ঠীর বা সমগ্র জাতটার ওপর একেবারেই নয়।

কিন্তু আজ আমাদের জাতীয় জীবনের সব চেয়ে বড় ট্রাজেডিই এই যে, আমার সবচেয়ে কাছের মানুষটিকেই সবচেয়ে কম ক'রে জানি। আমরা ইংরাজের কৃপায় ইংরাজী, গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু থেকে শুরু করে ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, চেক, স্ক্যানডিনেভিয়ান, চীন, জাপানী, হনলুলু, গ্রানউইচের ভাষা জানি, ইতিহাস জানি, তাদের সভ্যতার খবর নিই, কিন্তু আমারই ঘরের গায়ে গা লাগিয়ে যে প্রতিবেশীর ঘর তারই কোনো খবর রাখিনে বা রাখবার চেষ্টাও করিনে। বরং ঐ না জানার গর্ব করি বুক ফুলিয়ে। একেই বলে বোধ হয়, Penny wise pound foolish!

হিন্দু, আরবী, ফার্সি, উর্দু জানে না; অথচ আমাদের শাস্ত্র-সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান সব কিছুর ইতিহাস আমাদের ঘরের বিবিদের মতই ঐ তিন ভাষার হেরেমে বন্দী। বিবিদের হেরেমের প্রাচীর বরং একটু ক'রে ভাঙতে শুরু হয়েছে, ওঁদের মুখের বোরকাও খুলছে, কিন্তু ঐ তিন ভাষার প্রাচীব বা বোরকা-মুক্ত হ'ল না আমাদের

অতীত ইতিহাস, আমাদের দানের মহিমা। অতএব অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমাদের কোন কিছু জানে না বলে দোষ দেবার অধিকার আমাদের নেই। অবশ্য আমরাও অনুস্বারের সঙ্গীন ও বিসর্গের কাঁটা বেড়া ডিঙিয়ে সংস্কৃতের দুর্গে প্রবেশ করতে পারিনে বা তার চেষ্টাও করিনে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু তবু কতকটা কিনারা করেছে সে সমস্যার। তারা প্রাদেশিক ভাষায় তাদের সকল কিছু অনুবাদ ক'রে ফেলেছে। সংস্কৃতের সঙ্গীন উঁচানো দুর্গ থেকে রূপ-কুমারীকে গোপনে মুক্তিদান করেছে। তার ভবনের আলো আজ ভুবনের হয়ে উঠেছে।

মাতৃভাষায় সে সবের অনুবাদ হয়ে এই ফল হয়েছে যে, অন্ততঃ বাঙলার মুসলমানেরা হিন্দুর কালচার, শাস্ত্র, সভ্যতা প্রভৃতির সঙ্গে যত পরিচিত, তার শতাংশের একাংশও পরিচিত নয় সে তার নিজের ধর্ম সভ্যতা ইত্যাদির সাথে।

কোন মুসলমান যদি তার সভ্যতা ইতিহাস ধর্মশাস্ত্র কোন কিছু জানতে চায় তা হলে তাকে আরবি-ফার্সি বা উর্দুর দেওয়াল টপকাবার জন্য আগে ভাল করে কসরৎ শিখতে হবে। ইংরেজী ভাষায় ইসলামের ফিরিঙ্গী রূপ দেখতে হবে। কিন্তু সাধারণ মুসলমান বাঙলাও ভাল করে শেখে না, তার আবার আরবি-ফার্সি! কাজেই ন' মণ তেলও আসে না, রাধাও নাচে না। আর যাঁরা ও ভাষা শেখেন, তাঁদের অবস্থা "পড়ে ফার্সি বেচে তেল!" আর তাঁদের অনেকেই শেখেনও সেরেফ হালুয়া-রুটির জন্য। কয়জন মৌলানা সাহেব আমাদেরে আমাদের মাতৃভাষার পাত্রে আরবি-ফার্সির সমুদ্র মন্থন ক'রে অমৃত এনে দিয়েছেন জানি না। সে অমৃত তাঁরা একা পান কোরেই 'খোদার খাসি' হয়েছেন।

কিন্তু এ খোদার খাসি দিয়ে আর কতদিন চলবে? তাই

আপনাদের অনুরোধ করতে এসেছি--এবং আপনাদের মারফতে বাঙলার সকল চিন্তাশীল মুসলমানদেরও অনুরোধ করছি, আপনাদের শক্তি আছে, অর্থ আছে—যদি পারেন মাতৃভাষায় আপনাদের সাহিত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস সভ্যতার অনুবাদ ও অনুশীলনের কেন্দ্রভূমি যেখানে হোক প্রতিষ্ঠা করুন। তা না পারলে অনর্থক ধর্ম ধর্ম বলে' ইসলাম বলে' চীৎকার করবেন না।

আমাদের next door neighbour-এর মন থেকে আমাদের প্রতি এই অশ্রদ্ধা দূর হবে এই এক উপায়ে আর তবেই ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে। সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার মাতলামীরও অবসান হবে সেইদিন, যেদিন হিন্দু-মুসলমান পরস্পব পরস্পরকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে আলিঙ্গন করতে পারবে। সেদিন যে competition হবে, সে competition হবে cultured মনের chivalrous competition—sports-man like competition.

বুলবুল,
ফাল্গুন, ১৩৪৩।

বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও

(১৩৪৩ সালে ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।)

আপনারা আমাকে আপনাদের ফরিদপুর মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীর সভাপতিত্বে বরণ ক'রে যে গৌরব দান করেছেন, তার জন্য আমার প্রাণের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমি বর্তমান সাহিত্যের সেবা থেকে, দেশের সেবা থেকে, কওমের খিদমত্-গারী থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে সঙ্গীতের প্রশান্ত সাগর-দ্বীপে স্বেচ্ছায় নির্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করেছি। সেই সাথীহীন নির্জন দ্বীপ ঘিরে দিবারাত্র প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একটানা জলকল্লোলসঙ্গীত; আর সেই শব্দায়মান সুর-উর্ম্মির মুখরতার মাঝে আমি বসে আছি বন্ধুহীন—একা। এই বিশ্ব জুড়ে যে মহামৌনীর স্তবগাথা নিঃশব্দ-ঝঙ্কারে রণিত হচ্ছে, যদিও আমি সেই ধ্যানীর মৌন-মহিমার পূজারী, তবু এ কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই যে, আমার নির্জনতার বক্ষ জুড়ে শুনছি অবিরাম বিষাদিত রোদনধ্বনি, শান্তিহীন বিলাপ। মৃত্যুর পরে অশান্ত আত্মা যদি কেঁদে বেড়ায়, তার কান্না বুঝি এমনি নীরব, এমনি মর্মন্তুদ! কত বিপুল বিরাট ভিত্তির উপর আমি আমার ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম; কী অপরিমাণ আশা, দুর্জয় সাহস নিয়েই না আমি নতুন জাতি নতুন মানুষের কল্পনা করেছিলাম। আমার সেই ভিত্তিকে জানি না কার অভিশাপে ধরণীতল গ্রাস করেছে, সেই স্বপ্নকে নিষ্ঠুর বস্তুর জগৎ অভাবের সংসার ভেঙ্গে দিয়েছে। পরাজয় স্বীকার আমি আজও করিনি, কিন্তু ধৈর্যের দুর্গম দুর্গে আর কত দিন আত্মরক্ষা করব?

বেশী দিনের কথা নয়, সেদিনও আমার আশা ছিল, এই ছাত্র

সমাজকে অগ্রদূত ক'রে নব বিজয়-অভিযানের আমি হব তূর্যবাদক, নকীব, সৃষ্টি করব সুন্দরের জগৎ—কল্যাণী পৃথ্বী, ধরণার পঙ্কিল বক্ষ ভেদ ক'রে আনব পবিত্র আব-জম্‌জম্‌-ধারা। সে আশা আমার আজও ফল্‌ল না। বুঝি মুকুলেই তা পড়ল ধূলায় ঝরে। আমি তাই এতদিন নিজেকে দেশের কাছে, জাতির কাছে মনে করেছি মৃত। কতদিন মনে করেছি আমার জানাজা পড়া হয়ে গেছে। তাই যারা কোলাহল করে আমায় নিতে আসে, মনে হয় তারা নিতে এসেছে আমায় গোরস্থানে—প্রাণের বুলবুলি-স্থানে নয়। কত দিক থেকে কত আহ্বান আসে আজও; যত সাদর আহ্বান আসে, তত নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলি,—ওরে হতভাগ্য, তোর দাফনের আর দেরী কত? কত দিন আর ফাঁকি দিয়ে জয়ের মালা কুড়িয়ে বেড়াবি? কওমের জন্য, জাতির জন্য, দেশের জন্য কতটুকু আমি করেছি—তবু তার প্রতিদানে অতি কৃতজ্ঞ জাতি যে শিরোপা আনে, তাতে শির আমার লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চায়! তাই আপনাদের দাওত পেয়ে যখন ধন্য হলাম, তখন দ্বিধাভরে অসঙ্কোচে তা কবুল করতে পারিনি। যে ভাগ্য-হীন নির্জনতার অন্ধ-কারায় অভাবের শৃঙ্খলে বন্দী, সে কোথায় পাবে মুক্তির বাঁশী? শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আমার অক্ষমতা নিবেদন করেছি আপনাদের কাসেদের কাছে, দূতের কাছে—কিন্তু তাঁরা আমার আর্জি মঞ্জুর করেন নি। এক দিন যারা ছিল আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম, আত্মার আত্মীয়, তারা যখন তাদের প্রতি আমার ভালবাসার দোহাই দিল, তখন আর থাকতে পারলাম না। জীবন-যুদ্ধে ক্লান্ত, অবসন্ন, দুঃখশোকের শত জিঞ্জীরে বন্দী হয়েও আসতে হ'ল আমাকে আপনাদের পুরোভাগে এসে দাঁড়াতে। ফরিদপুরের তরুণ ফরীদ দলের নেতৃত্ব করার অধিকার নেই এই সংসারের চিড়িয়াখানায় বন্দী সিংহের

—যে সিংহ আজ হিজ মাষ্টার্স ভয়েসের ট্রেডমার্কের সাথে এক গলাবন্ধে বাঁধা পড়েছে। আমার এক নির্ভীক বন্ধু আমাকে উল্লেখ ক'রে একদিন বলেছিলেন, "যাকে বিলিতী কুকুরে কামড়েছে তাকে আমাদের মাঝে নিতে ভয় হয়!" সত্যি, ভয় হবারই কথা। তবু কুকুরে কামড়ালে লোকে নাকি ক্ষিপ্ত হয়ে অন্যকে কামড়াবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে; আমার কিন্তু সে শক্তিও নেই, আমি হয়ে গেছি বিষ-জর্জরিত নির্জীব!

কিন্তু এ শুনাতে ত আমায় আপনারা আহ্বান করে আনেন নি। আপনারা শামাদানে এনে বসিয়েছেন সেই প্রদীপকে যা একদিন হয়ত বা অত্যুগ্র আলোকদান করেছিল। আপনাদের এ আদরের অসম্মান আমি করব না, নিভবার আগে আমি আমার শেষ শিখাটুকু জ্বালিয়ে যাব। তাতে আপনাদের পথের হদিস মিলবে কিনা—সকল পথের দিশারী খোদাই জানেন। আমি নিভবার আগে এই সান্ত্বনা নিয়েই নিভ্‌ব যে, আমি আমার শেষ স্নেহ-বিন্দুটুকু পর্যন্ত জ্বালিয়ে আলো দিয়ে যেতে পেরেছি।

তোমরা আমার সেই প্রিয়তম ছাত্রদল, যাদের দেখলে মনে হয়, আমি যেন কোটিবার কা'বা শরীফ জিয়ারত করলাম; যাদের চোখে দেখেছি তৌহীদের রওশনী, যাদের মুখে দেখেছি খালেদ-তারেক-মুসার ছবি, যাদের মক্তব-মাদ্রাসা স্কুল-কলেজকে মনে হয়েছে দুর্গার চেয়েও পবিত্র। যাদের বাজুতে দেখেছি আলী হায়দারের বেদেরেগ তেগের শান ও শওকত, কণ্ঠে শুনেছি বেলালের আজান-ধ্বনি। তোমার আমার সেই ধ্যানের মহামানব -গোষ্ঠি। এ আমার এতটুকু অত্যুক্তি—কল্পনা নয়। তোমাদেরে আমি দেখেছি তোমাদের অতিক্রম ক'রে সহস্রাধিক বৎসর দূরে —ওহোদের যুদ্ধে, বদরের ময়দানে, খয়বরের জঙ্গে। দেখছি ওমর ফারুকের বিশ্ববিজয়া বাহিনীর অগ্রসৈনিকরূপে, দেখছি দূর

আফ্রিকায় মুসা-তারিকের দক্ষিণে, দেখেছি মিসরের পিরামিডের পার্শ্বে - পিরামিড ছাড়িয়ে গেছে তোমাদের উন্নত শির। দেখেছি ইরাণের বিরাণমুলুক আবাদ করতে, তার আলবোর্জের চূড়া গুঁড়া ক'রে দিতে! দেখেছি জাবলুত্ তারেকের—জিব্রাল্টারের অকূল জলরাশির মধ্যে নাঙ্গা শম্‌সের হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে। দেখছি সেই জলরাশি সাঁতরে পার হয়ে স্পেনের কর্ডোভায় বিজয়চিহ্ন অঙ্কিত করতে। দেখেছি ক্রুসেডের রণে, জেহাদের জঙ্গে সুলতান সালাহ্‌উদ্দিনের সেনাদলের মাঝে—দেখেছি কুরূপা য়ুরোপকে সুরূপা করতে। সেদিনও দেখেছি—রীফ-সর্দার আবদুল করিমের সাথে, বিশ্বত্রাস কামালের পাশে, পহ্‌লবীর দক্ষিণে, ইব্‌নে সউদের সম্মুখে। যুগে যুগে তোমরা এসেছ ভাবী নেশনের নিশান-বর্দার হয়ে। তোমরা যে পথ দিয়ে চলে গেছ, মনে হয়েছে—আমি যদি ঐ পথের ধূলি হতাম! আমি প্রাণ-মন পেতে দিয়েছি তোমাদের অভিযানের ঐ পায়ে-চলা পথে। আমি যেন তোমাদেরই সেই পায়ে-চলা পথের ধূলি-সমষ্টি, মূর্তি ধরে এসেছি তোমাদের অতীতকে স্মরণ করিয়ে দিতে, তোমাদের আর একবার তেমনি ক'রে আমার বুকের উপর দিয়ে চলে যেতে।

কোথায় সে শম্‌শের, কোথায় সে বাজু, সেই দরাজ দস্ত্? বাঁধো আমামা, দামামায় আঘাত হানো আর একবার তেমনি ক'রে। যে কওম যে জাতি চলেছে গোরস্থানের পথে, ফেরাও তাকে সেই পথে—যে পথে চলে তারা একদিন পারস্য সাম্রাজ্য রোম-সাম্রাজ্য জয় করেছিল, আঁধার বিশ্বে তৌহীদের বাণী শুনিয়েছিল। তোমাদেরই মাঝে থেকে বেরিয়ে আসুক তোমাদের ইমাম—দাঁড়াও তাঁর পতাকা-তলে তহ্‌রীমা বেঁধে। বলো, আল্লাহো আকবর, হাঁকো হায়দারী হাঁক, সপ্ত আসমানে চাক্

হয়ে ঝরে পড়ুক খোদার রহমত, নবীর দোওয়া। চাঁদ সেতারা গলে' পড়ুক কল্যাণের পাগল-ঝোরা।

আর্ত-পীড়িত কোটি কোটি মজলুম ফরিয়াদ করছে—কে করবে এদের ত্রাণ? তোমাদের চর্বি জ্বালিয়ে জ্বালাও আবার দ্বীনের চেরাগ, এই অন্ধ পথহারা জাতিকে আলো দেখাও! তোমাদের অস্থি-পঞ্জর দিয়ে গড়ে তোল পুলসেরাত—সেই পুলের উপর দিয়ে জয়যাত্রা করুক নূতন জাতি। তোমাদের শিক্ষা, তোমাদের জ্ঞান অর্জন যদি তোমাদের মাঝেই নিঃশেষিত হয়ে যায়, তবে ভুলে যাও এ শিক্ষা, বর্জন করো এ জ্ঞানার্জন। নওকরীর জন্য, দাসখৎ লিখার কায়দা-কানুন শেখার জন্য যদি তোমরা শিক্ষার ব্রত গ্রহণ কর, তবে জাহান্নামে যাক্ তোমাদের এই শিক্ষাপদ্ধতি, এই শিক্ষালয়!

তোমাদের শিক্ষায়তন—তা স্কুলই হোক, আর কলেজই হোক, আর মাদ্রাসাই হোক—পীরের দর্গার চেয়েও পবিত্র, মসজিদের মতই পাক্। এর অঙ্গনে যে দীক্ষা গ্রহণ কর, যে নিয়ত্ কর, জীবনে যদি সে ব্রত ফলপ্রসূ না হয়, তবে কাজ কি এই জীবনের এক-তৃতীয়াংশ বাজে খরচ ক'রে?

জরাগ্রস্ত পুরাতন পৃথিবী চেয়ে' থাকে যুগে যুগে তোমাদের এই কিশোরদের—এই তরুণদের মুখের পানে। তোমরা শোনাও তাকে তাজা-বতাজার গান, আর তোমাদের সেই প্রাণ-চঞ্চল সঙ্গীতের যাদুতে সে পাক নব-যৌবনের কান্তিশ্রী! তোমাদের বরণ ক'রে দুলহিণের সাজে সেজে ষড়ঋতুর ডালা শিরে ধরে' আজও সে চেয়ে' আছে উন্মুখ প্রতীক্ষায় তোমাদের পানে—তোমাদের দক্ষিণ হস্তের দানে তার প্রতীক্ষার শূন্যতা কি পূর্ণ হবে না? কত কাজ তোমাদের—ধরণীর দশদিক ভরে কত ধূলি, কত আবর্জনা, কত পাপ, কত বেদনা—তোমরা ছাড়া

কে তার প্রতিকার করবে?— কে তার এলাজ করবে? তোমাদের আত্মদানে, তোমাদের আয়ুর বিনিময়ে হবে তার মুক্তি। শত বিধি-নিষেধের, অনাচারের জিঞ্জীরে বন্দিনী এই পৃথিবী আজাদীর আশায় ফরিয়াদ করছে তোমাদের প্রাণের দরবারে, তার এ আর্জী কি বিফল হবে? এই বাংলায় নাকি শতকরা পঞ্চান্ন জন মুসলমান। কিন্তু গুণতিতে সংখ্যা-গরিষ্ঠ ছাড়া এই পঞ্চান্ন জনকে নিয়ে বাঙলার সত্যকার গৌরব করবার কতটুকু আছে, তা হিসাব করতে গেলে মনে হয়—আমরা শতকরা পাঁচজন হলেই এ লজ্জার হাত থেকে বেঁচে যেতাম। বড় দুঃখে তাই বলেছিলাম—

ভিতরের দিকে যত মরিয়াছি, বাহিরের দিকে তত
গুণতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু-ছাগলের মত।

এ লজ্জা, এই অপমানের গ্লানি থেকে তোমরা তরুণ ছাত্রদল বাঙলার মুস্‌লিমকে বাঁচাও। সমাজের স্তরে স্তরে, তার গোপনতম কোণে কোণে, বোরকার অন্তরালে, আবরুর মিথ্যা আবরণে যে আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, তার নিরাকরণ করো।

ইসলামের প্রথম উষার ক্ষণে, সুবহ্‌-সাদেকের কালে যে কল্যাণী নারী শক্তি-রূপে আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান ক'রে আমাদের শুধু সহধর্মিনী নয়, সহকর্মিনী হয়েছিলেন—যে নারী সর্বপ্রথম স্বীকার করলেন আল্লাহকে, তাঁর রসুলকে—তাঁকেই আমরা রেখেছি দুঃখের দূরতম দুর্গে বন্দিনী ক'রে—সকল আনন্দের, সকল খুশীর হিস্‌সায় মহরুম ক'রে। তাই আমাদের সকল শুভ-কাজ, কল্যাণ-উৎসব আজ শ্রীহীন, রূপহীন, প্রাণহীন। তোমরা অনাগত যুগের মশাল-বর্দার—তোমাদের অর্ধেক আসন ছেড়ে দাও কল্যাণী নারীকে। দূর ক'রে দাও তাঁদের সাম্‌নের

ঐ অসুন্দর চটের পর্দা—যে পর্দার কুশ্রীতা ইসলাম-জগতের, মুসলিম জাহানের আর কোথাও নেই। দেখবে তোমাদের কর্তব্যের কঠোরতা, জীবন-পথের দুরধিগম্যতা হয়ে উঠবে সুন্দরের স্পর্শে পুষ্প-পেলব। কর্মে পাবে প্রেরণা, মর্মে পাবে সুন্দরের স্পর্শ, কল্যাণের ইঙ্গিত। সম্মান দেওয়ার নামে এতদিন আমরা আমাদের মাতা-ভগিনী-কন্যা-জায়াদের যে অপমান করেছি, আজও তার প্রায়শ্চিত্ত যদি না করি তবে কোনো জন্মে এ জাতির আর মুক্তি হবে না।

তারও আগে তোমাদের কর্তব্য সম্মিলিত হওয়া, সংঘবদ্ধ হওয়া। যে ইখাওয়াৎ সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, যে একতা ছিল মুসলিমের আদর্শ. যার জোরে মুসলিম জাতি এক শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবী জয় করেছিল, আজ আমাদের সে একতা নেই—হিংসায়, ঈর্ষায়, কলহে, ঐক্যহীন বিচ্ছিন্ন। দেয়ালের পর দেয়াল তুলে আমরা ভেদ-বিভেদের জিন্দানখানার সৃষ্টি করেছি; কত তার নাম—সিয়া, সুন্নি, সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, হানাফী, শাফী, হাম্বলী, মালেকী, লা-মজহাবী, ওহাবী ও আরও কত শত দল। এই শত দলকে একটি বোঁটায়, একটি মৃণালের বন্ধনে বাঁধতে পার তোমরাই। শতধাবিচ্ছিন্ন এই শতদলকে এক সামিল করো, এক জামাত করো—সকল ভেদ-বিভেদের প্রাচীর নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙ্গে ফেল।

জন-সাহিত্য

(১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ৫নং ম্যাঙ্গো লেনে, দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকার অফিস-গৃহে, জনসাহিত্য-সংসদের শুভ-উদ্বোধনে সভাপতি কাজী নজরুল ইসলামের প্রদত্ত অভিভাষণ।)

সাহিত্যে সবারই প্রয়োজন আছে। দুনিয়ায় হাতীও আছে, আরশুলা-ও আছে। তাদের কে বড় কে ছোট, বলা যায় না। তার কারণ, হাতী খুব বড়, কিন্তু আরশুলা উড়তে পারে।

জনসাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো জনগণের মতবাদ সৃষ্টি করা এবং তাদের জন্য রসের পরিবেশন করা। আজকাল সাম্প্রদায়িক ব্যাপারটা জনগণের একটা মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে; এর সমাধানও জনসাহিত্যের একটা দিক। সাময়িক পত্রিকা-গুলোর দ্বারা আর তাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্বারা কিছুই হবে না। সম্পাদকীয় মত উপর থেকে উপদেশের শিলাবৃষ্টির মত শোনায়। তাতে জনগণের মনের উপর কোনো ছাপ পড়ে না—জনমতও সৃষ্টি হয় না।

যাঁদের গ্রামের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা সেখান থেকেই তাঁদের সাহিত্য আরম্ভ করুন। স্থায়ী সাহিত্য চাই। বক্তৃতা প্রবন্ধ তাদের প্রাণে দাগ কাটতে পারে না। তাদের মত ক'রে তাদের কথা, তাদের গল্প বলুন। তা'রা তা বুঝতে পারবে। কিন্তু সাবধান, আপনাদের মুরুব্বিয়ানা-ভাব যেন প্রকাশ না পায় তার মধ্যে, তা হলে তারা পালিয়ে যাবে. চাষীরাও আয়না রাখে; নিজেদের চেহারা যদি তার মধ্যে দেখতে পায় তবে যত্ন ক'রে রাখবে।

আমিও একবার ভাবছিলাম: জারির গান, গাজীর গান ওদের ভাষায় লিখে' ওদের জন্য চালাব; কিন্তু তা হয়ে ওঠে নাই।

এ প্রসঙ্গে আমাব নিজের বিষয়ে কিছু বক্তব্য আমার আছে। কাব্যে ও সাহিত্যে আমি কি দিয়েছি জানি না। আমার আবেগে যা এসেছিল, তাই আমি সহজভাবে বলেছি। আমি যা অনুভব করেছি, তাই আমি বলেছি। ওতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু সঙ্গীতে যা দিয়েছি, সে-সম্বন্ধে আজ কোনও আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে, তখন আমার কথা সবাই স্মরণ করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। সাহিত্যে দান আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই; তবে এইটুকু মনে আছে সঙ্গীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি।

আমি আট বছব গ্রামে গ্রামে ঘু্রে বেড়িয়েছি। তখন যৌবন ছিল, আর আমিও তার সব চঞ্চলতা নিয়ে যুবক। কিছুর ভয় করিনি। খেতাম হোটেলে. শুতাম মসজিদে, ছেলেদের খুব ভালবাসতাম, কিন্তু বহু মেশার পবেও আমি দেখলামঃ তাদের সাথে যেন আমার মিশ খাচ্ছে না। আমি নিজেকে দোষ দিয়েছি; আমার ব্যর্থতায় আমি নিজেকেই দায়ী করেছি। তারপর সে-পথ ছেড়ে,' যে-পথে আজ চলেছি সেপথে এসে পড়লাম। আর মনে করলাম, ও-পথের যোগ্য আমি নই। ও-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাব আত্মবিশ্বাস নেই। আমার নিজের উপর যে-সম্বন্ধে নিজেরই বিশ্বাস নেই, সে-সম্বন্ধে নেতৃত্ব করা আমার সাজে না।

আজকাল জনসাধারণেব জন্য দরদ জেগেছে সবার মধ্যে। কত রকম 'ইজম্' মতবাদ এর জন্য সৃষ্টি হয়েছে। যা-ই হোক, তাদের এই দরদ যদি সত্যিকারের প্রাণের দরদ হয়, তবেই মঙ্গলের। বাহির থেকে তাদের দরদ দেখালে তা'রা বিশ্বাস করে না। তাদেরই একজন হতে হবে। তাদের কাছে টর্চ-লাইট হাতে নিয়ে গেলে তা'রা সরে' দাঁড়াবে; কেরোসিনের ডিবে হাতে ক'রে

গেলে তার থেকে যত ধোঁয়াই বের হোক না কেন তাদেরকে আকর্ষণ করবেই। কারণ, টর্চ-লাইটে তা'রা অনভ্যস্ত। ওতে তাদের চোখ ঝলসায়। কেরোসিনের ডিবে ওদের নিজেদের জিনিষ। অবশ্য যাদের টর্চ-লাইটই সম্বল, তাদের পথ শহরের দিকে। গ্রামের দিকে, জনসাধারণের দিকে গেলে তাদের ঠিক হবে না। যাঁরা ইন্‌টেলেকচুয়াল (intellectual), তাঁদের আমি জন-সাহিত্য গড়ার জন্য আসতে বলি না। কিন্তু এমনও তো সাহিত্যিক আছেন, যাঁদের সম্বল কেরোসিনের ডিবে। এ পথ কিন্তু সোজা নয়। কঠিন। ত্যাগ চাই এর পিছনে। পরে দুঃখ করলে কোন লাভ হবে না। জনসাধারণের যা সমস্যা, তা সাহিত্যিকরাই সমাধান করতে পারবেন।

জনগণের সাথে সম্বন্ধ করতে হলে তাদের আত্মীয় হতে হবে। তারা আত্মীয়ের গালি সহ্য করতে পারে, কিন্তু অনাত্মীয়ের মধুর বুলিকে গ্রাহ্য করে না।

ওদের জন্য যে-সাহিত্য, তা ওরা এখনো যেমনভাবে পুঁথি পড়ে, আমির হামজা, সোনা ভান, আলেফ লায়লা, কাছাছুল আম্বিয়া পড়ে, তখনো সেইভাবে পড়বে। ওদের সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ওদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। যা বলবার বলতে হবে। কিন্তু যেন মাষ্টারী-ভাব ধরা না পড়ে। সেইজন্য তথাকথিত ভদ্র-পোষাক-পরিহিত ভদ্রলোকদের নেমে আসতে হবে কাদার মধ্যে—ওদেরকে টেনে' তোলার জন্য। নেমে' এসে' যদি ওদের ওঠানোর চেষ্টা করা যায়, তবে সে-চেষ্টা সফল হবে, নইলে না।

আজকাল আমাদের সাহিত্য বা সমাজ-নীত সবই টবের গাছ। মাটীর সাথে সংস্পর্শ নেই। কিন্তু জন-সাহিত্যের জন্য জনগণের সাথে যোগ থাকা চাই। যাদের সাহিত্য স্বৃষ্টি করব, তাদের সম্বন্ধে না জানলে কি ক'রে চলে?

একমাত্র সন্তান ম'রে গেছে, পুরুষ বিদ্রোহ করে খোদার বিরুদ্ধে, কিন্তু স্ত্রী তাকে বলে খোদার মহান উদ্দেশ্যের উপর বিশ্বাস রাখতে। এদের খবর, এদের প্রাণের খবর কে রাখে? এদের কাছে যেতে হবে, জানতে হবে এদের।

নিজেদের কওমের যদি মঙ্গল করতে চাই, তবে তার জন্য অপর কাউকে গাল দে'য়ার দরকার করে না। যারা অপরকে গালি দিয়ে 'কওম্' 'কওম্' ক'রে চীৎকার করে, তা'রা ঐ এক-পয়সায় মক্কা-মদিনা-দেখানেওয়ালাদেরই মতো। তাঁরা কওমের জন্য চীৎকার করতে করতে হয়ে যান মন্ত্রী, আর ত্যাগ করতে করতে বনে' যান জমিদার। কওমের খেদমত করতে করতে কওম যাচ্ছে গরীব হয়ে, আর গড়ে' উঠছে নেতাদের দালান-ইমারত। হজরত ওমর, হজরত আলী, এঁরা অর্ধেক পৃথিবী শাসন করেছেন; কিন্তু নিজেরা কুঁড়েঘরে থেকেছেন, ছেঁড়া কাপড় পরেছেন, সেলাই ক'রে, কেতাব লিখে' সেই রোজগারে দিনপাত করেছেন। ক্ষিধেয় পেটে পাথর বেঁধে' থেকেছেন; তবু রাজকোষের টাকায় বিলাসিতা করেননি। এমন ত্যাগীদের লোকে বিশ্বাস করবে না কেন?

কওমের সত্যিকার কল্যাণ করতে হলে ত্যাগ করতে হবে হজরত ইব্রাহীমের মতো।

দু'দিন বাদে কোরবাণী ঈদ আসছে। ঈদের নামাজ আমাদের শিখিয়েছে, সত্যিকার কোরবাণী করলেই মিলবে নিত্যানন্দ। আমরা গোরু-ছাগল কোরবাণী ক'রে খোদাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছি। তাতে ক'রে আমরা নিজেদেরকেই ফাঁকি দিচ্ছি। আমাদের মনের ভিতরে যে-সব পাপ, অন্যায়, স্বার্থপরতা ও কুসংস্কারের গোরু-ছাগল—যা আমাদের সৎবৃত্তির ঘাস খেয়ে আমাদের মনকে মরুভূমি ক'রে ফেলছে, আসলে কোরবাণী

করতে হবে সেই সব গোরু-ছাগলের। হজরত ইব্রাহীম নিজের প্রাণতুল্য পুত্রকে কোরবাণী করেছিলেন ব'লেই তিনি নিত্যানন্দের অধিকারী হয়েছিলেন। আমরা তা করিনি ব'লেই আমরা কোরবাণী শেষ ক'রেই চিড়িয়াখানায় যাই তামাসা দেখতে। আমি বলি, ঈদ ক'রে যারা চিড়িয়াখানায় যায়, তা'রা চিড়িয়াখানায় থেকে যায় না কেন?

এমনি ত্যাগের ভিতর দিয়ে জনগণকে যারা আপনার ক'রে নিতে পারবে তা'রাই হবে জনগণের নায়ক।

নয়া জামানা
১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা,
ফাল্গুন, ১৩৪৫।

উস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁ

উস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁর অকাল-মৃত্যুতে আজকের এই সভা আহূত হয়েছে।* এই সভায় ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ উস্তাদের তিরোধানে শোক প্রকাশ করা হবে, শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। আমার আশা ছিল, দেশের একজন খ্যাতনামা জননায়ককে এই সভার সভাপতিত্ব করতে দেওয়া হবে, এবং তা' করলে শোভনও হ'ত। আমি উস্তাদ জমিরুদ্দীনের একজন দীন ভক্ত সাগরেদ। আমি নিজে, গোলাম মোস্তফা ও আব্বাসউদ্দীন তাঁর কাছে গান শিখেছি। বাঙলার হিন্দু-মুসলমান তরুণ, গায়করা, যাঁরা সঙ্গীতজগতে নাম কিনেছেন, তাঁরা প্রায় সবাই উস্তাদ জমিরুদ্দীনের শিষ্য। কেউ হয়ত বলবেন: জমিরুদ্দীন ছিলেন পাঞ্জাবী, বাঙলার তিনি কেউ ছিলেন না। এ উক্তি শুধু উক্তিই, এর মধ্যে যুক্তি নেই। আমি বলি, গানের পাখী উড়ে বেড়ায়, নীড় বাঁধে না। কোকিল পাহাড়ে থাকে, সে আসে বসন্ত কালে, তার গান আমাদের মুগ্ধ করে। তারপর গান গাওয়া শেষ হলে আধার সে চলে যায়। সুরের আবেদন সমানভাবে সকল মানুষের অন্তর স্পর্শ করে। জমিরুদ্দীন পাঞ্জাবী ছিলেন সত্য, কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে। বাঙলাদেশে ছোট বেলায় তিনি এসেছিলেন, বাঙলাকে তিনি আপন ক'রে নিয়েছিলেন। বাঙলা ভাষায়ই তিনি কথা বলতেন এবং নিজকে তিনি বাঙালী বলেই পরিচয় দিতেন এবং এজন্য গর্ব অনুভবও করতেন।

---

* ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর উস্তাদ জমিরুদ্দীন খান ইন্তিকাল করেন। ১০ই ডিসেম্বর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত তাঁর শোকসভায় সভাপতি-রূপে কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম এই অভিভাষণ প্রদান করেন।

আজ সঙ্গীতলোকের একজন গুণীর শোক-সভায় আমরা সমবেত হয়েছি, এটা এ-দেশের পক্ষে অভিনব। শরিয়তের দোহাই দিয়ে কেউ কেউ হয়ত এই সভার সঙ্গে সহানুভূতি দেখাতে চাইবেন না। তাঁরা হয়তো বলবেন, যে সারা জীবন গান গেয়েই গেল, ধর্মের কাজ সে করলো কোথায়? তার জন্য মুসলমান শোক-সভা কেন করবে? তাদের কথা নিয়ে আমি বিতর্কে যোগ দিতে চাইনে। আমি শুধু বলতে চাই যে, বেহেশতেব পাখী যখন গান কবে তখন পৃথিবীর ধূলো থেকে সে উর্ধ্বে উঠে যায়। ফকীর দরবেশ যখন সেজদা কবে, তখন তাব মন মাটী থেকে উর্ধ্বে উঠে যায়। এই সুরের পথ ধরেই মানুষ মুক্তির পথ পেয়েছে। হজরত ইসমাইলের পায়ের দাপে মরুভূমির বুক চিবে' পানি উঠেছিল, সেই পানি মানুষের জন্য পবিত্র জমজমের পানি হয়ে আত্মার শান্তিদান করে। সুরের আঘাতেও মনের পানি উথলায়। সুব কখনও খারাপ হয় না। খারাপ মনের পাত্রে পানি রাখলে সে পানি হয়ত দূষিত হয়, কিন্তু তাই বলে পানিকে দোষ দেওয়া যায় না। পানি মানুষেব তৃষ্ণা মিটায়, মানুষের জীবন বাঁচায়, আবার বন্যা হয়ে মানুষের ধ্বংসও আনয়ন করে: তাই বলে পানিকে ত আমরা খারাপ বলতে পারিনে। সুরের সঙ্গে ফুলের তুলনা করা যেতে পারে। ফুল দিয়ে কোথাও কোথাও পূজা হয়। সেই ফুল নগরবিলাসিনীদের কণ্ঠেও শোভা পায়। তাই ব'লে ফুল খারাপ, এ-কথা বলা যায় কি? শরিয়ত হয়ত গানের খারাপ দিকটাকেই খারাপ বলতে পারে। কিন্তু সুর কখনো খারাপ নয়।

এ কথা অবশ্য-স্বীকার্য যে, মানুষের মারফতে দুনিয়ার বুকে আল্লার রহম নেমে আসে। সুরও আল্লার রহম-রূপে দুনিয়ায় নাজেল হয়েছে। কিন্তু সব মানুষেব মুখ দিয়ে ত সুরের রহম ত

বের হয় না। যাদের মুখ দিয়ে সুর বেরোয় তাঁদের উপর আল্লার রহম আছে। শরিয়তের তর্ক আমি তুলতে চাইনে। হাফিজের মৃত্যুর পর কেউ তার জানাজা পড়তে চায়নি। কিন্তু হাফিজ তাঁর শিষ্যদের বলে গিয়েছিলেন যে, আমার বইয়ের পাতা খুলে প্রথম যে চরণ তোমাদের চোখের সামনে পড়বে, তাতেই তোমরা আমার কাম্য খুঁজে পাবে। শিষ্যরা হাফিজের মৃত্যুর পর এক অন্ধকে দিয়ে তাঁর বইয়ের পাতা খুলে দেখলো, লেখা রয়েছে : "আল্লাহ, আমার লাশ কেউ দাফন করবে না জানি, কিন্তু এও জানি, তুমি তোমার দরবারে আমায় গ্রহণ করবে।"

যুগের প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন আবশ্যক হয় এবং এই প্রয়োজন মেনে নিতে হয়। এই পরিবর্তনের জন্যই যুগে যুগে মোজাদ্দেদ আসেন। মানুষের পেটের ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধার ন্যায় মনের ক্ষুধাও আছে; এ ক্ষুধা মেটাতে হয়। ঈদের দিনে মানুষ কোর্মা-পোলাও-ফিরণী খায় পেটের ক্ষুধা মিটাতে; কিন্তু আতর খোসবু মাখে : এটা হ'ল মনের বিলাস। গানও তেমনি মানুষের মনের ক্ষুধা মিটায়। যাঁরা সাহিত্যিক, কবি ও গায়ক, তাঁরা মানুষের ক্ষুধা মিটান। বাইরের ক্ষুধা যাঁরা মেটান, আমরা তার দাম দিই। কিন্তু মনের ক্ষুধা যাঁরা মেটান তাঁদের দাম আমরা দিই না। তাঁরা মানুষের নিকট থেকে তাঁদের প্রাপ্য শ্রদ্ধা পান না। তাঁরা প্রচ্ছন্নই থেকে যান। স্রষ্টা যিনি, তাঁর সৃষ্টিতেই সুখ। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে সৃষ্টির সুখেই তিনি মশগুল থাকেন।……

দেশের জন্য যারা নির্যাতন ভোগ করে তা'রা ফুলের মালা পায়। কিন্তু যাঁরা এদেরকে ফুলের মালা পাওয়ার মত ক'রে গড়ে তুললেন, তাঁরা তো মালা পান না; তাঁরা সব সময়েই থাকেন

লোক-চক্ষুর অন্তরালে। আল্লাহ্ যে এত বড় স্রষ্টা, তিনিও তাই সব চেয়ে বেশী গোপন।

বসন্ত বনে হিল্লোল, জাগায়, মনে আনন্দ-শিহরণ তোলে। দক্ষিণা বাতাস বয়ে যাবেই। তাকে নিন্দা করলেও সে বয়ে যায়, প্রশংসা করলেও বয়ে যায়। কোকিলের গানকে খারাপ বললেও কোকিল গান গাইবেই। গায়কও তাই; সে স্থষ্টির আনন্দে গান গেয়ে যায়; কারো নিন্দা-প্রশংসার সে অতীত।

জমিরুদ্দীন যে দান বাঙলায় রেখে গিয়েছেন, তার দাম বাঙলার অনেকেই জানে না। আজ আমরা যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাচ্ছি, এতে তাঁর রুহ্ উপর থেকে তৃপ্তি লাভ করছে।

জমিরুদ্দীন খান সাহেব ছিলেন খান্দানী গাইয়ে। তিনি ঠুংরী-সম্রাট। উস্তাদ মইজুদ্দীন খানের পর তাঁর মত ঠুংরী-গাইয়ে আর কেউ ছিলেন না; এখন ত নাই-ই। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্‌পা, গজল, দাদরা, সব সুরেই তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে তিনি হাজার হাজার সুর রেখে গিয়েছেন। যে কোনো সুর তিনি adopt করতে পারতেন। বহু নূতনতর সুর তিনি আবিষ্কার ক'রে গিয়েছেন। ইনি লোকের যে কতটা শ্রদ্ধার পাত্র তা বেঁচে থাকতে জানতে পারেন নি। এতদিন তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করতে পারিনি, কাজেই আজকের সভায় তার কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করতে পেলাম। তাঁর নামকে অক্ষয় ক'রে রাখতে হলে ইউ-নিভার্সিটীর সাহায্য নিয়ে একটা Classical music চেয়ার স্থষ্টি করা দরকার, কিংবা তাঁর নামে ইউনিভার্সিটী থেকে একটা মেডেল ঘোষণা করা দরকার। সে-জন্য যে টাকা প্রয়োজন, তা একটা কমিটি গঠন ক'রে সংগ্রহ করতে হবে। তাঁর হিন্দু-মুসলমান হাজার হাজার কৃতী ছাত্র রয়েছে। আমরা যদি এ

কাজ করি তবে একটা কাজের মতো কাজ করা হবে। দেশ যদি স্বাধীন হয়, তবে সেদিন জমিরুদ্দীনের কদর হবে। কিন্তু আমাদের পরবর্তী যুগে আমাদের বংশধররা যেন সেদিন মনে করবার অবসর না পায় যে, আমরা নির্বোধ ছিলাম, গুণীর আদর করতে জানতুম না। কেবল রাজনৈতিক নেতাদেরকে শ্রদ্ধা জানালে চলবে না; যাঁরা তিলে তি'ল আপনাদের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দিলেন, সেই সব কবি গায়ক ও সাহিত্যিক-দেরকেও সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে হবে। আপনাদের আনন্দ দানের জন্য যিনি তিলে তিলে নিজকে বিলিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, সেই জমিরুদ্দীন খানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা আপনাদের জন্য একান্ত ফরজ। আপনারা তাঁর শোকসভা ক'রে তাঁর প্রতি আপনাদের কর্তব্যই করলেন।

স্বাধীন-চিত্ততার জাগরণ

(১৩৪৭ সালে কলিকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির ঈদ-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।)

আজকের ঈদ-সম্মেলনে আমাকে আপনারা সভাপতি নির্বাচিত ক'রে গৌরব দান করেছেন,—এজন্য আমি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আপনা-দিগকে 'ঈদ মোবারক হো' বলে প্রথমেই অভিনন্দিত করছি। ঈদের উৎসব আনন্দের উৎসব, ত্যাগের উৎসব। আল্লার রাহে সব কিছু কোরবাণী করার ইঙ্গিতই এই উৎসব বয়ে এনেছে। কোরআনের ছুরে বকরায় এই কোরবাণীর কথা রয়েছে, এবং ছুরে নূরের ভিতর উল্লেখিত জয়তুন ও রওগণের যে সব কথা রয়েছে, তার অর্থ সকলকে আমি অনুধাবন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। কোরআনে বলা হয়েছে, আল্লার নামে সকল ঐশ্বর্য, সকল সম্পদ কোরবাণী করতে হবে। একটা গরু কোরবাণী করেই সবকে ফাঁকি দেওয়া যেতে পারে কিন্তু আল্লাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভবপর নয়।

সকল ঐশ্বর্য, সকল বিভূতি আল্লার রাহে বিলিয়ে দিতে হবে। ধনীর দৌলতে, জ্ঞানীর জ্ঞানভাণ্ডারে সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। এ নীতি স্বীকার করেই ইসলাম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছে। আজ জগতের রাজনীতির বিপ্লবী আন্দোলনগুলির যদি ইতিহাস আলোচনা ক'রে দেখা যায় তবে বেশ বুঝা যায় যে, সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রবাদের উৎসমূল ইসলামেই নিহিত রয়েছে। আমার ক্ষুধার অন্নে তোমার অধিকার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার

উদ্বৃত্ত অর্থে তোমার নিশ্চয়ই দাবী আছে—এ শিক্ষাই ইসলামের। জগতের আর কোন ধর্ম এত বড় শিক্ষা মানুষের জন্য নিয়ে আসেনি। ঈদের শিক্ষার ইহাই সত্যিকার অর্থ।

আজ মুশায়েরার সম্মেলন। কবি ও সাহিত্যিকদের আজ সমাবেশ হয়েছে। কবি, সাহিত্যিক, সুরশিল্পী মানুষের আনন্দ-লোকের, সৌন্দর্যলোকের বাণী বয়ে আনে। এজন্য সাহিতিক, কবি ও শিল্পীরা মানব-সভ্যতার গৌরব। আনন্দ ও সৌন্দর্যের তৃষ্ণা মানুষের চিরন্তন। মানুষ অন্নের জন্য ক্ষুধা অনুভব করে, তেমনি করে সৌন্দর্যপিপাসাকে অনুভব। মানুষের এই সৌন্দর্য-ক্ষুধা থেকেই কাব্যের সৃষ্টি, কবির জন্ম। মানুষের আনন্দ ও সৌন্দর্য পরিবেশন করার জন্যই কবিরা এসে থাকেন। জল কমল ফুটায়; জল না থাকলে কমল ফুটত কি? অকবির সৌন্দর্য-ক্ষুধা মিটাবার জন্যই কবির আগমন। সকল মানুষেরই আট-পৌরে জীবনের সাথে চলে এই সৌন্দর্য-জীবনের দাবী। আমি একদিন একজন লোককে বাজার থেকে ফিরে আসবার সময় লক্ষ্য করলাম তার এক হাতে মুরগী ও আর এক হাতে রজনী-গন্ধার ফুল। আমি তাকে আদাব জানিয়ে বললাম, এমন Fair and Fowl (fou[1]) এর সমাবেশ একত্রে কোথাও দেখিনি!

এই সৌন্দর্যের, অমৃত পরিবেশনের ভার কবি ও সাহিত্যিক-দের হাতে। এ পথে সাহিত্যিকদের হয়তো দুঃখ-কষ্ট আছে অনেক, কিন্তু তাদের ভীতু হলে চলবে না। মানুষ ক্ষুধার অন্ন মিটিয়েই অবকাশ পায় না। ধান গাছ জন্মিয়ে মানুষ মাঠের পর মাঠকে অরণ্য ক'রে তোলে, কিন্তু গোলাবের চাষের আয়োজন এদেশে করে ক'জন? আরও দুর্ভাগ্য এই যে, এদেশের শিক্ষিতদের মধ্যে সৌন্দর্যের পিপাসা কম। এজন্য বহু দুঃখ-কষ্ট আমাদের দেশের সাহিত্যিকদিগকে ভোগ করতে হয় জীবনে।

এজন্য বিচলিত হলে চলবে না। দুঃখের আঘাতকে আনন্দের আহ্বানের মতই বরণ ক'রে নিতে হবে। কবি ও সাহিত্যিকের জীবন ও তাঁর সৃষ্টি যেন শতদল। তার এক একটি দল জন্ম নিয়েছে এই দুঃখ-বেদনার আঘাত পেয়ে।

আমার আজ বেশ মনে পড়ছে—একদিন আমার জীবনের এই মহানুভূতির কথা। আমার ছেলে মরেছে। আমার মন তীব্র পুত্র শোকে যখন ভেঙ্গে পড়ছে, ঠিক সেদিন সে সময়ে আমার বাড়ীতে হাস্নাহেনা ফুটেছে। আমি প্রাণ ভরে সেই হাস্নাহেনার গন্ধ উপভোগ করেছিলাম। এভাবেই জীবনকে উপভোগ করতে হবে -এই-ই হ'ল পূর্ণ জীবন। এই জীবনের অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করতে চেয়েছি। আমার কাব্য, আমার গান আমার জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য হ'তে জন্ম নিয়েছে। আমি জীবনের ছন্দে গেয়ে চলেছি—এসব তারই প্রকাশ। আমার কাব্য ও গান বড় হয়েছে কি ছোট হয়েছে, তা আমার জানা নেই। কিন্তু এ-কথা আমি জোর দিয়ে বলতে চাই—আমি জীবনকে উপভোগ করেছি পরিপূর্ণভাবে। দুঃখকে বিপদকে আমি দেখে ভয় পাইনি। আমি জীবনের তরঙ্গে তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। ক্লাসে ছিলাম আমি ফার্ষ্ট বয়। হেড্ মাষ্টারের বড় আশা ছিল -আমি স্কুলের গৌরব বাড়াব, কিন্তু এ সময় এল ইউরোপের মহাযুদ্ধ। একদিন দেখলাম, এদেশ থেকে পল্টন যাচ্ছে যুদ্ধে। আমিও যোগ দিলাম এই পল্টন দলে। চাঁটগায়ে গিয়েছি—সমুদ্র দেখেছি—তাতে ঝাঁপ দিয়ে জীবনকে করেছি পরিপূর্ণভাবে উপভোগ। একদিন একজন পুলিশ আমার মাথার সম্মুখে পিস্তল উঠিয়ে বললে,—"তোমাকে আমি মেরে ফেলতে পারি।" আমি বল্লাম, "বন্ধো! মৃত্যুকেই ত আমি চিরদিন খুঁজে বেড়াই।"

তরুণদের কাছে আমি চাই—তারা যেন জীবনকে পরিপূর্ণ-ভাবে উপভোগ করতে অগ্রসর হয়। আজ আমার সম্মুখে যে তরুণ সমাজকে দেখ্ছি, তাতে আমাকে নিরাশ হ'তে হয়েছে। তারা যেন জরায় আবৃত। জীবনের উজ্জ্বলতা ও প্রাণৈশ্বর্য আজ তাদের মধ্যে দেখ্তে পাই না। দু'কূলপ্লাবী জীবন ও যৌব-নের জোয়ার তাদের জীবনে আসুক—এটাই আজ তাদের নিকট আমি চাই। সকল প্রকারের ভীরুতা হতে জীবনকে মুক্তি দিতে হবে। এই সৃষ্টির সকল কিছুকে বুঝতে হবে, জানতে হবে এবং পরিপূর্ণভাবে তাকে উপভোগ করতে হবে। এই জন্যই শ্রদ্ধা হয় এ-যুগের বৈজ্ঞানিকদের প্রতি। তাঁরা চেয়েছেন সৃষ্টির রহস্য আবিষ্কার করতে। কি দুর্জয় তাঁদের প্রতিজ্ঞা ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস! সকল বিশ্বকে, সকল সৃষ্টিকে জানব, বুঝব ও উপলব্ধি করব - এই আত্মবিশ্বাস আমাদের তরুণদের জীবনে রূপায়িত হোক। এই-ই আমরা চাই। জীবনের পাত্র আমরা আবর্জনা দিয়ে বোঝাই করে রেখেছি, এই আবর্জনা হতে আমাদের জীবনকে মহতের উপযুক্ত আধার করতে হবে। নদীতে নুড়ি থাকে, এক ফোঁটা জল সে পায় না। কারণ, অন্তর তার শূন্য নয়। এমন ক'রে আমাদের অন্তর মুক্ত ক'রে বৃহৎকে জীবনে বরণ করে আনতে হবে। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। প্রকাণ্ড তাঁর সৃষ্টি। সে সৃষ্টির পশ্চাৎভূমিতেই জন্ম নিয়েছে চন্দ্র-সূর্য-তারকার সৃষ্টির ঐশ্বর্য। এই বৃহৎকে বুঝবার সাধনাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। এ-জন্য চাই সেই মুক্ত ও বিরাট জীবন।

সকল ভীরুতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা বিসর্জন দিতে হবে। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে নয়, ন্যায়ের অধিকারের দাবীতেই আমাদিগকে বাঁচতে হবে। আমরা কারও নিকট মাথা নত করব না—রাস্তায় বসে জুতা সেলাই করব, নিজের শ্রমার্জিত অর্থে জীবন যাপন

করব, কিন্তু কারো দয়ার মুখাপেক্ষী হব না। এই স্বাধীন-চিত্ততার জাগরণ আজ বাঙলার মুসলমান তরুণদের মধ্যে দেখতে চাই। ইহাই ইসলামের শিক্ষা; এ শিক্ষা সকলকে গ্রহণ করতে বলি। আমি আমার জীবনে এ-শিক্ষাকেই গ্রহণ করেছি। দুঃখ সয়েছি, আঘাতকে হাসিমুখে বরণ করেছি, কিন্তু আত্মার অবমাননা কখনও করিনি। নিজের স্বাধীনতাকে কখনও বিসর্জন দেইনি। "বল বীর, চির উন্নত মম শির"—এ-গান আমি আমার এ-শিক্ষার অনুভূতি হতেই পেয়েছি। এই আজদি-চিত্তের জন্ম আমি দেখতে চাই। ইসলামের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী—ইসলামের ইহাই মর্মকথা।

শিরাজী

শিরাজী সাহেব ছিলেন আমার পিতৃতুল্য। তিনি আমাকে ভাবিতেন জ্যেষ্ঠ পুত্র-তুল্য। তাঁহার নিকট হইতে যে স্নেহ আমি জীবনে পাইয়াছি তাহা আমার জীবনের পরম সঞ্চয়। ফরিদপুর কন্‌ফারেন্সে তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সমগ্র জীবনই ছিল অনল-প্রবাহ। আমার রচনায় সেই অগ্নি-স্ফূলিঙ্গের প্রকাশ আছে। সাহিত্যিক ও রাজনীতিক ছাড়াও আমার চোখে তিনি প্রতিভাত হইয়াছিলেন এক শক্তিমান দরবেশ-রূপে। মৃত্যুকে ভয় করেন নাই, তুরস্কের রণক্ষেত্রে তিনি সেই মৃত্যুর সঙ্গে করিয়াছিলেন মুখোমুখি। তাই অন্তিম মৃত্যু তাঁহার জন্য আনিয়া দিয়াছিল মহাজীবনের আস্বাদ। †

দৈনিক 'কৃষক'
৯ই চৈত্র, ১৩৪৭।

† ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় কলিকাতা ২।১ ইউরোপিয়ান এ্যাসাইলাম লেনে 'শিরাজী পাবলিক লাইব্রেরী ও ফ্রি রিডিং রুম'-এর দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ।

আল্লাহ্‌র পথে আত্মসমর্পণ

(১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর (১৩৪৭ সালের ৭ই পৌষ) রবিবার কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে কলিকাতা মুসলিম ছাত্র-সম্মিলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে কাজী নজরুল ইসলামের ভাষণ।)

আস্‌সালাম আলায়কুম্‌!

আমার সোদর-প্রতিম তরুণ-দল ও ছাত্রবৃন্দ! আপানাদের অনেকে বহুদিন থেকে এই দীন ফকীরের কাছে আসা-যাওয়া করছেন—যাঁরা আসেন না তাঁরাও নাকি আশা ক'রে বসে আছেন শির্ণীর আশায়!-যে ফকীরের ঝুলি রইল আজও শূন্য, আল্লাহর পরম রহমতের আশায় যে ভিক্ষু আজও উর্ধ্বের পানে হাত পেতে বসে আছে, তারই কাছে যখন আপনারা হাত পাতেন, তখন আমর আঁখি অশ্রুতে ভরে ওঠে। পরম করুণা-ময়ের পরম রহমত্‌ পাওয়ার শুভক্ষণ যখন এল ঘনিয়ে—যে ভাণ্ডার হতে তাঁর অনন্ত শক্তি অসীম করুণা নিয়ত বিতরিত হচ্ছে সেই অতি গোপন ভাণ্ডারের দ্বারে পৌঁছে যদি আমি আপনাদের আহ্বানে পিছু ফিরে চাই, তা'হলে বঞ্চিত শুধু আমিই হব না, হবেন আপনারা—যাদের জন্য আমার এই তপস্যা, এই হজ্ব-যাত্রা। আরফাতের ময়দানের তকবীর যখন শুনতে পাচ্ছি পবিত্র কাবাঘরের ছায়া যখন আকাশের নীল শিশায় ফুটে উঠেছে—তখন আমার আত্মীয় যারা তারাই যদি পিছু ডেকে ফিরাতে চায়, তা'হলে আমার দুনিয়া ও আখেরাত্‌ দুই হবে বর্‌বাদ্‌। আমার এই ঘোর দুর্দিনের, দুর্যোগের মরুভূমি দিয়ে তীর্থযাত্রা হবে নিস্ফল। 'সলুক' (Journy) ও 'তরিকতে'ই (Path) হবে আমার মৃত্যু।

বন্ধুগণ! আল্লাহ্‌ জানেন, আমার অমৃতের সাধনা—আমার

মুক্তির, আজাদীর সাধনা—আমার একার জন্য নয়। অমৃত যদি পাই, মুক্তি যদি পাই—সে অমৃত মুক্তিতে আপনাদের সকলের হিস্‌সা আছে। শুধু পরম গোপনকে জানাই আমার সাধনা নয়—তাঁকে জেনে তাঁকে পেয়ে প্রকাশ-জগতে আনার জন্যই আমার এ তপস্যা। আজ যখন আমার বন্ধুদের ভাইদের কাছ থেকে যশঃ-খ্যাতি-অভিনন্দনের ডালি আসে—তা গ্রহণ করতে ভয়ে আমার হাত আড়ষ্ট হয়ে আসে। আমি জানি, এ অভিনন্দন গ্রহণ করার আমার কোনো অধিকার নাই।

যে-দেশে লোক ভাড়া ক'রে যশঃ-খ্যাতি-অভিনন্দনের থালা ও মালার প্রোপাগাণ্ডা চলে, সে-দেশে আমি কেন যে বহু বৎসর ধরে আপনাদের আমন্ত্রণ ও অভিনন্দনকে অস্বীকার ক'রে আসছি - তার একমাত্র কারণ, আমার একদা এক শুভ প্রভাতে কেন যেন মনে হয়েছিল, বাইরের মালায় যার হাত পড়ল বাঁধা, অন্তর্লোকের—ঊর্ধ্বের পরম-দান থেকে সে হাত হ'ল চির-বঞ্চিত। বাইরের ক্ষুদ্র প্রশংসায় যার পাত্র উঠলো পূরে'- অমৃত পরিবেশনের শুভক্ষণে সে হ'ল অপাত্র।

কে করবে দেশকে স্বাধীন, কে আন্‌বে মুক্তি? কোথায় সেই স্বাধীন মুক্ত-আত্মা? যে নিজে নিত্য কামনা বাসনা লোভ অলঙ্কার ঈর্ষার কাছে নিত্য-পরাজিত—সেই বদ্ধজীবে কে আনবে জয়ের শুভ্র নির্মাল্য? যার অন্তর বাহির সমস্তটা রইল আত্মতৃপ্তির ক্ষুধায় পূর্ণ—সেই ক্ষুধিত মূর্তি আজ বাইরে ত্যাগের গেরুয়া ও খেল্‌কা পরে' কৌমের দেশের জনগণকে নিয়ে চলেছে মৃত্যুর পথে, জাহান্নামের পথে। "ডেমন" ও "ডার্ক ফোর্সে'র" শক্তি বিপুল—কিন্তু এ শক্তি কল্যাণের পথে নিয়ে যায় না—এদের পথ "সেরাতুল মোস্তাকিম" নয়—এ পথ "গজবের," অভিশাপের পথ। এ পথে আল্লাহর রহমতের ছায়া নাই—এ পথের পথিকের অন্তরে আল্লাহর

ভয় নাই। আল্লাহকে যে ভয় করে—আল্লাহর রসুলের প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা থাকে যে মুসলমানের—কোরআন মজিদের এক হরফও যারা হৃদয়ঙ্গম করে—তারা জাত-ভাইকে জাতিকে এমন মিথ্যার পথ দিয়ে নিয়ে যায় না। এদের খেল্‌কার ভিতরে, এদের চোগা-চাপকানের অন্দরে—যাঁদের অন্তর্দৃষ্টি যায়, তাঁরা দেখবেন—এরা সুদখোর কাবুলীর চেয়েও ভীষণ—দৈত্যের চেয়েও ভয়ঙ্কর। কাবুলী সুদ পেলে রেহাই দেয়, এরা সুদে-মূলে সাবাড় করতে চায়। অন্তরে আল্লাহর করুণার এক কণাও যে পেয়েছে, তার কখনো এই বীভৎস লোভী মূর্তি দেখা যায় না। সে কখনো বাইরের যশঃ-খ্যাতি-ঐশ্বর্যের মোহে জোঁকের মত কৌমকে জাতিকে রক্ত শুষে মেরে ফেলে না। অন্তরে যে আল্‌-ফাজালিল্‌ আজিম—পরম প্রসাদ দাতা আল্লাহর প্রসাদ পেল না—সে-ই বাইরে এই দস্যুবৃত্তি ক'রে বেড়ায়। তথা-কথিত স্বাধীন দেশেও এই শক্তি-মাতাল দানবের উৎপাত চলেছে—ভারতেও চলেছে এই শক্তি-লোভীর সাম্যহীন ভেদলীলা। যে দৃষ্টির দর্শন-শক্তি এই দেওয়ালের ওপারে পৌঁছায় না, সেই খর্ব-দৃষ্টি অন্ধের ইঙ্গিতে চলেছে অগণন জনগণ। এই নেতাদের শক্তি নাই, কিন্তু অতি কূটবুদ্ধি আছে; যৌবন নাই, কিন্তু যৌবনের কাঁদে ভর ক'রে জয়যাত্রার মিছিল বের করার প্রখর বুদ্ধি আছে। এই জয়যাত্রার মিছিলকে আমি দেখেছি—জানাজার মিছিলের মত। জরাগ্রস্ত জইফ্‌ যাঁরা তাঁদের উপর আমার ব্যক্তিগত কোন অশ্রদ্ধা নেই—আমার বর্তমান ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে পরিচিত যাঁরা তাঁরা জানেন আমার চেয়ে তাঁদের কেউ বেশী শ্রদ্ধা করেন না। আল্লাহ্‌ জানেন, তাঁদের বুজর্গ বলে পদধুলি নিতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই। কিন্তু তাঁরা যখন জাতীয় মহাযুদ্ধের সেনাপতি হয়ে অগ্রে চলতে চান—তখনই আমার পায় হাসি। আমি এই জায়গায় তাঁদের সালাম বা নমস্কার করতে পারিনি। জরার প্রধান ধর্ম হলো—

অতি সাবধানে পা টিপে টিপে বিচার করতে করতে চলা। এই অতি সাবধানীরা (ভীরু নাই বল্‌লাম) অগ্র-গমনের পথ পরিস্কার না ক'রে—পশ্চাতে "রিট্রিট" করার পথ উন্মুক্ত রাখতে চান। "আগে চলো—মারো জোয়ান—হেঁইয়ো" বলে এগুতে এগুতে যেই এসে পড়লো চৌরীচোরার হু'টো খুনোখুনী, অমনি সেনাপতির কণ্ঠে ক্রন্দন ধ্বনিত হ'ল—"পিছু হটো, পিছু হটো।" গণ-ঐরাবতের পায়ে কাপাস-তূলো চরকা-কাটা সূতোর পুঁটুলি বেঁধে দেওয়া সত্বেও তার বিপুল আয়তনের জন্য হু'টো চারটে লোক মারা গেল—এইটাই সেনাপতির চোখে পড়ল—আর (ভারতের কথা ছেড়ে দিলাম) এই বাংলা দেশে যে কালাজ্বর আর ম্যালেরিয়ায় বছরে বছরে এগার লক্ষ ক'রে লোক cold blooded murdered হচ্ছে—সেদিকে একচক্ষু সেনাপতির দৃষ্টি পড়ল না। কাণা হরিণের মত তাঁর মৃত্যুবাণও এল তাই ঐ ভয়ের পথ দিয়েই। মৃত্যুর ভয় যাঁর হয়ত নিজের গেছে—কিন্তু অন্যের মৃত্যু দেখলে যাঁর-মৃত্যু-যন্ত্রণা হয়—ভয়ে কুর্ম-অবতার হয়ে যান—তিনি আর যাই করুন অমৃত-সাগরের তীরে নিয়ে যাওয়ার সাধনা তাঁর নিস্ফল হয়েছে। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের মধ্যে যিনি পরম নিত্যম্‌, নিত্য পূর্ণম্‌—তাঁকে যিনি উপলব্ধি করলেন না, তাঁর সংহার-রূপকে যিনি অস্বীকার করলেন, ভয়ের পশ্চাতে অভয়কে দেখলেন না, তিনি আর যাই পান—পূর্ণকে পাননি। তবু কাঠ পুড়ছে বলে', যে শুধু কাঠের ধ্বংসই দেখল, আগুনের সৃষ্টি দেখল না, তার দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন নয়। এঁর এক চোখে দৃষ্টি আছে—আর বাকী যাঁরা তারা একেবারে দৃষ্টিহীন অন্ধ। এঁরা হাতে বড় বড় মশাল জ্বেলে চলেছেন—কিন্তু অন্ধের হাতে মশাল যত না আলো দেয় তার চেয়ে ঘর পোড়ায় বেশী।

এই জরাগ্রস্ত সেনাপতিদের বাহন আজ দেশের যুবক-শক্তি। এই যুবকদের কাঁধে চড়ে এঁরা যশঃখ্যাতি ঐশ্বর্যের ফল পেড়ে

খাচ্ছেন। বাহক যুবক-বৃন্দ তার অংশ চাইলে বলেন—আমরা ফল খেয়ে আঁটি ফেললে সেই আঁটিতে যে গাছ গজাবে তারই ফল তোমরা খেয়ো। এই আঁটির আশায় যুবকদের কণ্ঠ জরার জয়গান ক'রে চেঁচাতে চেঁচাতে আজ বাঁশের চাঁচাড়িতে পরিণত হয়েছে। চাকরীর দরখাস্তের পাতা পেড়ে দলে দলে যুবক, দেখতে তীর্থের কাকের মত হাঁ করে বসে আছে—ভোট ভিক্ষা করে তাদের ঠোঁট গেছে ছিঁড়ে, মোট বয়ে কোট হয়েছে নিম্‌স্তিন, পথে ঘুরে ঘুরে পায়জামা পরিণত হয়েছে জাঙ্গিয়ায়—কিন্তু দরখাস্তের পাতায় পোলাও আর পড়ল না। দু'চার জনের পাতায় যা পড়ল—তার চেহারা দেখে বাবুরচীর 'বাবুর' "চি঩" শব্দ—দুয়ের উপর আসে ধিক্‌কার। যুবকরা নিজেরাই জানেন, "ইয়ে তুঙ্গা উয়ো দুঙ্গা" বলে যাঁরা চোগা-চাপকানের পকেট দেখান—তাঁদের চাকরী বা অন্য যে কোন কল্যাণ-দানের শক্তি অতি সামান্য। তাঁদের ইচ্ছা থাকলেও দেওয়ার শক্তি নেই। তবু শিক্ষিত তরুণেরা স-তল্পী তাঁদের বয়ে বেড়াচ্ছেন --এই আশায় যে, কোন্ বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে কে জানে ? যাঁরা অন্যের ক্ষুধা দূর করার জন্য নিজের ক্ষুধা আগে মেটান—তাঁরা ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরতের বা তাঁর আসাহাবদের শিক্ষা কখনো গ্রহণ করেন নি। নিজের সাততলা দালানের আশ্রয় থেকে নিরাশ্রয় জনগণের জন্য কাঁদলে—তা কখনো তাদের হৃদয় স্পর্শ করবে না। অন্ধকূপে যে গেছে পড়ে - সাত মহলার উপরে থেকে "আরে কম-জোর ওঠ্ আরে কম্-বখ্‌ত্ ওঠ" বলে চেঁচালে সে কূয়া থেকে উঠতে পারবে না। উপরওয়ালা নেতার হুকুমে কূয়া থেকে উঠতে গিয়ে তার বুক যাবে ছিঁড়ে—পা যাবে ভেঙ্গে। যিনি সত্যিকার তাকে অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করতে চান—তিনি তাঁর সভ্য পোষাক, কালচারের কালচে-পড়া মুখোস খুলে কূয়ায় নেমে কাঁধ দিয়ে ঊর্ধ্বে তোলেন।---- এই কোটি

কোটি নিরন্ন নিরাশ্রয়ের বেদনায় যাঁর ক্ষুধার অন্ন মুখে উঠবে না—ঐ ভিক্ষুকদের সাথে পথে পথে করবেন ভিক্ষা—ঐ নিরাশ্রয়দের সাথে গাছ-তলা হবে যাঁর আশ্রয়—ইঁট-পাথর হবে যাঁর উপাধান—ছিন্ন কন্থা হবে যাঁর একমাত্র আবরণ—সেই পরম বৈরাগীই এই বাঙলার-ভারতের—মহাভারত বিশ্বের অনাগত সেনাপতি—নেতা—লীডার—ইমাম। যিনি অন্তরে আল্লাহ্‌র আনন্দরূপকে প্রাপ্ত হননি—পরম শান্তের শান্তির প্রসাদ যিনি পাননি—তিনি এই পথের দুঃখকে—অগণিত জনগণের জন্য এই দারিদ্র-অনাহার-উৎপীড়ন-আঘাতকে সহ্য করতে পারবেন না। অন্তরে পরম ঐশ্বর্য পেয়েও যিনি পরম ভিক্ষু—অনন্ত আসক্তির ভোগের মাঝে যিনি নিরাসক্ত নির্লোভ নিরভিমান নিরহঙ্কার—সেই পরম অভেদজ্ঞানী পরম সাম্য সুন্দরের প্রতীক্ষায় আমি দিন গুণছি। তাঁর আনন্দ-সুন্দর জ্যোতি মাঝে মাঝে ঝলকে ওঠে—হে আমার প্রিয়তম তরুণবৃন্দ—তোমাদের চোখে মুখে। তাঁর অজর অমর অক্ষয় তনুর বজ্র-শক্তির ঝিলিক দেখি তোমাদের শক্তিতে—তাঁর অভয়-সুন্দর দক্ষিণ হাতের আভাষ পাই তোমাদের বাহুতে। তোমরা ডাকো, ডাকো তাঁকে তোমাদেরই মাঝে, জরাজীর্ণ দেহে নয়, লোভ-অহঙ্কার-ঈর্ষার অপবিত্র দেহে নয়—তোমাদেরই শুদ্ধদেহে সেই সর্বভয়-মুক্ত সর্বভেদ-জ্ঞান-মুক্ত শক্তি-সাধনায় পূর্ণসিদ্ধ মহাপুরুষকে ডাকো তোমাদেরই মাঝে।

আমি আল্লাহ্‌র পবিত্র নাম নিয়ে এই আশার বাণী শোনাচ্ছি—তিনি প্রকাশিত হবেন তোমাদেরই মাঝে। জরাজীর্ণ দেহে নয়। তোমাদের আকাঙ্খা, তোমাদের প্রার্থনা আমার মত মহামূর্খকে লিখালেন কবিতা, গাওয়ালেন গান—তাঁর শক্তি এই নাম-গোত্রহীনের হাতে দিলেন আশার বাঁশী, আহ্বানের তূর্য, রুদ্রের ডমরু বিষাণ! তোমরা চাও—আরো চাও—দেখবে তোমাদেরই মাঝে চির-চাওয়া রুদ্র-সুন্দর আসবেন নেমে।

আল্লাহ্ তাঁর এই দাসের—বান্দার জীবনকে ভেঙ্গে চুরে মিসমার ক'রে নতুন ক'রে গড়েছেন। আমার আজও ভয় হয় যশঃখ্যাতির প্রলোভনকে; যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ।

সেদিন আল্লাহ্ তাঁর এই বান্দার অন্তর-বাহিরের সর্বসত্ত্বাকে তাঁর বলে গ্রহণ করবেন—আমার বলে কিছুই থাকবে না—যেদিন আমার পরম স্বামী পরম প্রভুর দরবার থেকে পাব ফরমান—সেই দিন আমি তাঁরই ইঙ্গিতে কর্মে নাম্‌ব; তার আগে নয়। আল্লাহ্ আমায় সর্ব-প্রলোভন হতে রক্ষা করুন। শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধপ্রেমের মিলনে তখন সে কর্ম হবে তাঁর কর্ম; এ বান্দার নয়—শুদ্ধ কর্ম। আজ আমার বলতে দ্বিধা নেই—আল্লাহ্‌র রহমত আমি পেয়েছি—আমার পরম প্রিয় "আল্ গফুরুল ওদুদ" (পরম ক্ষমা-সুন্দর ও প্রেমময়) আমাব নাজাত দিয়েছেন—কিন্তু অন্যকে মুক্ত করার শক্তি তিনি দেননি।

তার জন্য আমার কোন ব্যস্ততাও নেই। শান্ত হয়ে অটল ধৈর্য নিয়ে সেই শুভক্ষণের জন্য বসে আছি। যখন তার শক্তি নেমে আসবে আমাদেরই কারুর মাঝে—তুষার গলে' স্রোতস্বিনীর মত অনন্ত প্রবাহে, আপনাদের যারই মাঝে সেই শক্তি আসবে—সেই সেনানীর আদেশ এই বান্দা হাসিমুখে পালন ক'রে বন্য হবে। আল্লাহ্‌র সেই শক্তিকে গ্রহণ করার জন্য নিজেকে এই পথিবীর ঊর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়। অটল শান্ত ধ্যানী হতে হয়। ঊর্ধ্বে সঞ্চরণশীল মেঘদলকে সমতলভূমি গ্রহণ করতে পারে না—তাকে গ্রহণ করে সমতলের (plain-এর) ঊর্ধ্বে যে অটল গিরিচূড়া উঠেছে, সে। সেই ঊর্ধ্ব গিরিচূড়ায় সঞ্চিত হয় সেই মেঘদল তুষার রূপে। সেই তুষার বিগলিত হয়ে প্রবাহিত হলে অনুর্বর উপত্যকার অধিবাসীরা তার প্রসাদ পায়—তার দুই কূলে বাসা বাঁধে, তাদের অনুর্বর ক্ষেত্র উর্বর

হয়, ফলে-ফুলে ভরে ওঠে। আল্লাহ্‌র ঊর্ধ্বের জালাল-শক্তিকে স্পর্শ করতে হবে তাঁদের, যাঁরা দেশকে জনগণকে পরিচালিত করতে চান। বদ্ধ পুকুরের পানি দিয়ে দেশকে শস্যশ্যামল করা যায় না। আপনাদের তরুণেরা প্রত্যেকেই অনাগত লীডার—তাই আপনাদের এই ঊর্ধ্বের কথা বললাম। যদিও আমি সেই নিরক্ষরদের একজন।

আপনারা জেনে রাখুন—আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কিছুর কামনা আমার নেই—'লীডার' হওয়ার লোভ ও দুর্গতি থেকে আল্লাহ্‌ আমাকে বাঁচিয়েছেন। আজ মোল্লা-মৌলভী সাহেবদের মুসলমানীর ফখরের কাছে টেকা দায়। কিন্তু তাঁদের আজ যদি বলি—যে ইসলামের অর্থ আত্মসমর্পণ—আল্লাহ্‌তালায় সেই পরম আত্মসমর্পণ করা হয়েছে? আল্লাহে পূর্ণ আত্মসমর্পণ যাঁর হয়েছে—তিনি এই দুনিয়াকে এই মুহূর্তে ফেরদৌসে পরিণত করতে পারেন। আমরা কথায় কথায় অন্য ধর্মাবলম্বী ও নিজ ধর্মের জ্ঞানবাদীদেরে কাফের বলে' থাকি। এই কাফেরের অর্থ আবরণ, বা যা আবৃত ক'রে রাখে। কাফের ও ইংরাজী "কভার" এক ধাতু থেকে উৎপন্ন কিনা—ভাষা-তত্ত্ববিদরা বলবেন। আল্লাহ্‌ ও আমার মাঝে যতক্ষণ আববণ রইল, ততক্ষণ আমি কাফের, অর্থাৎ আমার পরম তত্ত্ব, আমার শক্তি ও সত্য ততক্ষণ আবৃত। এমন একজন মুসলমানেরও যদি, বাঙলায় কেন, সারা দুনিয়ায় সন্ধান পান—আমি তাঁর কাছে মুরীদ হতে রাজী আছি। আমার মধ্যে যতক্ষণ আবরণ অর্থাৎ ভেদাভেদ-জ্ঞান, সংস্কার, কোন প্রকার বাধা-বন্ধন আছে—ততক্ষণ আমার মাঝে "কুফর"ও আছে। আমি সর্ববন্ধন-মুক্ত, সর্বসংস্কার-মুক্ত, সর্বভেদাভেদ-জ্ঞান-মুক্ত না হলে—সেই পরম নিরাবরণ পরম মুক্ত আল্লাহকে পাব না আমার শক্তিতে। শক্তিমান পুরুষই কৌমের জাতির, দেশের,

বিশ্বের ইমাম হন--অধিনায়ক হন। অনন্ত দিন যাঁকে ধরতে পারেনি, সেই পরম দিগম্বরের করুণা পাবে এই সব দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য লোভীর দল? যে জাতির পবিত্র কোরানের প্রথম শিক্ষা—"আলহামদু লিল্লাহে রাব্বল আলামিন"—সমস্ত প্রশংসা মহিমা যশঃ খ্যাতি আল্লাহর প্রাপ্য, আমার নয়—সেই আয়েত দিনে শতবার উচ্চারণ ক'রেও যারা ভোগের পাঁকে পড়ে রইলেন কর্দম-বিলাসী মহিষের মত—তাঁরা আর যাই হন—আল্লাহ্‌র ও তাঁর রসুলের কৃপা পাননি। আল্লাহর কৃপাপ্রাপ্ত একজন মুসলমানই যথেষ্ট, sixty percent তিনি গণনা করেন না। নিত্য-আজাদ মুসলমানকে তিনি গোলামখানায় নিয়ে যান না। যারা অনাগত "বদর" "ওহোদের" যুদ্ধে বীর শহীদান হতে পারত—জাতির দেশের সেই শ্রেষ্ঠ শক্তিমান সন্তানদের তিনি কশাই-খানায় পাঠান না। যে দৃষ্টি আপাত-মধুর লভ্যের লোভে তলোয়ারকে করে ঝিঙে চাঁচার বঁটি, মাটি খোঁড়ার খোন্তা—সে দূরদর্শী দ্রষ্টা নয়। অন্যেরা মাল পয়মাল ক'রে নিজে ধনী হওয়ার গুপ্ত লোভ তার অন্তরে জটিল সাপের মত ফণা গুটিয়ে আছে। তার মাথায় মণি থাকলেও সে বিষধরা ফণী। তাকে এড়িয়ে চলতে হবে। যে তরুণের বাজুতে শোভা পেত এস্‌ম্ আজমের তাবিজ, সেই হাতে বাঁধা আজ ভোট ভিক্ষার ঝুলি। যে কণ্ঠের তকবীর-ধ্বনি আল্লাহর আরশ কাঁপিয়ে তুলতে পারে, সেই কণ্ঠ আজ নেতার জয়ধ্বনিতে হ'ল কলঙ্কিত। হে তরুণ! তোমরা কি যাবে ঐ লোভের পথে—ঐ গোলামীর কশাইখানায়? আজ চাকুরী-লোভী বাঙালী হিন্দু-জাতির দুর্দশা দেখ। চাকুরী যদি এরা গ্রহণ না করত, তা হলে এই বাঙালী অসাধ্য সাধন করতে পারত। যে লোকগুলো এক-পেট পিলে আর এক-পিট অপমান নিয়ে মরল—(মরতে তাদের হলই কিম্বা যারা বাঁচল তারা হয়ে

রইল মরারও বাড়া) তারা না হয় দু'দিন আগেই মরত। মরে স্বাধীনতা আনলে তাদের বাপ-মা ছেলেমেয়ে আরও ঐশ্বর্য পেত, যশঃ পেত, সম্মান পেত। তাদের ভালো খোরাক-পোষাকের ব্যবস্থা স্বাধীন ভারত করত। যে কয়টা মৃত্যু-বিলাসী—হ্যাঁ, মৃত্যু ওদের আনন্দবিলাস ছিল বৈ কি—বাঙ্গালী ছেলে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাঞ্জা কষল—সেই নাম-না-জানা শহীদদের প্রসাদে দেশে যতটুকু এল স্বায়ত্বশাসন—তারই ছিবড়ে নিয়ে আজ আমরা কামড়া-কামড়ি করছি! আজ মুসলমান ছেলেরা সেই আত্মত্যাগীদের আত্মার কাছে শির উঁচু করে দাঁড়াতে পারে? জেহাদের পথে -শহীদানদের মৃত্যু-সঙ্কুল পথে এগিয়ে যেতে পারে? আমি গেয়েছি এই শহীদদেরই জয়-গাথা! তাদেরই জন্য আজও আমি লুকিয়ে কাঁদি। আল্লাহর রহমত পেয়েও তাদের কথা তাদের ত্যাগ মনে পড়লে আমি শিশুর মত চীৎকার ক'রে কাঁদি! যে নিত্য-শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছি, সেই শান্তির অটল আসন আমার টলতে থাকে।

আমি জানি, তোমাদের মাঝে বহু তরুণ আছেন—যাঁদের রুহ্, আত্মা জাগ্রত। যাঁরা বাইরের সম্মান, লোভ, খ্যাতি সব কিছু বিসর্জন দিয়ে রাহে-লিল্লাহ আপনাকে সদ্‌কা দিতে রাজী আছেন—আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করি—তাঁরা কি গ্রহণ করবেন দুনিয়ার এই ক্ষণিক ভোগের পথ? তাঁরা কি গ্রহণ করবেন না এই মহামন্ত্র—"ইন্না সালাতি ও নুসুকি ওয়া মাহয়্যায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন"—"আমার সব প্রার্থনা, নামাজ রোজা তপস্যা জীবন-মরণ সব কিছু বিশ্বের একমাত্র পরম প্রভু আল্লাহর পবিত্র নামে নিবেদিত!" যে সংসারেরর সুখের জন্য তুমি আজ এত লালায়িত—তুমি কি বলতে পার, এই সভা হতে বাড়ী যাওয়ার আগেই তোমার সে লালসা চিরকালের জন্য

ফুরিয়ে যাবে না? তোমার বাপ-মা-ছেলে-মেয়ের ভাই-বোনের জন্য তুমি চিন্তা ক'রে তাদের কী দুঃখ-দারিদ্র্যমুক্ত করতে পেরেছ বা পার? তুমি কি জান, তোমার জন্মেও যেমন তোমার হাত নেই—তোমার বা তোমার আত্মীয়ের মৃত্যুতেও তেমনি তোমার কোন হাত নেই? যে কোন মুহূর্তে তোমার পিতামাতার সাধ-আশাকে মৃত্যু তার স্থূল হাত দিয়ে মুছে ফেলতে পারে! তুমি কি জান, তোমার বা তোমায় পিতামাতার ভার তোমার হাতে নেই—এই ভার একমাত্র যাঁর হাতে সেই আল্লাহর শক্তিতে নির্ভর কর—তাঁর পরমাশ্রয়ে তোমার আত্মীয়-স্বজনকে সমর্পণ ক'রে রাহে-লিল্লাহ আত্মনিবেদন কর। আমি আল্লাহর পবিত্র নাম নিয়ে বলছি এই আত্মনিবেদনেই তুমি তোমার আত্মীয়দের অভাবগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারবে। বিশ্বাস কর—আল্লাহ্ আল্গণি, তাঁর কোন অভাব নেই নিত্য-পূর্ণ—যে তাঁকে ডাকে, তিনি তার সমস্ত অভাব দূর করেন, তাকে পরম কল্যাণের পথে হাত ধরে নিয়ে যান। বিশ্বাস কর—তাঁতে আত্মনিবেদন করলে তুমি বাদশাহর বাদশাহ্ যিনি তাঁর পরম করুণা প্রাপ্ত হবে। যে অদৃশ্য শক্তির হাতের পুতুল আমরা—সেই অনন্ত অপরিমাণ শক্তি যে উৎস হতে নিয়ত উৎসারিত হচ্চে সেইখানে খোঁজ পরম ঐশ্বর্যের সন্ধান। গোলামখানায়—কতলগাহে সে ঐশ্বর্যের এক কণাও নাই।

লাঁডাবের কাছে শক্তি ভিক্ষা করো না—আল্লাহ এতে নারাজ হন শক্তি ভিক্ষা করো একমাত্র আল্লাহর কাছে। জয়ধ্বনি মহিমা কীর্তন করো একমাত্র আল্লাহ্‌র।

বন্ধু! আমি জানি, তোমাদের অনেকে আমারই পানে চেয়ে' আছে সেই অগ্রপথিকের নিশান তুলে জয়যাত্রার পথে চলতে। আল্লাহ্ জানেন, আমি আত্ম-প্রতারণা করি নাই, আমি তাঁর বিষাণ বাজানোর আদেশ পেয়েছি—নিশান ধরার হুকুম পাইনি। তবে

পঙ্গু যাঁর কৃপায় গিরি লঙ্ঘন করে—যাঁর করুণায় জন্ম-অন্ধের চক্ষে সাত আসমানের দ্বার যায় খুলে—তাঁর কৃপা যদি পাই, তাঁর আদেশ যদি আসে—আমি আপনাদের বিনা আহ্বানেই এসে ডাকব···

ভেঙেছে দুয়ার, জেগেছে জোয়ার, রেঙেছে পূর্বাচল,
খুলে গেছে দেখ দুর্গতি-ভরা দুর্গের অর্গল
মৃত্যুর মাঝে অমৃত যিনি—এনেছে তাঁহার বাণী,
পেয়েছি তাঁহার পরমাশ্রয়, আর ভয় নাহি মানি
সকল ভয়ের মাঝে রাজে যাঁর পরম অভয় কোল,
সেই কোলে যেতে, আয় রে কে দিবি মরণ-দোলাতে দোল।

দৈনিক 'কৃষক'
৮ই পৌষ, ১৩৪৭।

মধুরম্

(১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ বনগাঁ সাহিত্য-সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।)

বনগ্রাম সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতি মনোনীত ক'রে আপনারা গৌরব দান করেছেন, তজ্জন্য বনগ্রামবাসী সকলে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আজ আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আপনাদের দেওয়া এই অমূল্য শিরোপা আমি অকুণ্ঠিত শিরে ধারণ করতে পারিনি। আমার কাছে গৌরবের চেয়ে লজ্জার অনুভূতিই হয়ে উঠেছে অধিকতর।

সাহিত্যের কোন কুঞ্জে আজ আর আমার কোন গতিবিধি নেই; আজ আমি যেন নীড়ভ্রষ্ট। রস-কুঞ্জের পুষ্পিত পবিল্লত তরুলতার স্নেহচ্ছায়া-বিচ্যুত আমি কখন যে গভীর সমাধির অতল গহ্বরে গিয়ে প্রবেশ করলাম, তা আজও আমার স্মাবণাতীত। সঙ্গীত-মুখর মহফিল থেকে কোন্ মহা-মৌনী আমায় যেন আমারও অজ্ঞাতসারে চুরি ক'রে নিয়ে যেতেন কোন্-এক-না-জানা শূন্যে; যেখানে বাণী নেই, সুর নেই – শুধু অনুভূতি, শুধু ইঙ্গিত।

বাইরের প্রয়োজন, অভাবের আহ্বান আমায় বারে বারে কেড়ে এনেছে সেই মৌনীর কোল থেকে, নিগড়ের পর নিগড় দিয়ে আমায় বেঁধেছে কর্মের কারাগারে। আমিও বারে বারে ছিন্ন করেছি সেই বন্ধন, বারেবারে পালিয়ে যেতে চেয়েছি সেই পরম একাকার শান্ত সমাধি-তলে। এই দোটানার দুঃখ থেকে মুক্ত হতে আমি আমাকে কঠোর শাস্তি দিয়েছি। আমার প্রিয় সখা আত্মীয়াধিক বন্ধুদের দেওয়া নির্মাল্য নিষ্ঠুর হাতে ছিন্ন করেছি। যারা দেখছিল আমার হাতে আশার আলো, তাদের সে দেখা ব্যর্থ করেছি আমার হাতের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে—এই আলোকে

অনুসরণ ক'রেই তারা আমার সমাধির শান্তিতে বাধা সৃজন করতো।

অই সমাধির মাঝে শুনতাম, অনন্ত প্রকাশ যেন আমায় ঘিরে কাঁদছে—'ফিরে আয় ফিরে আয়।' কেন যেন মনে হ'ত, এই নিথর নির্বিকার শান্তির পথ আমার নয়। সমাধির তৃষ্ণা যখন মিটল পরম একাকীর পরম শূন্য সেদিন যেন আমার সাথিহীন একাকীত্বের বেদনায় কেঁদে উঠল। সেই রোদনের অসীম প্রবাহকূলে দেখা পেলাম আমার চির-চাওয়া পরম-সুন্দরের—সেইখানে অনন্ত প্রেম, আনন্দ, অমৃত, রস ও বিরহের যে-লীলা দেখলাম, তা প্রকাশের শক্তি যদি পরম-সুন্দর আমায় দেন, তা হলে পৃথিবী এই রস-ঘন প্রিয়-ঘন পরমানন্দলোকের রূপে রূপায়িত, ছন্দে গানে সুরে রসায়িত হয়ে, উঠবে। আমার বাঁশীতে যে-সুর বাজত—যে বাঁশী আমি অভিমানে দিয়েছিলাম ফেলে, সেই হারানো বেণু আবার ফিরে পেলাম সেই চির-সুন্দর-লোকের অশ্রুমতী নদীর তীরে।

যে অপরূপ শ্রীমাখা মুখখানি আমার কল্পনায় উঠত ভেসে, যে শ্রীমুখের আভাস ফুটে উঠত আমার গানে কবিতায় ছন্দে সুরে—যার বিরহ, যার আকর্ষণ আমায় ধূলির পথ থেকে চন্দনিত নন্দনের পথে নিত্য আকর্ষণ করেছে—যার অশ্রু-ছলছল রস-ঢলঢল বিরহ-সুন্দর মুখখানি না দেখে পরম শূন্যের লয়েও শান্তি পাইনি—সেই পরমা-শ্রীমতি প্রেমময়ীকে সেইখানে দেখলাম। যদি তাঁর অনন্ত শ্রীর একটি রূপ-রেণুকেও আমার কাজে, গানে, সুরে আজ রূপ দিয়ে যেতে পারি, তা হলে আমি ধন্য হব—পৃথিবীতে আসা আমার সার্থক হবে।

আমায় সাহিত্য-সম্মেলনে ডেকেছেন সাহিত্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শোনার জন্য—mystic তত্ত্ব শোনার জন্য নয়। কিন্তু

আপনাদের দেরী হয়ে গেছে—দু'দিন আগে যেমন ক'রে যে-ভাষায় বলতে পারতাম সে-ভাষা আজ আমি ভুলে গেছি। এই 'মিষ্টিসিজম' বা মিষ্টীর মাঝে যে, মিষ্টি, যে মধু পেয়েছি, তাতে আজ আমার বাণী কেবল 'মধুরম্ মধুরম্ মধুরম্'। এই মধুরম্‌কে প্রকাশের ভাব-ভঙ্গী-ভাষা এখন আমার চিরমধুরের ইচ্ছাধীন। আজ আমার সকল সাধনা, তপস্যা, কামনা, বাসনা, চাওয়া, পাওয়া, জীবন, মরণ তাঁর পায়ে অঞ্জলি দিয়ে আমি আমিত্বের বোঝা বওয়ার দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছি। আজ দেখি, অনন্ত আকাশ বেয়ে যেন আমার সেই পরম-সুন্দরের পরমাশ্রু ঝুরে পড়ছে—অনন্ত ভুবন ধরতে পারছে না সে পরমা শ্রীকে—অনন্ত নীহারিকা-লোক থেকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ছুটে আসছে উন্মাদ বেগে সেই পরমা শ্রীর প্রসাদ লোভে।

আজ আমার মনে হয়, এই নিত্য পরমানন্দময়ী পরম প্রেমময়ী পরমা-শ্রীই আমার অস্তিত্ব—আমার শক্তি। নিরাকার নির্গুণ অবাঙ্-মানস-গোচর ব্রহ্ম যেমন তাঁর শক্তির আশ্রয় ভিক্ষা করেন সৃষ্টির রূপে, গুণে প্রাতভাত হন বা মনের গোচর হন, এই প্রেম-শক্তির আশ্রয় পেয়ে আমিও তেমনি আবার আমার সৃষ্টিতে যেন ফিরে আসছি। এই প্রেমই যেন আমার অস্তিত্ব। এই অস্তিত্ব, এই প্রেমকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলেই যেন আমি অভিমানে সংসারের পথে চলেছিলাম। এই পরম-নিত্য প্রেম-শক্তিকে পেয়েই আমি পরম নিত্যম্—আমার eternal existence-কে পেলাম।

এ-কথা বললাম এই জন্য যে, আমার সাহিত্য-সাধনা বিলাস ছিল না। আমি আমার জন্মক্ষণ থেকে যেন আমার শক্তি বা আমার অস্তিত্বকে existence-কে খুঁজে ফিরেছি। যখন আমি বালক, তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার কান্না আসত—

বুকের মধ্যে বায়ু যেন রুদ্ধ হয়ে আসত। আমার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতাম—'ঐ আকাশটা যেন ঝুড়ি আমি যেন পাখীর বাচ্চা, আমি অই ঝুড়ি-চাপা থাকব না আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।' তাই য়ুনিভারসিটির দ্বার থেকে ফিরে য়ুনিভার-সের দ্বারে হাত পেতে দাঁড়ালাম। জীবনে কোন দিন কোন বন্ধনকে স্বীকার করতে পারলাম না। কোন স্নেহ-ভালবাসা আমায় বুকে টেনে রাখতে পারল না। এই পরম তৃষ্ণা যে কোন্ পরম-সুন্দরের, তা বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারিনি বলেই অবুঝের মত পথ থেকে পথান্তরে ঘুরেছি। কল্পনার অনন্ত শূন্যে অনন্ত শ্বেত শতদলেব মাঝে একখানি অপরূপ সুন্দর মুখ দেখেছি—সেই মুখ যেন নিত্য আমাকে অসুন্দরের পথ থেকে ফিরিয়েছে—কেবলই ঊর্ধ্বের পানে আকর্ষণ করেছে। আজ সেই মুখখানি খুঁজে পেয়েছি—আজ তাঁর দেখা পেয়ে প্রথম উপলব্ধি করেছি 'রসো বৈ সরঃ' অর্থ, অনন্ত আকাশ বেয়ে মধুক্ষরণ কী করে হয়, সে মধু পান করেছি। আমার এই পরম মধুময় অস্তিত্বে প্রেম-শক্তিতে আত্মসমর্পণ ক'রে আমি বেঁচে গেছি, আমার অনন্ত জীবনকে ফিরে পেয়েছি।

এঁকে খোঁজার পথেই যে ক'দিন কেঁদেছি, যে গান গেয়েছি, যে সুর সৃষ্টি করেছি, যে কবিতা লিখেছি, তা যদি কবিতা হয়ে থাকে, তবে তা সেই সুন্দর মুখখানিরই কৃপা সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। যদি তা কবিতা না হয়ে থাকে, আমার কোনো দুঃখ নেই। কেননা, আমি আমার প্রকাশের ব্যাকুলতার উন্মাদনায় কী প্রলাপ বকেছি, তা যদি গোলাব বকুল হয়ে রূপ পরিগ্রহ না ক'রে থাকে—সে আমার অক্ষমতা, অপবাধ নয়। আমি কবি-যশ-প্রার্থী হয়ে জন্মগ্রহণ করিনি। আমি আমার অস্তিত্বকে, আমার শক্তিকে খুঁজতে এসেছিলাম পৃথিবীতে—তাঁর দেখা

পেয়েছি—তাঁর পরম-সুন্দর নয়নের পরম প্রসাদ পেয়েছি—এই কথাই যেন আমার ফিরে-পাওয়া বেণুকায় গেয়ে যেতে পারি। আমার জীবনের চির-একাদশীর উপবাস-তিথি শেষ হয়ে এল, পূর্ণ চাঁদের উদয়ে আমার জীবন অমৃতে মধুরে আনন্দে প্রেমে রসে পূর্ণ হয়ে উঠল—শুধু এই কথাই যদি আমার বিরহ-যমুনা-তীরে বসে' আমার বেণুকায় গেয়ে যেতে পারি, আমি ধন্য হব। তাতে পৃথিবীর কি মঙ্গল হবে, নিত্য-মঙ্গলময় জানেন—সে ভার আমার উপরে তিনি দেননি।

নদী যেমন নিত্য সাগরকে পেয়েও নিত্য কাঁদে—নিত্য মিলন নিত্য বিরহের রস উপলব্ধি করে, আমি তেমনি করে তাঁতে যুক্ত থেকেও তাঁর জন্য কাঁদব—সেই ক্রন্দন যদি সাহিত্য না হয়, কবিতা না হয়, আপনাদের ক্ষমা-সুন্দর মন যেন এই প্রেম-ভিক্ষুককে ক্ষমা করে। সে কান্না শুধু আমাদের দু'জনের, পরম রুদ্রকে সৃষ্টিতে ধরে' রাখার জন্য পরম শক্তির।

যদি আর বাঁশী না বাজে

(১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৫ই ও ৬ই এপ্রিল কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির রজত-জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি-রূপে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর জীবনের এই শেষ অভিভাষণ প্রদান করেন।)

আপনারা এই ভিখারীকে "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির" জুবিলী-উৎসবে সভাপতি কেন যে মনোনীত করলেন, যিনি বিশ্ব-ভুবনের পরম পতি, পরম গতি, পরম প্রভু, তিনিই জানেন। আপনাদের কাছে আজ অজানা নেই যে, ঘরে-বাইরে, সভায় বা সমাধির গোপন গুহায় কোথাও পতিত্ব করার ইচ্ছা বা সাধ আমার নেই। যিনি সকল কর্মের, ধর্মের, জাতির, দেশের সকল জগতের একমাত্র পরম স্বামী—পতিত্ব বা নেতৃত্ব করার একমাত্র অধিকার তাঁর। এ অধিকার মানুষেও পায়, মানি। কিন্তু সে পাওয়া যদি তাঁর কাছ থেকে না হয়, তারে বলে অহঙ্কার। এই অহঙ্কারকে আমি অসুন্দরের দূত বলে মনে করি। এ অহঙ্কার Divine নয়, Demon। অসুন্দরের সাধনা আমার নয়, আমার আল্লাহ্ পরম সুন্দর। তিনি আমার কাছে নিত্য প্রিয়-ঘন সুন্দর, প্রেমঘন সুন্দর, রস-ঘন সুন্দর। আনন্দঘন সুন্দর আপনাদের আহ্বানে যখন কর্ম-জগতের ভিড়ে নেমে আসি, তখন আমার পরম সুন্দরের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হই, আমার অন্তরে বাহিরে দুলে ওঠে অসীম রোদন। আমি তাঁর বিরহ এক মুহূর্তের জন্যও সইতে পারি না। আমার সর্ব-অস্তিত্ব, জীবন-মরণ কর্ম, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যে তাঁরই নামে শপথ ক'রে তাঁকে নিবেদন করেছি! আজ আমার বলতে দ্বিধা নেই, আমার ক্ষমা-সুন্দর প্রিয়তম আমার আমি-ত্বকে গ্রহণ করেছেন।

আমার বহু আত্মীয়াধিক প্রিয় সাহিত্যিক ও কবি বন্ধু আমায় অভিযোগ করেন, আমরা না-কি দান করার অপরিমেয় শক্তি ছিল দেশকে, জাতিকে, সাহিত্য-রস-পিপাসু মনকে—শুধু কার্পণ্য ক'রে বা স্বার্থপরের মত আপন মুক্তির প্রচেষ্টায় সেই দক্ষিণা-দানের দক্ষিণ হস্তকে উর্ধ্বে, না-জানা শূন্যের পানে তুলে ধরেছি। তাঁরা আমার আত্মীয়ের চেয়েও ভালবাসেন; তাঁরা যখন এ-কথা বলেন, আমার চোখের জলে বুক ভেসে যায়! যে অভিমান তাঁরা আমার উপর করেন, সেই অভিমান জানাই আমি আমার নির্বিকার উদাসীন একাকীত্ব নিয়ে আমার পরম সুন্দরকে। যে মহাসাগর থেকে ঝড়ের রাতে শ্যাম-ঘন মেঘ-রূপে আমি সহসা এসেছিলাম, ঘন ঘন বিদ্যুৎ-ছটায়, বজ্রের রোলে, ঘোর তিমির-ঘনঘটায়, মুক্ত-জটায় দিগ্‌দিগন্ত ছেয়ে ফেলেছিলাম, অজস্র বারিবর্ষণে তৃষিত মাঠ-ঘাট প্রান্তরের তৃষা মিটিয়েছিলাম; আমার রুদ্র-সুন্দর নৃত্য দেখে যাঁরা দেখতে পাননি যে, এই অশান্ত মেঘ-ঘন রূপ শুধু রুদ্রের ডমরু বিষাণ নিয়েই আসেনি, এরই করুণ নয়নের অশ্রু-ধারায় পৃথিবীতে ফুটেছে প্রেমের ফুল, শতদল-বৃন্ত; বন-লতা হয়ে উঠেছে আনন্দে কণ্টকিত, এই মেঘই এনেছে আনন্দ-বন্যা, ছন্দের নূপুর-ধ্বনি সুরের সুরধ্বনী, গানের প্রবাহ,—সেই মেঘ একদিন দেখতে পেল, তুষারীভূত হয়ে শ্বেত-শুভ্ররূপে হিমালয়ের উচ্চতম শিখরে পড়ে আছে। তার শক্তি—তার প্রিয়াও যেন মহাশ্বেতা-রূপে তার বামে সমাধিস্থা। সেই সমাধির মাঝে আমি যেখান থেকে এসেছিলাম সেই সমুদ্রকে স্মরণ করলাম। সহসা মনে হ'ত, এই মহাসমুদ্র এল কোথা থেকে! খুঁজতে গিয়ে মন বুদ্ধি অহঙ্কার -সবকিছু হারিয়ে যেত আকাশের পর আকাশ পেরিয়ে কোন্ এক পরম শূন্যে। তাই, বন্ধুদের বলেছি, এ আমার কার্পণ্য নয়, স্বার্থপরতা নয়—এ আমার স্বধর্ম, এ আমার স্বভাব। তাঁরা তুষারীভূত

আমাকে ভেঙে যেটুকু বরফ পেয়েছেন, তাতে তাঁদের তৃষ্ণা দূরীভূত হয় না বলেছেন, আমি তাঁদের আমার অসহায় অবস্থার কথা বললে বিশ্বাস করেননি। ঘুড়ি উড়তে উড়তে গেছে ডালে আটকে, টানাটানি করলে সূতো ঘুড়ি সব যাবে ছিঁড়ে,—অবুঝ হাত তবু টানা-হেঁচড়া করতে ছাড়ে না।

আপনাদের এই সাহিত্য-সভায় রসের জলসায় আপনারা আমাব অসহায় জীবনী শুনতে আসেননি। আমি আমার এ অসহায় অবস্থার কথা আগেই জানিয়েছিলাম। যার গলায় হয়েছে টনসিল্ বা বেধেছে কুলের আঁটি, সে সঙ্গীত-শিল্পীকে জোর ক'রে গান গাওয়ালে সে যত না গাইবে গান, তার চেয়ে অনেক বেশী ক'বে প্রকাশ করবে তার কণ্ঠেব অসহায় অবস্থা; সুরের চেয়ে আটি আর টন্সিলের ব্যথাই বড় হয়ে উঠবে! আপনারা ইচ্ছা ক'রে এ শাস্তি গ্রহণ কবছেন; আমি নিবপরাধ। যে সিংহ আছে খাচায় আটকে—তার ল্যাজ ধরে টেনে ল্যাজ ছিঁড়ে ফেলতে পারেন, হুঙ্কারও শুনতে পাবেন, কিন্তু তাকে টেনে বের করতে পারবেন না। যিনি বন্ধ করেছেন তিনি দয়া ক'রে দুয়ার না খুললে আমার বাইরে আসার কোনো উপায় নেই।

আনন্দ-বস-ঘন স্বর্ণবর্ণের এক না জানা আকাশ থেকে যে শক্তি আমার রস সরবরাহ করতেন—আগেই বলেছি, তিনি মহা-শ্বেতা-রূপে মাঝে মাঝে হয়ে যান সমাধিস্থা। তখন আমিও হয়ে যাই নীরব, আমায় বাঁশী আব বাজে না, রস-স্রোত হয়ে যায় তুষারীভূত, আমাব আনন্দময় তনু হয়ে যায় পাষাণ-বিগ্রহ। এ মৃত্যু নয়, কিন্তু মৃত্যুর চেয়েও নিরানন্দময়। আজ আপনাদের কাছে বলে' যাব—আমার নিদ্রিতা সমাধিস্থা শক্তি জেগেছেন, তবে তন্দ্রার ঘোর—সমাধিব বিহ্বলতা এখনো কাটেনি। আমাব সেই আনন্দময়ী শক্তি যদি আবার সমাধিস্থা না হন, আমায় পরম শূন্যে

নিয়ে গিয়ে চিরকালের জন্য লয় না করেন—তা'হলে এই পৃথিবীতে যে প্রেমের—যে সাম্যের—যে আনন্দের গান গেয়ে যাব—সে গান পৃথিবী বহু কাল শোনেনি। আমার চির-জনমের প্রিয়া এই প্রেম-ময়ীর প্রেম যদি না পাই—তা'হলে বুঝব আমার এ-বারের মত খেলা ফুরাল। আমার বাঁশী বিরহ-যমুনার তীরে ফেলে চলে যাব—শুষ্ক যমুনার বালুচর থেকে সেই বেণু কুড়িয়ে যদি অন্য কেউ বাজাতে পারেন, আমার ফেলে-যাওয়া বাঁশী ধন্য হবে।

যাঁর ইচ্ছায় আজ দেহের মাঝে দেহাতীতের নিত্য-মধুর রূপ দর্শন করেছি—তিনি যদি আমার সর্ব-অস্তিত্ব গ্রহণ ক'রে আমার আনন্দময়ী প্রেমময়ী শক্তিকে ফিরিয়ে দেন, সেই শক্তির চোখে আবার যদি অশ্রুর বন্যা বয়, তাঁর অঙ্গে যদি আবার অমৃত-রস-ধারা প্রবাহিত হয়, আবার যদি তাঁর চরণে রাস-নৃত্যের ছন্দ জাগে—তা হলে আমি এই বিদ্বেষ-জর্জরিত কুৎসিৎ সাম্প্রদায়িকতা-ভেদজ্ঞান-কলুষিত অসুন্দর অসুর-নিপীড়িত পৃথিবীকে সুন্দর ক'রে যাব; এই তৃষিতা পৃথিবী বহুকাল যে প্রেম, যে অমৃত, যে আনন্দ-রসধারা থেকে বঞ্চিত—সেই আনন্দ, সেই প্রেম সে আবার পাবে। আমি হব উপলক্ষ্য মাত্র, আধার মাত্র; সেই সাম্য, অভেদ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম আসবে আমার নিত্য পরম-সুন্দর পরম-প্রেমময়ের কাছ থেকে। নীরস তরুকে নিঙড়ে আপনারা রস পাবেন না। তাকে রসায়িত হবার অবকাশ দিন। আপনাদের আনন্দের, মুক্তির রসের তৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠেছে জানি—তবু অপেক্ষা করতে হবে। আমি এই আনন্দের এই প্রেমের ভিক্ষা-পাত্র নিয়েই তাঁর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছি; যদি আমি না পাই আপনাদের কেউ পান—সেই পরম সুন্দরের নামে শপথ ক'রে বলছি—তা হলে আমি নিজে পেলে যে আনন্দ পেতাম তেমনি সমান আনন্দ পাব—সর্বাগ্রে আমি গিয়ে

তাঁর চরণ বন্দনা করব—সেবক হয়ে, দাস হয়ে তাঁর আজ্ঞাপালন করব। যদি আপনাদের তৃষিত নয়ন আমাকেই কেন্দ্র ক'রে সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা ক'রে আছে বলেন, তা হলে আশীর্বাদ করুন যে, আমার অর্ধ-জাগ্রতা আনন্দময়ী শক্তি যেন আবার সমাধিমগ্না না হন, আবার যেন তাঁর সুন্দর নয়নের প্রসাদ পাই, তাঁর প্রেমের প্রবাহকূলে আবার যেন জ্ঞানে, শক্তিতে, আনন্দে নিত্য-পূর্ণ হয়ে নৃত্য করতে পারি।

যদি আর বাঁশী না বাজে—আমি কবি বলে বলছিনে—আমি আপনাদের ভালবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি—আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন—আমায় ভুলে' যাবেন। বিশ্বাস করুন, আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি—আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম—সে প্রেম পেলাম না ব'লে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম!

হিন্দু-মুসলমানে দিন রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ বিগ্রহ, মানুষের জীবনে এক দিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব অন্য দিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা পাষাণ-স্তূপের মত জমা হয়ে আছে—এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে, সঙ্গীতে, কর্মজীবনে অভেদ-সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম—অসুন্দরকে ক্ষমা করতে, অসুরকে সংহার করতে এসেছিলাম—আপনারা সাক্ষী আর সাক্ষী আমার পরম সুন্দর। আমি যশ চাই না, খ্যাতি চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না, নেতৃত্ব চাই না—তবু আপনারা আদর ক'রে যখন নেতৃত্বের আসনে বসান, তখন অশ্রু সম্বরণ করতে পারি না। তাঁর আদেশ পাইনি, তবু রুদ্র-সুন্দর-রূপে আবার আপনাদের নিয়ে এই অসুন্দর, এই কুৎসিত

অসুরদের সংহার করতে ইচ্ছা করে। যদি আপনাদের প্রেমের প্রবল টানে আমাকে আমার একাকীত্বের পরম শূন্য থেকে অসময়েই নামতে হয়—তা হলে সেদিন আমায় মনে করবেন না আমি সেই নজরুল। সে নজরুল অনেক দিন আগে মৃত্যুর খিড়কি দুয়ার দিয়ে পালিয়ে গেছে। সেদিন আমাকে কেবল মুসলমান বলে' দেখবেন না—আমি যদি আসি, আসব হিন্দু-মুসলমানের সকল জাতির উর্ধ্বে যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ তাঁরই দাস হয়ে। আপনাদের আনন্দের জুবিলী উৎসব আজ যে পরম বিরহীর ছায়াপাতে বর্ষা-সজল রাতের মত অন্ধকার হয়ে এল, আমার সেই বিরহ-সুন্দর প্রিয়তমকে ক্ষমা করবেন, আমায় ক্ষমা করবেন - মনে করবেন—পূর্ণত্বের তৃষ্ণা নিয়ে যে একটি অশান্ত তরুণ এই ধরায় এসেছিল, অপূর্ণতার বেদনায় তারই বিগত-আত্মা যেন স্বপ্নে আপনাদের মাঝে কেঁদে গেল।

সাহিত্য ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। আমি সাহিত্যে কি করেছি, তার পরিচয় আমার ব্যক্তিত্বের ভিতর। পদ্ম যেমন সূর্যের ধ্যান করে, তারই জন্য তার দল মেলে আমিও আমার ধ্যানের প্রিয়তমের দিকে চেয়েই গড়ে উঠেছি। আমি কোন বাধা-বন্ধন স্বীকার করিনি, বিস্মৃত দিনের স্মৃতি আমার পথ ভুলায়নি, আমি আমার বেগে পথ কেটে চলেছি।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির সাথে আমার যোগাযোগ বহু দিনের। কয়েকজন বন্ধুর আহ্বানে আমি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির আড্ডায় আশ্রয় নিই। এখানে আমি বন্ধুরূপে পাই মিঃ মুজফ্‌ফর আহমদ, মিঃ আবুলকালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ সাহিত্যিক বন্ধুগণকে। আমাদের তখনকার আড্‌ডা ছিল সত্যিকার জীবন্ত মানুষের আড্‌ডা। আমরা এই তথা-কথিত য়্যারিষ্টোক্রাট্ বা 'আডষ্ট-কাক' ছিলাম না। বোমারু

বারীন-দা এসে একদিন আমাদের আড্ডা দেখে বলেছিলেন—হ্যাঁ, আড্ডা বটে! আজকালের তরুণেরা যে নীড় সৃষ্টি ক'রে বসে আছে, আমরা তা করিনি; আমরা করেছিলাম জীবনকে উপভোগ।

যাক, সেদিন যদি সাহিত্য-সমিতি আমাকে আশ্রয় না দিত, তবে হয়ত কোথায় আমি ভেসে যেতাম, তা আমি জানি না। এই ভালবাসার বন্ধনেই আমি প্রথম নীড় বেঁধেছিলাম; এ আশ্রয় না পেলে আমার কবি হওয়া সম্ভব হ'ত কি না, আমার জানা নেই।

সাহিত্য-সমিতিকে বাঁচিয়ে রাখতে, একে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে বিশেষভাবে অর্থ সাহায্যে পুষ্ট ক'রে তুলতে সকলকে আবেদন জানাচ্ছি। সাহিত্য-সমিতি বিত্তশালী হ'লে বহু তরুণ প্রতিভাকে আশ্রয় দিতে পারবে, তাদের প্রতিভা বিকাশের সহায়তা করতে পারবে।

চিঠিপত্র

১.

(বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির মুখপত্র ত্রৈমাসিক 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র শ্রাবণ, ১৩২৬, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যায় নজরুল ইসলামের 'মুক্তি' শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন মৌলবী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এম-এ. বি. এল. এবং কবি মোহম্মদ মোজাম্মেল হক বি. এ.। প্রকাশক ছিলেন জনাব মুজফ্ফর আহম্মদ। যতদূর জানা যায়, নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি'। এই কবিতাটি কিছুদিন পরে মাসিক 'সহচর' পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত কবিতা 'কবিতা-সমাধি'—১৩২৬ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়। 'মুক্তি' প্রকাশের পর 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'র সম্পাদককে এই পত্রখানি লিখিত হয়।)

From :

QAZI NAZRUL ISLAM

Battalion Quartermaster Havilder

49th Bengalis.

Dated, Cantonment, Karachi,

The 19th August, 1919.

আদাব হাজার হাজার জানবেন !

বা'দ আরজ, আমার নগণ্য লেখাটি আপনাদের সাহিত্য-পত্রিকায় স্থান পেয়েছে, এতে কৃতজ্ঞ হওয়ার চেয়ে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি বেশী। আমার সব চেয়ে বেশী ভয় হয়েছিল, পাছে বেচারী লেখা 'কোরকে'র কোঠায় পড়ে। অবশ্য যদিও আমি 'কোরক' ব্যতীত প্রস্ফুটিত ফুল নাই, আর যদিই সে-রকম হয়ে থাকি কারুর চক্ষে, তবে সে বে-মালুম ধুতরো ফুল। যা হোক, আমি তার জন্যে আপনার নিকট যে কত বেশী কৃতজ্ঞ, তা প্রকাশ করবার ভাষা পাচ্ছিনে। আপনার এরূপ উৎসাহ বরাবর থাকলে আমি যে একটি মস্ত জবর কবি ও লেখক হব, তা হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিব, এ একেবারে নির্ঘাৎ সত্যি কথা।

কারণ, এবারে পাঠালুম একটি লম্বা চওড়া 'গাথা' আর একটি 'প্রায় দীর্ঘ' গল্প আপনাদের পরবর্তী সংখ্যা কাগজে ছাপাবার জন্যে, যদিও কার্তিক মাস এখনও অনেক দূরে। আগে থেকেই পাঠালুম, কেননা, এখন হতে এটা ভাল করে পড়ে রাখবেন এবং চাইকি আগে হতে ছাপিয়েও রাখতে পারেন। তা ছাড়া আর একটি কথা। শেষে হয়ত ভাল ভাল লেখা জমে আমার লেখাকে বিলকুল 'রদ্দি' করে দেবে আর তখন হয়ত এত বেশী লেখা না পড়তেও পারেন। কারণ আমি বিশেষরূপে জানি, সম্পাদক বেচারাদের গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠতে হয় এই নতুন কাব্যি-রোগাক্রান্ত ছোকরাদের দৌরাত্মিতে। যাক, অনেক বাজে কথা বলা গেল। আপনার সময়টাকেও খামকা টুটি চেপে রেখেছিলুম। এখন বাকি কথা ক'টি মেহেরবাণী করে শুনুন।

যদি কোন লেখা পছন্দ না হয়, তবে ছিঁড়ে না ফেলে এ গরীবকে জানালেই আমি ওর নিরাপদে প্রত্যাগমনের পাথেয় পাঠিয়ে দেব। কারণ, সৈনিকের বড্ড কষ্টের জীবন। আর তার চেয়ে হাজার গুণ পরিশ্রম ক'রে একটু আধটু লেখি। আর কারুর কাছে ও একেবারে worthless হলেও আমার নিজের কাছে ওর দাম ভয়ানক! আর ওটা বোধহয় সব লেখকের পক্ষেই স্বাভাবিক। আপনার পছন্দ হ'ল কি না, জানাবার জন্যে আমার নাম ঠিকানা লেখা একখানা Stamped খামও দেওয়া গেল এর সঙ্গে। পড়ে মত জানাবেন।

আর যদি এত বেশী লেখা ছাপাবার মত জায়গা না থাকে আপনার কাগজে, তা হলে যে কোন একটা লেখা 'সওগাতে'র সম্পাদককে Handover করলে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হব। 'সওগাতে' লেখা দিচ্ছি দু'একটা ক'রে। যা ভাল বুঝেন জানাবেন।

গল্পটি সম্বন্ধে আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য বা বক্তব্য থাকলে জানালেই আমি ধন্যবাদের সহিত তৎক্ষণাৎ তার উত্তর দিব কারণ, এখনও অনেক সময় রয়েছে।

আমাদের এখানে সময়ের money-value ; সুতরাং লেখা সর্বাঙ্গসুন্দর হতেই পারে না। Undisturebed time মোটেই পাই না। আমি কোন কিছুরই কপি বা duplicate রাখতে পারি না। সেটি সম্পূর্ণ অসম্ভব।

By the by, আপনারা 'ক্ষমা' বাদ দিয়ে কবিতাটির 'মুক্তি' নাম দিয়েছেন, তাতে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। এই রকম দোষগুলি সংশোধন ক'রে নেবেন। বড্ডো ছাপার ভুল থাকে, একটু সাবধান হওয়া যায় না কি ? আমি ভাল, আপনাদের কুশল সংবাদ দিবেন। নিবেদন ইতি—

খাদেম
নজরুল ইসলাম

২.

(পত্রখানি কুমিল্লার কান্দিরপাড থেকে জনাব আফজালুল হ'কের নিকট লিখিত চিঠিতে আফজাল সাহেবকে কবি 'ডাবজল' বলে সম্বোধন করেছেন এতে উভয়ের মধ্যকার প্রীতির সম্পর্কটুকু সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। চিঠিতে যে আরবী ছন্দের উল্লেখ আছে—আরবী ছন্দানুসারে লিখিত উক্ত কবিতাগুচ্ছ ১৩২৮ সালের চৈত্র সংখ্যা "প্রবাসী-"তে প্রকাশিত হয়। "মায়ের স্নেহ' বলতে কবি শ্রীমতী বিরজাসুন্দরী দেবীর অপার স্নেহের কথা স্মরণ করেছেন। বাংলা মাসের উল্লেখ থাকলেও সনের উল্লেখ নেই। পোষ্ট অফিসের শীল মোহর থেকে বোঝা যায় চিঠিখানি ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চে লিখিত।)

Kandirpar
Comilla,
'15th Chaitra'

ভাই ডাবজল !

'মোসলেম ভারত' কি ডিগবাজি খেল নাকি ? খবর কি ? 'ব্যথার দান' কেমন কাটছে ? কত কাটল ? অন্যান্য কাগজে সমালোচনা বা

বিজ্ঞাপন বেরোলো না কেন ? 'সার্ভেণ্ট' আর 'মোহাম্মদীর' সমালোচনা এবং 'বিজলী' ও 'বাংলার কথা'য় বিজ্ঞাপন দেখেছি মাত্র। 'আরবী'ছন্দ দেখেছেন ? কে কি বল্লে ? আপনার মুমূর্ষু অবস্থা দেখেই ওটা প্রবাসীতে দিয়েছি। তার জন্য দুঃখিত হয়েছেন নাকি ? আর সব খবর কি ? মোসলেম ভারতের অবস্থা জানবার জন্য বড্ড উদ্বিগ্ন। এতদিন চট্টগ্রাম বা অন্য কোথাও যেতে পারিনি, তার কারণ এবাড়িতে অন্ততঃ দু'জন করে অনবরত শয্যাগত রোগশয্যায়। এখন আবার বসন্ত হ'য়েছে মেয়েদের। এসব ছেড়ে যেতে পারিনি। তা' ছাড়া মায়ের স্নেহ আর নিজের আলস্য উদাস্য তো আছেই। চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে আসবেন নাকি ? আমি যাব নিশ্চয়ই দেখতে। দুই কাজই হবে। নিজের শরীরও ভাল নয়। মনের অশান্তির আগুন দাবানলের মতো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠ্‌ছে। অবশ্য 'আমি নিজেই নিজের ব্যথা করি সৃজন !' হ্যাঁ আমায় আজই কুড়িটি টাকা টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডার করে পাঠাবেন। kindly 'বড্‌তো বিপদে পড়েছি। কারুর কাছে আমি যাই-ই হই, আপনার কাছে আমি হয়তো ভালতে মন্দ'তে মিশে তেমনি আছি। এই অসময়ে আমার আর কেউ নেই দেখে আপনারই স্মরণ নিলুম। আশা করি বঞ্চিত হবনা, তা' আপনি যত কেন দুর্দশাগ্রস্ত হোন না কেন। টাকা চাই-ই চাই ভাই। নইলে যেতে পারব না। অনেক কষ্ট দিলুম—আরও দেব। 'ব্যথার দান' মোট নয় খানা পেয়েছি মাত্র আরও খান পনেবো আমার দরকার। যাক্ টাকা পাঠাবেনই যা করে হোক্।

আমার লেখাটা তা' হ'লে 'উপাসনায়' দিয়ে দেবেন যদি মোঃ ভাঃ না বেরোয়।

চির স্নেহানুবন্ধ

নজরুল

৩.

(এই পত্রখানি জনাব মাহ্ফুজুর রহমান খানকে লিখিত। পত্রে প্রাপকের নাম ও ঠিকানা লেখা আছে: "শ্রীমান মহফুজুর P. O. কুড়িগ্রাম Dt. Rangpur।" পত্রে উল্লেখিত 'প্রাণতোষ' হচ্ছেন হুগলী জেলায় প্রতাপপুরের শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়; ১৩৬২ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ "কাজী নজরুল নামে" তাঁর লেখা একখানি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।)

স্নেহভাজনেষু—

মহফুজ! অনেক দিন তোমার খবর পাইনি। আমিও বাড়ী থাকি না—এখান ওখান ঘুরছি। কা'ল ফিরেছি বাঁকুড়া থেকে। মাঝে মাঝে প্রাণতোষের কাছে খবর পাই তোমার। সেও দেখা দিচ্ছে না কয়দিন থেকে। এখন কোথায় আছ, পাশ করেছ কিনা—এবং কোথায়, কি পড়বে পাশ করলে—তা জানিয়ো অবশ্য। বইয়ের টাকা আদায় হয়ে থাক্লে পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবে। বড্ডো দরকার পড়েছে টাকার। আদায় না হয়ে থাকলে আদায় করবে পত্রপাঠ। বই বিক্রি না হলে ফেরৎ পাঠাবে—বই-এর বড্ডো দরকার। সকল ছেলেদের স্নেহাশীষ দিও। ইতি—

শুভার্থী—

P. S. পত্রোত্তর শীগ্গীর। নজরুল

৪.

(মাহফুজুর রহমানকে লিখিত।)

হুগলী

২০শে জুলাই, ১৯২৫

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেলুম। তুমি পাশ করেছ জেনে খুশী হলুম। কলেজেই পড় এখন। তুমি বোধ হয় রংপুরের ইদরিশ ও ইলিয়াশকে

চেন। যদি না চেন, তোমাদের প্রফেসর সাতকড়ি মিত্র (আমার বড়দা)-কে জিজ্ঞেস করো—তিনি বলে' দেবেন। ওদের সঙ্গে পরিচয় করো। তোমার আনন্দ হবে। ওরা বড্‌ডো ভালো ছেলে! ইদরিশের সঙ্গে দেখা হলে বলো—কতকগুলি বই ছিল ওদের কাছে (ওর এবং আজিজ বলে একটি ছেলের কাছে)—তার কী হলো? আজিজের সঙ্গেও আলাপ করো। রংপুরে সব চেয়ে দেখবার জিনিষ হচ্ছে বড়দা (সাতকড়ি মিত্র)। এতদিন নিশ্চয় আলাপ হয়েচে তোমার। তাঁকে এবং বৌদিকে (ওখানে থাকলে) আমার প্রণাম দিও। ইদরিশ, ইলিয়াশ, আজিজ প্রভৃতি সব ছেলেদের এবং তোমাকে আমার স্নেহাশীষ। আমি বড় ব্যস্ত। বীরভূম যাচ্ছি ৪।৫ দিনের জন্য। ইতি—

শুভার্থী—

নজরুল

৫.

(বর্ধমানের 'শক্তি' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবলাই দেবশর্ম্মাকে লিখিত।)

হুগলী

৩১শে শ্রাবণ, ১৩৩২

শ্রীচরণেষু,

বলাইদা! আবার তুমি 'শক্তি'র হাল ধরে ভয়ের সাগরে পাড়ি দিলে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলাম। 'ধূমকেতু'তে চড়ে আমার আর একবার বাঙলার পিলে চমকে দেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু গোবর মন্ত (সরকার) সাহেব পেছনে ভীষণ লেগেছে। কোন ক্রমেই একে উঠতে দেবে না। তাই 'বার বাড়ী তের খামার যে বাড়ী যাই সেই বাড়ীই আমার' নীতির অনুসরণ ক'রে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাংলার আবহাওয়া বড্ড বেশী ভেপসে উঠেছে এবং তাতে অনেক না-দেখা জীবের উদ্ভব হয়েছে। এখন একজন শক্ত বেটাছেলের দরকার—যে

কোদাল হাতে এগুলোকে সাফ করবে। লাভ-লোভকে এড়িয়ে চলার অসমসাহসিকতা নিয়ে তবে এতে নামতে হবে। যাক্, তুমি যখন নেমেছ, তখন কিছু একটা হবে বলে জোর আশা করছি। দেখ দাদা, তুমিও শেষে ভেস্তে যেয়ো না। এ ধূমকেতু-ল্যাজাও পেছনে রইল; নুড়ো জ্বালাবার আগুনের জন্য যখনি দরকার হবে চেয়ে পাঠিও। আর একটি কথা দাদা, মহাত্মা হবার লোভ করো না।........ ইতি—

তোমার স্নেহধন্য

নজরুল

৬.

(মাসিক 'কালিকলম' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক শ্রীমুরলীধর বসুকে লিখিত এই পত্রে উল্লেখিত 'নলিনীদা,' 'নৃপেন,' 'শৈলজা,' 'প্রেমেন' ও 'অচিন্ত্য' হচ্ছেন যথাক্রমে শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।)

হুগলী,

২৫ নভেম্বর, '২৫

প্রিয় মুরলীদা!

আজ তোমার চিঠি পেয়ে জ্বর-জ্বর মনটা বেশ একটু ঝরঝরে হয়ে উঠল। দুটো কথাতেই তোমার যে প্রীতি উপচে পড়েছে, তা আমার হৃদয়-দেশ পর্যন্ত গড়িয়ে এসেচে। দিন ছয়েক থেকে ১০৩,৪,৫ ডিগ্রি ক'রে জ্বরে ভুগে আজ একটু অ-জ্বর হয়ে বসেছি। পঞ্চাশ গ্রেণ কুইনাইন মস্তিষ্কে ঊনপঞ্চাশ বায়ুর ভিড় জমিয়েছে। আমার একটা মাথাই এখন হয়ে উঠেছে দশমুণ্ড রাবণের মত ভারী, হাত দুটো নিসপিস্ করছে —সেই সঙ্গে যদি বিশটা হাতও হয়ে উঠত! তা' হলে আগে দেবতাগুষ্টির নিকুচি ক'রে আমাদের ভাঙা ঘরে সত্যিকারের চাঁদের আলো আসে কি না দেখিয়ে দিতাম। মুশ্কিল হয়েছে মুরলীদা,

আমরা কুম্ভকর্ণ হতে পারি বিভীষণ হতে পারি—হতে পারিনে শুধু রাবণ। দেবতা হবার লোভ আমার কোনও দিনই নেই—আমি হতে চাই তাজা রক্ত-মাংসের শক্ত হাড্‌ডিওয়ালা দানব—অসুর! দেখেছ কুইনাইনের গুণ!....

যাক্, এখন ভাবছি শৈলজার মাটির ঘর তুলি কি ক'রে? মাথা ত একেবারে তুর্‌-র্‌-র-ভোঁ!....'লাঙলে'র ফাল আমার হাতে—'লাঙলে'র শুধু বা কাঠেরটাই বেরোয় প্রথমবার। শুধু একটা "কৃষাণের গান" দিয়েছি। নলিনীদাও নাকি চিদানন্দকে স্মরণ করেছেন—জ্বরে চিৎ। আফিসটা বোধ হয় চিৎপুরে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অফিসের দোরে একটা আস্ত লাঙল টাঙিয়ে দিতে বলেছি। ঐ হবে সাইন বোর্ড। বেশ হবে, না? যাক্, শৈলজাকে বলো একটা কিছু করবই।

তোমাদের এক দিন আসতে হবে কিন্তু এখানে। Sincerely-র বাঙলা যা হয়—তাই করে বলছি। ....'দোলন চাঁপা' পেয়েছ নৃপেনের কাছ থেকে? তোমাদের সবাইকে দিয়েছি তার হাতে।....

হ্যাঁ, তোমাকে লিখতে হবে কিন্তু 'লাঙলে'। প্রথম বারেই দিতে হবে। সকলে মিলে কাঁধ দেওয়া যাক্।....শৈলজা, প্রেমেন, অচিন্ত্যকে তাড়া দিও লেখার জন্য। ....আর জায়গা নেই........

—নজরুল

৭.

(আন্‌ওয়ার হোসেনকে লিখিত।)

হুগলী,

২৩শে অগ্রহায়ণ (১৩৩২)

আমার প্রীতি ও সালাম নিন!

আপনার চিঠি....পেয়েছি। সময়-মত উত্তর দিতে পারিনি। তার কারণ, আমার অনবসরের আর অন্ত নেই। তজ্জন্য আমি

বড় লজ্জিত আছি ভাই—ক্ষমা করবেন। আপনি এত ভাল বাংলা লিখতে পারেন; আপনার আইডিয়া, ভাব, ভাষা এত স্বচ্ছ ও সুন্দর যে, আপনার সাথে কাগজে অনেক আগেই পরিচয় হওয়া উচিত ছিল। অথচ আপনি আপনাকে গোপন রেখেছেন—আর যত বাজে পুঁথি-পড়া লেখকরাই আজ মুসলমান সমাজের শ্রেষ্ঠ লেখক! ....আপনার চিঠি পড়ে এত আনন্দ লাভ করেছি যে, অনেককে পড়ে শুনিয়েছি। মুসলমান সমাজ আমাকে আঘাতের পর আঘাত দিয়েছে নির্মমভাবে। তবু আমি দুঃখ করিনি বা নিরাশ হইনি। তার কারণ, বাংলার অশিক্ষিত মুসলমানরা গোঁড়া এবং শিক্ষিত মুসলমানরা ঈর্ষাপরায়ণ। এ আমি একটুও বানিয়ে বলছিনে। মুসলমান সমাজ কেবলই ভুল করেছে—আমার কবিতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিত্বকে অর্থাৎ নজরুল ইসলামকে জড়িয়ে। আমি মুসলমান—কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের, সকল কালের এবং সকল জাতির। কবিকে হিন্দু-কবি, মুসলমান-কবি ইত্যাদি বলে বিচার করিতে গিয়েই এত ভুলের সৃষ্টি!

আমি আপাততঃ শুধু এইটুকুই বলে রাখি যে, আমি শরিয়তের বাণী বলিনি—আমি কবিতা লিখেছি। ধর্মের বা শাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে কবিতাকে মাপতে গেলে ভীষণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। ধর্মের কড়াকড়ির মধ্যে কবি বা কবিতা বাঁচেও না, জন্মও লাভ করতে পারে না। তার প্রমাণ—আরব দেশ। ইসলাম ধর্মের কড়াকড়ির পর থেকে আর সেথা কবি জন্মাল না। এটা সত্য।........

—নজরুল ইসলাম

৮.

(১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারী তারিখে ময়মনসিংহ শহরে ময়মনসিংহ জেলা কৃষক-শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়; সেই উপলক্ষে কবি কৃষ্ণনগর

থেকে পত্রখানি লেখেন; শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার তা সম্মেলনে পাঠ করেন।)

আমার প্রিয় ময়মনসিংহের প্রজা ও শ্রমিক ভ্রাতৃবৃন্দ!

আপনারা আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন! আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, আপনাদের এই নব-জাগরিত প্রাণের স্পর্শে নিজেকে পবিত্র করিয়া লইব, ধন্য হইব। কিন্তু দৈব প্রতিকূল আমার সে আশা পূর্ণ হইল না। আমার শরীর আজও রীতিমত দুর্বল, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার মত শক্তি আমার একবারেই নাই। আশা করি, আমার এই অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতা সকলে ক্ষমা করিবেন।

এই ময়মনসিংহ আমার কাছে নূতন নহে। এই ময়মনসিংহ জেলার কাছে আমি অশেষ ঋণে ঋণী। আমার বাল্যকালের অনেকগুলি দিন ইহারই বুকে কাটিয়া গিয়াছে। এইখানে থাকিয়া আমি কিছুদিন লেখাপড়া করিয়া গিয়াছি। আজও আমার মনে সেই সব প্রিয় স্মৃতি উজ্জ্বল ভাস্বর হইয়া জ্বলিতেছে। বড় আশা করিয়াছিলাম, আমার সেই শৈশব-চেনা ভূমির পবিত্র মাটি মাথায় লইয়া ধন্য হইব, উদার-হৃদয় ময়মনসিংহ জেলাবাসীর প্রাণের পরশমণির স্পর্শে আমার লৌহ-প্রাণকে কাঞ্চনময় করিয়া তুলিব। কিন্তু তাহা হইল না,—দুরদৃষ্ট আমার। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ দিন দেন, আমার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাই, তাহা হইলে আপনাদের গফরগাঁওয়ের নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া ও আপনাদের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইব।

আপনারাই দেশের দেনপ্রমণ, আশা, দেশের ভবিষ্যৎ। মাটির মায়ায় আপনাদেরই হৃদয় কানায় কানায় ভরপুর। মাটির খাঁটি ছেলে আপনারাই রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টির জলে ভিজিয়া দিন নাই রাত নাই—সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আপনারাই ত এই মাটির পৃথিবীকে প্রিয় সন্তানের মত লালন পালন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। আপনাদের

মাঠের এক কোদাল মাটি লইলে আপনারা আততায়ীর হয় শির লন, কিম্বা তাকে শির দেন,—এত ভালবাসায় ভেজা যাদের মাটি, এত বুকের খুনে উর্বর শস্যশ্যামল মাঠ,—আপনারা, আমার কৃষাণ ভাইরা ছাড়া তাহার অন্য অধিকারী কেহ নাই। আমার এই কৃষাণ ভাইদের ডাকে বর্ষার আকাশ ভরিয়া বাদল নামে, তাদের বুকের স্নেহধারার মতই মাঠ-ঘাট পানিতে বন্যায় সয়লাব হইয়া যায় আমার এই কৃষাণ ভাইদের আদর-সোহাগে মাঠঘাট ফুলে-ফলে-ফসলে শ্যাম-সবুজ হইয়া ওঠে, আমার কৃষাণ ভাইদের বধূদের প্রার্থনায় কাঁচাধান সোনার রঙে রাঙিয়া ওঠে। এই মাঠকে জিজ্ঞাসা কর মাঠে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে,—এ মাঠ চাষার, এর ফুল-ফল কৃষক-বধূর।

আর আমার শ্রমিক ভাইরা, যাহারা আপনাদের বিন্দু বিন্দু রক্ত দান করিয়া হুজুরদের অট্টালিকা লালে লাল করিয়া তুলিতেছে, যাহাদের অস্থি-মজ্জা ছাচে ঢালিয়া রৌপ্য মুদ্রা তৈরী হইতেছে, যাহাদের চোখের জল সাগরে পড়িয়া মুক্তা-মাণিক ফলাইতেছে,—তাহারা আজ অবহেলিত, নিষ্পেষিত, বুভুক্ষু। তাহাদের শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, ক্ষুধায় পেট পুরিয়া আহার পায় না, পরণে বস্ত্র নাই।

হায় রে স্বার্থ! হায় রে লোভী দানব-প্রকৃতির মানব! আজ কৃষাণের দুঃখে শ্রমিকের কাৎরাণীতে আল্লার আরশ কাঁপিয়া উঠিয়াছে! দিন আসিয়াছে, বহু যন্ত্রণা পাইয়াছ ভাই—এইবার তাহার প্রতীকারের ফেরেশতা, দেবতা আসিতেছেন। তোমাদের লাঙল, তোমাদের শাবল তাঁহার অস্ত্র, তোমাদের কুটিরে তাঁহার গৃহ! তোমাদের ছিন্ন মলিন বস্ত্র তাঁহার পতাকা, তোমারাই তাঁহার পিতামাতা। আমি আপনাদের মাঝে সেই অনাগত মহাপুরুষের শুভ আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আপনাদের নব-জাগরণকে সালাম করিয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি, এই বুঝি নব-দিনমণির উদয় হইল! ইতি—

—নজরুল ইসলাম

৯.

(হুগলী বাবুগঞ্জের শ্রীশচীন করকে লিখিত)

কৃষ্ণনগর

১০-২-২৬

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের শচীন! তোর কোন চিঠিও পাইনি, এলিও না। এলে খুব খুশী হতুম। আমার সব কথা প্রাণতোষের কাছে শুনবি।

মার্চ্চে গীম্পাগি আস্‌বে—অবশ্য আসিস্। তুই নাকি খুব ভাল কবিতা লিখেছিস আরও কতকগুলো। 'আসবার সময় সবগুলো নিয়ে আসিস্। ভুলিস্‌নে যেন।

যে জোঁয়ালে গর্দান দিয়েছিস্, সেটার প্রতি যেন আসক্তি না জন্মো তোর—এই আমার বড় আশীষ। আমাদের সকলের স্নেহাশীষ নে। ইতি—

মঙ্গলাকাঙ্খী—

কাজীদা'

১০.

(আনওয়ার হোসেনকে লিখিত)

কৃষ্ণনগর,

১ লা মার্চ, ১৯২৬

ভাই!

........আমার স্বাস্থ্য ছিল অটুট,—জীবনে ডাক্তার দেখাইনি। এই আমার প্রথম অসুখ ভাই, বড্‌ড ভোগাচ্ছে। প্রায় সাত মাস ধরে

ভুগেছি জ্বরে। বড্ড জীবনীশক্তি কমে গেছে। বাইরে থেকে খুব দুর্বল হইনি। এতদিন সুস্থ হয়ত হয়ে উঠতাম, কিন্তু অবসর বা বিশ্রাম পাচ্ছিনে জীবনে কিছুতেই। এই শরীর নিয়েই আবার বেরুব ৬ই মার্চ দিনাজপুর। সেখান ডিষ্ট্রিক্ট কন্‌ফারেন্স, সেখানে থেকে মাদারিপুর Fishermen's Conference attend করতে যাব। ওখান থেকে খুব সম্ভব ঢাকা যাব। যদি যাই দেখা হবে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হচ্ছে স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য। এত দুর্বল আমি এখনো যে, ধৈর্য্য ধরে একটা চিঠি পর্য্যন্ত লিখতে পারিনে। আমাদের বাঙ্গালী মুসলমানের সমাজ, নামাজ পড়ার সমাজ। যত রকম পাপ আছে, করে যাও—তার জবাবদিহি করতে হয় না এ সমাজে,—কিন্তু নামাজ না পড়লে তার কৈফিয়ৎ তলব হয়। অথচ কোরানে ৯৯৯ জায়গায় জেহাদের কথা এবং ৩৩ জায়গায় সালাতের বা নামাজের কথা বলা হয়েছে।

আমার লেখার পূর্ব তেজ ইত্যাদির কথা,—আপনি কি আমার বর্তমান লেখাগুলো পড়েছেন? আমি জানি না—লেখা প্রাণহীন হচ্ছে কিনা। হলেও আমি দুঃখিত নই। আমি যার হাতের বাঁশী, সে যদি আর আমায় না বাজায় তাতে আমার অভিযোগ করবার কিছুই নেই। কিন্তু আমি মনে করি সত্যি আমায় তেমন 'করেই বাজাচ্ছে, তার হাতের বাঁশী ক'রে। আমার লেখার উদ্দামতা হয়ত কমে আস্‌ছে—তার কারণ আমার সুরের পরিবর্তন হয়েছে। আপনি কি আমার 'সাম্যবাদী' পড়েছেন? তা হলে বুঝবেন সব কথা। আপনার অভিযোগ আর যার হোক না কেন, সাহিত্যিকের নয়—রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ আমায় অধিকতর উৎসাহ দিচ্ছেন। তা ছাড়া, আমি আমার মনের কুঞ্জে আমার বংশীবাদকের বিদায়-পদধ্বনি আজও শুনতে পাইনি। তবে তার নবীনতর সুর শুনেছি। সেই সুরের আভাস আমার 'সাম্যবাদী'তে পাবেন। বাঙলা সাহিত্যে আমার স্থান সম্বন্ধে আমি কোনদিন চিন্তা

করিনি। এর জন্য লোভ নেই আমার। সময়ই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সমালোচক। যদি উপযুক্ত হই, একটা ছালা-টালা পাব হয়ত।........

—নজরুল ইসলাম

১১.

(শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত। মাসিক 'কালিকলম' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রীমুরলীধর বসু। নজরুলের সুপ্রসিদ্ধ কবিতা মাধবী-প্রলাপ ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের কালিকলমে প্রকাশিত হয়।)

কৃষ্ণনগর,

১০-৪-১৯২৬

প্রিয় শৈলজা!

কন্‌ফারেন্সের হিড়িকে মরবার অবসর নেই। কন্‌ফারেন্সের আর মাত্র এক মাস বাকী। হেমন্তদা আর আমি সব করছি এ যজ্ঞের। কাজেই লেখাটা শেষ করতে পারিনি এতদিন। রেগো না লক্ষ্মীটি। আমি তোমাদের লেখা দিতে না পেরে বড় লজ্জিত আছি। "মাধবী-প্রলাপ" পাঠালুম।

বৈশাখেই দিও। দরকার হলে অদল-বদল ক'রে নিও কথা—অবশ্য ছন্দ রক্ষা ক'রে। আমি এবার কলকাতায় গিয়েছিলুম—আল্লা....আর ভগবান........এর মারামারির দরুণ তোমার কাছে যেতে পারিনি। আমি ২।৩ দিন পরে শ্রীহট্ট যুবক সম্মিলনীতে যোগদান করতে যাচ্ছি। ওখান থেকে ফিরে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

আজ ডাকের সময় যায়, বেশী লিখব না।....মুরলীদা ও প্রেমেনকে ভালবাসা দিও। তোমরা নিও।

—নজরুল

১২.

(বেগম শামসুন্ নাহার মাহমুদকে লিখিত। ১৩৪৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বুলবুল'-পত্রিকায় 'চিঠি' শিরোনামে এইটি প্রকাশিত হয়েছিল; তার শেষে পাদটীকায় বলা হয়েছিল : "চিঠিখানি কবি নজরুল ইসলাম তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিতা কোন বালিকাকে কয়েক বৎসর আগে লিখেছিলেন।")

কৃষ্ণনগর
১১-৮-২৬
সকাল

স্নেহের নাহার,

কাল রাত্তিরে ফিরেছি কলকাতা হতে। চট্টগ্রাম হতে এসেই কলকাতা গেছলাম। এসেই পড়লাম তোমার দ্বিতীয় চিঠি—অবশ্য তোমার ভাবীকে লেখা। আমি যেদিন তোমার প্রথম চিঠি পাই, সেদিনই—তখনই কলকাতার যেতে হয়। মনে করেছিলাম কলকাতা গিয়ে উত্তর দেবো। কিন্তু কলকাতার কোলাহলের মধ্যে এমনই বিস্মৃত হয়েছিলাম নিজেকে যে কিছুতেই উত্তর দেবার অবসর ক'রে নিতে পারিনি। তা ছাড়া ভাই, তুমি অত কথা জানতে চেয়েছ, শুনতে চেয়েছ, যে কলকাতার হট্টগোলের মধ্যে সে বলা যেন কিছুতেই আসত না। আমার বাণী হট্টগোলকে এখন রীতিমত ভয় করে, মূক হয়ে যায় ভীরু বাণী আমার—ঐ কোলাহলের অনবকাশের মাঝে। চিঠি দিতে দেরি হ'ল বলে তুমি রাগ ক'রো না ভাই লক্ষ্মীটি। এবার হতে ঠিক সময়ে চিঠি দেবো, দেখে নিও। কেমন ? বাহারটাও না জানি কত রাগ করেছে, কী ভাবছে। আর তোমার তো কথাই নেই, ছেলেমানুষ তুমি, পড়তে না পেয়ে তুমি এখনো কাঁদ ! বাহার যেন একটু চাপা,

আর তুমি খুব অভিমানী, না? কী যে করেছ তোমরা দুটি ভাই-বোনে যে এসে অবধি মনে হচ্ছে যেন কোথায় কোন্ নিকটতম আত্মীয়কে আমি ছেড়ে এসেছি। মনে সদাসর্বদা একটা বেদনার উদ্বেগ লেগেই রয়েছে। অদ্ভুত রহস্যভরা এই মানুষের মন! রক্তের সম্বন্ধকে অস্বীকার করতে দ্বিধা নেই যার, সে-ই কখন পথের সম্বন্ধকে সকল হৃদয় দিয়ে অসঙ্কোচে স্বীকার ক'রে নেয়। ঘরের সম্বন্ধটা রক্তমাংসের, দেহের, কিন্তু পথের সম্বন্ধটা হৃদয়ের অন্তরতম-জনার। তাই ঘরের যারা, তাদের আমরা শ্রদ্ধা করি, মেনে চলি, কিন্তু বাইরের আমার-জনকে ভালবাসি, তাকে না-মানার দুঃখ দিই। ঘরের টান কর্তব্যের, বাইরের টান প্রীতির—মাধুর্যের। সকল মানুষের মনে সকল কালে এই বাঁধানহারা মানুষটি ঘরের আঙিনা পারিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছে। যে-নীড়ে জন্মেছে এই পলাতক, সেই নীড়কেই সে অস্বীকার করেছে সর্বপ্রথম উড়তে শিখেই! আকাশ আলো কানন ফুল, এমনি সব না-চেনা জনেরা হয়ে ওঠে তার অন্তরতম। বিশেষ ক'রে গানের পাখী যারা, তারা চিরকেলে নিরুদ্দেশ দেশের পথিক। কোকিল বাসা বাঁধে না, 'বৌ কথা কও'-এর বাসার উদ্দেশ আজও মিলিল না, 'উহু উহু চোখ গেল' পাখীর নীড়ের সন্ধান কেউ পেল না! ওদের আসা যাওয়া একটা রহস্যের মত। ওরা যেন স্বর্গের পাখী, ওদের যেন পা নেই, ধূলার পৃথিবীতে যেন ওরা বসবে না, ওরা যেন ভেসে আসা গান! তাই ওরা অজানা ব্যথার আনন্দে পাগল হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে দেশে বিদেশে, বসন্ত-আসা বনে, ফুল-ফোটা কাননে, গন্ধ-উদাস চমনে। ওরা যেন স্বর্গের প্রতিধ্বনি, টুকরো-আনন্দের উল্কাপিণ্ড! সমাজ এদের নিন্দা করেছে, নীতিবাগীশ বায়স তার কুৎসিত দেহ—ততোধিক কুৎসিত কণ্ঠ নিয়ে এর ঘোর প্রতিবাদ করেছে, এদের শিশুদের ঠুকরে 'নিকালো হিঁয়াসে' বলে তাড়িয়েছে, তবু আনন্দ দিয়েছে এই ঘর-না-মানা পতিতের দলই! নীড়-বাঁধা সামাজিক পাখীগুলো দিতে

পারল না আনন্দ, আনতে পারল না স্বর্গের আভাস, সুরলোকের গান........।

এত কথা বললাম কেন, জান? তোমাদের যে পেয়েছি এই আনন্দটাই আমায় এই কথা কওয়াচ্ছে, গান গাওয়াচ্ছে। বাইরের পাওয়া নয়, অন্তরের পাওয়া। গানের পাখী গান গায় খাবার পেয়ে নয়; ফুল পেয়ে, আলো পেয়ে সে গান গেয়ে ওঠে। মুকুল-আসা কুসুম-ফোটা বসন্তই পাখীকে গান গাওয়ায়, ফল-পাকা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় নয়। তখনো পাখী হয়তো গায়, কিন্তু ফুল যে সে ফুটতে দেখেছিল, গন্ধ সে তার পেয়েছিল—গায় সে সেই আনন্দে; ফল পাকার লোলুপতায় নয়। ফুল ফুটলে পায় গান, কিন্তু ফল পাকলে পায় ক্ষিদে; আমি পরিচয় করার অনন্ত ঔৎসুক্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি মানুষের মাঝে, কিন্তু ফুল-ফোটা মন মেলে না ভাই, মেলে শুধু ফল পাকার ক্ষুধাতুর মন। তোমাদের মধ্যে সেই ফুল-ফোটানো বসন্ত, গান-জাগানো আলো দেখেছি বলেই আমার এত আনন্দ, এত প্রকাশের ব্যাকুলতা। তোমাদের সাথে পরিচয় আমার কোন প্রকার স্বার্থের নয়, কোন দাবীর নয়। ঢিল মেরে ফল পাড়ার অভ্যেস আমার ছেলেবেলায় ছিল, যখন ছিলাম ডাকাত এখন আর নেই। ফুল যদি কোথাও ফোটে, আলো যদি কোথাও হাসে, সেখানে আমার গান গাওয়ায় পায়, গান গাই। সেই আলো, সেই ফুল পেয়ে ছিলাম এবার চটুলায়, তাই গেয়েছি গান। ওর মাঝে শিশিরের করুণা যেটুকু সেটুকু আমার, আর কারুর নয়। যাক, কাজের কথাগুলো ব'লে নিই আগে।

আমায় এখনও ধরেনি, তার প্রমাণ এই চিঠি। তবে আমি ধরা দেওয়ার দিকে হয়তো এগোচ্ছি। ধরা পড়া আর ধরা দেওয়া এক নয়, তা' হয়তো বোঝ। ধরা দিতে চাচ্ছি, নিজেই এগিয়ে চলেছি শত্রু-শিবিরের দিকে, এর রহস্য হয়তো বলতে পারি। এখন বলব না। এত বিপুল যে সমুদ্র, তারও জোয়ার-ভাটা আসে অহোরাত্রি। এই

জোয়ার-ভাটা সমুদ্রেই খেলে, আর তার কাছাকাছি নদীতে, বাঁধ-বাঁধা ডোবায়, পুকুরে জোয়ার ভাটা খেলে না। মানুষের মন সমুদ্রের চেয়েও বিপুলতর। খেলবে না তাতে জোয়ার-ভাটা? যদি না খেলে, তবে তা' মানুষের মন নয় ঐ শান-বাঁধানো ঘাট-ভরা পুকুরগুলোতে কাপড় কাচা চলে, ইচ্ছে হলে গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরাও চলে, চলে না ওতে জাহাজ, দোলে না ওতে তরঙ্গ দোলা, খেলে না ওতে জোয়ার-ভাটা....আমি একবার অন্তরের পানে ফিরে চলতে চাই, যেখানে আমার গোপন সৃষ্টি-কুঞ্জ, যেখানে আমার অনন্ত দিনের বধূ আমার জন্য বসে বসে মালা গাঁথছে। যেমন ক'রে সিন্ধু চলে ভাটিয়ালী টানে, তেমনি ক'রে ফিরে যেতে চাই গান-শ্রান্ত ওড়া-ক্লান্ত আমি। আবার অকাজের কথা এসে পড়ল। পুষ্প-পাগল বনে কাজের কথা আসে না, গানের ব্যথাই আসে, আমায় দোষ দিও না।

'অগ্নিবীণা' বেঁধে দিতে দেরি করছে দফতরী, বাঁধা হলেই অন্যান্য বই ও 'অগ্নিবীণা' পাঠিয়ে দেবো এক সাথে। ডি. এম. লাইব্রেরীকে বলে রেখেছি। আর দিন দশেকের মধ্যেই হয়তো বই পাবে। আমার পাহাড়ে ও ঝর্ণাতলে তোলা ফটো একখানা ক'রে পাঠিয়ে দিও। গ্রুপের ফটো একখানা (যা'তে হেমন্তবাবু ও ছেলেরা আছে), আমি বাহার ও অন্যকে একটি ছেলেকে নিয়ে তোলা যে ফটো তার একখানা এবং আমি ও বাহার দাঁড়িয়ে তোলা ফটোর একখানা—পাঠিয়ে দিও আমায়। ফটোর সব দাম আমার বই বিক্রির টাকা হতে কেটে নিও।

এখন আবার কোন্‌দিকে উড়ব, ঠিক নেই কিছু। যদি না ধরে, কোথাও হয়তো যাব, গেলে জানাব। এখন তোমার চিঠিটার উত্তর দিই। তোমার চিঠির উত্তর তোমার ভাবীই দিয়েছে শুনলাম। আরও শুনলাম, সে নাকি আমার নামে কতগুলো কী সব লিখেছে তোমার কাছে। তোমার ভাবীর কথা বিশ্বাস ক'রো না। মেয়েরা চিৎকাল

তাদের স্বামীদের নির্বোধ মনে ক'রে এসেছে। তাদের ভুল, তাদের দুর্বলতা ধরতে পারা এবং সকলকে জানানোই যেন মেয়েদের সাধনা। তুমি কিন্তু নাহার, রেগো না যেন। তুমি এখনও ওদের দলে ভিড়নি। মেয়েরা বড্ড অল্প বয়সে বড্ড বেশী প্রভুত্ব করতে ভালবাসে। তাই দেখি, বিয়ে হবার এক বছর পর ষোল সতের বছর বয়সেই মেয়েরা হয়ে ওঠেন গিন্নি। তারা যেন কাজে অকাজে কারণে অকারণে স্বামী বেচারীকে বকতে পারলে বেঁচে যায়। তাই সদাসর্বদা বেচারা পুরুষের পেছনে তারা লেগে থাকে গোয়েন্দা পুলিসের মত। এই দেখ, না ভাই, ছটাক খানেক কালি ঢেলে ফেলেছি চিঠি লিখতে লিখতে একটা বই-এর ওপর, এর জন্য তোমার ভাবীর কী তম্বিহ্, কী বকুনি। তোমার ভাবী বলে নয়, সব মেয়েই অমনি। স্ত্রীদের কাছে স্বামীরা হয়ে থাকেন একেবারে বেচারাম লাহিড়ী!

একটা কথা আগেই বলে রাখি, তোমার কাছে চিঠি লিখতে কোন সঙ্কোচের আড়াল রাখিনি। তুমি বালিকা, এবং বোন বলে তার দরকার মনে করিনি। যদি দরকার মনে কর, আমায় মনে করিয়ে দিও। আমি এমন মনে ক'রে চিঠি লিখিনি যে, কোন পুরুষ কোন মেয়েকে চিঠি লিখেছে। কবি লিখছে চিঠি তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিতা কাউকে, এই মনে ক'রেই চিঠিটা নিও। চিঠি লেখার কোথাও কোন ত্রুটি দেখলে দেখিয়ে দিও।

আমার 'উচিত আদর' করতে পারিনি লিখেছ, আর তার কারণ দিয়েছ, পুরুষ নেই কেউ বাড়ীতে এবং অসচ্ছলতা। কথাগুলোয় সৌজন্য প্রকাশ করছে খুব বেশী, কিন্তু ওগুলো তোমাদের অন্তরের কথা নয়। কারণ, তোমরাই সবচেয়ে বেশী ক'রে জান যে তোমরা যা আদর যত্ন করেছ আমার, তার বেশী করতে কেউ পারে না। তোমরা তো আমার কোথাও ফাঁক রাখনি শূন্যতা নিয়ে অনুযোগ করবার। তোমরা আমার মাঝে অভাবের অবকাশ তো দাওনি তোমাদের অভাবের

কথা ভাববার ; এ আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আমি সহজেই সহজ হতে পারি সকলের কাছে, ওটা আমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ; কিন্তু তোমাদের কাছে যতটা সহজ হয়েছি—অতটা সহজ বুঝি আর কোথাও হইনি। সত্যি নাহার, আমায় তোমরা আদর-যত্ন করতে পারনি বলে যদি সত্যই কোন সঙ্কোচের কাঁটা থাকে তোমাদের মনে, তবে তা' অসঙ্কোচে তুলে ফেলবে মন থেকে। অতটা হিসেব-নিকেশ করবার অবকাশ আমার মনে নেই, আমি থাকি আপনার মন নিয়ে আপনি বিভোর। মানুষের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে বলতেও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি, খেই হারিয়ে ফেলি কথার। আমার গোপনতম কে যেন একেবারে নিশ্চুপ হয়ে থাকতে আদেশ করে। আর আর্থিক অসচ্ছলতার কথা লিখছ। অর্থ দিয়ে মাড়োয়ারীকে, জমিদার মহাজনকে বা ভিখিরীকে হয়তো খুশীকরা যায়, কবিকে খুশী করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের "পুরস্কার" কবিতাটা পড়েছ ? ওতে এই কথাই আছে।—কবি রাজ-দরবারে গিয়ে রাজাকে মুগ্ধ ক'রে রাজপ্রদত্ত মণি-মাণিক্যের বদলে চাইলে রাজার গলার মালাখানি। কবি লক্ষ্মীর প্যাঁচার আরাধনা কোন কালে করেনি, সরস্বতীর শতদলেরই আরাধনা করেছে—তাঁর পদ্মগন্ধে বিভোর হয়ে শুধু গুন্‌গুন্ ক'রে গান করেছে আর করেছে। লক্ষ্মীর ঝাঁপির কড়ি দিয়ে কবিকে অভিবন্দনা করলে কবি তাতে অখুশী হয়ে ওঠে। কবিকে খুশী করতে হলে দিতে হয় অমূল্য ফুলের সওগাত। সে সওগাত তোমরা দিয়েছ আমার অঞ্জলি পুরে'। কবি চায় না দান, কবি চায় অঞ্জলি, কবি চায় প্রীতি, কবি চায় পূজা। কবিত্ব আর দেবত্ব এইখানে এক। কবিতা আর দেবতা—সুন্দরের প্রকাশ। সুন্দরকে স্বীকার করতে হয় সুন্দর যা' তাই দিয়ে। রূপার দাম আছে বলেই রূপা অত হীন ; হাটে-বাজারে মুদীর কাছে, বেনের কাছে ওজন হতে হতে ওর প্রাণান্ত ঘটল ; রূপের দাম নেই বলেই রূপ এত দুর্মূল্য, রূপ এত সুন্দর, এত পূজার ! রূপা কিনতে হয় রূপেয়া দিয়ে, রূপ কিনতে হয় হৃদয়

দিয়ে। রূপের হাটের বেচা-কেনা অদ্ভুত। যে যত অমনি—যে যত বিনা দামে কিনে নিতে পারে, সে তত বড় রূপ-রসিক সেখানে। কবিকে সম্মান দিতে পারনি বলে মনে যদি ক'রেই থাক, তবে তা' মুছে ফেলো। কোকিল পাপিয়াকে বাড়ীতে ডেকে ঘটা ক'রে খাওয়াতে পারনি বলে তারা তো অনুযোগ করেনি কোনদিন। সে-কথা ভাবেও নি কোনদিন তারা। তারা তাই বলে তোমার বাতায়নের পাশে গান গাওয়া বন্ধ করেনি। তা ছাড়া কবিকে হয়তো সম্মান করা যায় না—কাব্যকে সম্মান করা যায়। তুমি হয়তো বলবে, গাছের যত্ন না নিলে ফুল দেয় না। কিন্তু সে যত্নেরও তো ত্রুটি হচ্ছে না। অনাত্মীয়কে লোকে সম্বর্ধনা করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে; বন্ধুকে গ্রহণ করে হাসি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে।

উপদেশ আমি তোমায় দিইনি। যদি দিয়ে থাকি, ভুলে যেয়ো। উপদেশ দেওয়ার চাণক্য আমি নই। দিয়েছি তোমার অনাগত বিপুল সম্ভাবনাকে অঞ্জলি—তোমার মাঝের অপ্রকাশ সুন্দরকে প্রকাশ-আলোতে আসার আহ্বান জানিয়েছি শঙ্খধ্বনি ক'রে। উপদেশের ঢিল ছুঁড়ে তোমার মনের বনের পাখীকে উড়িয়ে দেবার নির্মমতা আমার নেই, এ তুমি ধ্রুব জেনো। আমি ফুল-ঝরা দিয়ে হাসাই, শাখার মার দিয়ে কাঁদাই নে।

তোমায় লিখতে বলেচি, আজও বলছি লিখতে। বললেই যে লেখা আসে, তা নয়। কারুর বলা যদি আনন্দ দেয়, তবে সেই আনন্দের বেগে সৃষ্টি হয়তো সম্ভব হয়ে ওঠে। আমরা তোমায় বলেছ লিখতে। সে-বলা আমায় আনন্দ দিয়েছে, তাই সৃষ্টির বেদনাও জেগেছে অন্তরে। তোমাদের আলোর পরশে, শিশিরে ছোঁওয়ায় আমার মনের কুঁড়ি বিকচ হয়ে উঠেছে। তাই চট্টগ্রামে লিখেছি। নইলে তোমরা বললেই লেখা আসত না। তোমার মনের সুন্দর যিনি, তিনি যদি খুশী হয়ে ওঠেন, তা হলে সেই খুশীই তোমায় লিখতে বসাবে। আমার বলা তোমার সেই মনের সুন্দরকে অঞ্জলি দেওয়া। বলেছি, অঞ্জলি দিয়েছি। তিনি

খুশী হয়ে উঠেছেন কিনা, তুমি জান। তুমি আজও অনেকখানি বালিকা। তারুণ্যের যে আনন্দ, যে ব্যথা সৃষ্টি জাগায়, সেই উচ্ছ্বাস, সেই আনন্দ, সেই ব্যথা তোমার জীবনে আসার এখনো অনেক দেরি। তাই সৃষ্টি তোমার আজও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল না। তার জন্য অপেক্ষা করবার ধৈর্য অর্জন ক'রো। তরুর শাখায় আঘাত করলে সে ফুল দেবে না, যখন দেবে সে আপনি দেবে। আমাদের দেশের মেয়েরা বড় হতভাগিনী। কত মেয়েকে দেখলাম কত প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে, কিন্তু সব সম্ভাবনা তাদের শুকিয়ে গেল সমাজের প্রয়োজনের দাবীতে। ঘরেব প্রয়োজন তাদের বন্দিনী ক'রে রেখেছে। এত বিপুল বাহির যাদের চায, তাদের ঘিরে রেখেছে বারো হাত লম্বা আট হাত চওড়া দেওয়াল। বাহিরের আঘাত এ দেওয়ালে বারে বারে প্রতিহত হযে ফিরল। এব বুঝি ভাঙ্গন নেই অন্তর হতে মার না খেলে। তাই নারীদের বিদ্রোহিনী হতে বলি। তারা ভেতর হতে দ্বার চেপে ধরে বলছে আমরা বন্দিনী। দ্বার খোলার দুঃসাহসিকা আজ কোথায়? তাকেই চাইছেন যুগদেবতা। দ্বার ভাঙ্গার পুরুষতার নারীদের প্রয়োজন নেই, কারণ তাদের দ্বার ভিতর হতে বন্ধ, বাহির হতে নয়। তোমারও যে কী হবে তা বলতে পারিনে। তার কারণ তোমায় চিনলেই তো চলবে না, তোমায় চালাবার দাবী নিয়ে জন্মেছেন যাঁরা তাঁদের আজও চিনিনি। আমার কেন যেন মনে হ'ল, বাহার তোমার অভিভাবক নয়। ভুল যদি না ক'রে থাকি, তা' হলেই মঙ্গল। অভিভাবক যিনিই হ'ন তোমার, তিনি যেন বিংশ শতাব্দীর আলোর ছোঁয়া পাননি ব'লেই মনে হ'ল। তোমায় যে আজ কাঁদতে হয় বসে বসে কলেজে পড়তে যাবার জন্য, এও হয়তো সেই কারণেই। মিসেস্ আর্, এস্. হোসেনের মত অভিভাবিকা পাওয়া অতি বড় ভাগ্যের কথা। তাঁকেও যখন তাঁরা স্বীকার ক'রে নিতে পারলেন না, তখন তোমার কী হবে পড়াব, তা আমি ভাবতে পারি নে। তোমার আর বাহারের ওপর আমার দাবী আছে—স্নেহ করার দাবী,

ভালবাসার দাবী, কিন্তু তোমার অভিভাবকদের ওপর তো আমার দাবী নেই। তবুও ওপর-পড়া হয়ে অনেক বলছি এবং তা' হয়তো তোমার আম্মা নানী সাহেবা শুনেওছেন। বিরক্তও হযেছেন হয়তো। আলোর মত শিশিরের মত আমি তোমার অন্তরের দলগুলি খুলিয়ে দিতে পারি হযতো, দ্বারের অর্গল খুলি কি করে? তুমি আমার সামনে আসতে পারনি বলে আমার কোনরূপ কিছু মনে হয়নি। তার কারণ, আমি তোমাকে দেখেছি এবং দেখতে চাই লেখার মধ্য দিয়ে। সেই হ'ল সত্যিকার দেখা। মানুষ দেখার কৌতূহল আমার নেই, স্রষ্টা দেখার সাধনা আমার। সুন্দরকে দেখার তপস্যা আমার। তোমার প্রকাশ দেখতে চাই আমি, তোমায় দেখতে চাইনে। সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টাকে যে দেখেছে, সেই বড় দেখা দেখেছে। এই দেখা আর্টিস্টের দেখা, ধেয়ানীর দেখা তপস্বীর দেখা। আমার সাধনা অরূপের সাধনা। সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারের যে রাজকুমারী বন্দিনী, সেই রূপ-কথার অরূপাকে মায়া নিদ্রা হতে জাগাবার দুঃসাহসী রাজ-কুমার আমি। আমি সোনার কাঠির সন্ধান জানি—যে সোনার কাঠির ছোঁয়ায় বন্দিনী উঠবে জেগে, রূপার কাঠীর মায়ানিদ্রা যাবে টুটে, আসবে তার আনন্দের মুক্তি। যে চোখের জল বুকের তলায় আটকে আছে, তাকে মুক্তি দেওয়ার ব্যথা-হানা আমি। মানস সরোবরে বদ্ধ জলধারাকে শুভ শঙ্খধ্বনি ক'রে নিয়ে চলেছি কবি আমি ভাগীরথের মত। আমার পনের আনা রয়েছে স্বপ্নে বিভোর সৃষ্টির ব্যথায় ডগমগ, আর এক আনা করছে পলিটিক্স, দিচ্ছে বক্তৃতা, গড়ছে সংঘ। নদীর জল চলেছে সমুদ্রের সাথে মিলতে, দু'ধারে গ্রাম সৃষ্টি করতে নয়। যেটুকু জল তার ব্যয় হচ্ছে দু'ধারের গ্রামবাসীদের জন্য, তা' তার এক আনা। বাকী পনের আনা গিয়ে পড়ছে সমুদ্রে। আমার পনের আনা চলেছে আর চলেছে সৃষ্টি-দিন হতে আমার সুন্দরের উদ্দেশে। আমার যত বলা আমার সেই বিপুলতরকে নিয়ে, আমার সেই প্রিয়তম, সেই সুন্দরতমকে

নিয়ে। তোমাকেও বলি, তোমার তপস্যা যেন তোমার সুন্দরকে নিয়েই থাকে মগ্ন। তোমার চলা, তোমার বলা যেন হয় তোমার সুন্দরের উদ্দেশে, তাহলে তোমায় প্রয়োজনের বাঁধ দিয়ে কেউ বাঁধতে পারবে না। তোমার অন্তরতমকে ধ্যান কর তোমার বলা দিয়ে। বাধা যেন তোমার ভিতর দিক থেকে জমা না হয়ে ওঠে। এক কাজ করতে পার, নাহার? তোমার সকল কথা আমায় খুলে বলতে পার? কী তোমার ব্রত, কী তোমার সাধনা—এই কথা। আমার কাছে সঙ্কোচ ক'রো না। আমি তাহলে তোমার গতির উদ্দেশ পাব, আর সেই রকম ক'রে তোমায় গ'ড়ে উঠবার ইশারা দিতে পারব। আমি অনেক পথ চলেছি, পথের ইঙ্গিত হয়তো দিতে পারব। তাই বলে আমি পথ চালাব, এ ভয় ক'রো না।

বড় বড় কবির কাব্য পড়া এই জন্য দরকার যে তাতে কল্পনার জট খুলে যায়, চিন্তার বদ্ধ ধারা মুক্তি পায়। মনের মাঝে প্রকাশ করতে না পারার যে উদ্বেগ, তা' সহজ হয়ে ওঠে। মাটির মাঝে যে পত্র-পুষ্পের সম্ভাবনা, তা' বর্ষণের অপেক্ষা রাখে। নইলে তার সৃষ্টির বেদনা মনের মাঝেই গুমরে মরে।

আমার কাছে দামী কথা শুনতে চেয়েছ। দামী কথার জুয়েলার আমি নই। আমি ফুলের বেসাতি করি। কবি বাণীর কমল-বনের বনমালী। সে মালা গাঁথে, সে মণি-মাণিক্য বিক্রি করে না। কবি কথাকে দামী করতে পারে না, সুন্দর করতে পারে। 'বৌ কথা কও' যে কথা কয়, কোকিল যে কথা কয় তার এক কানাকড়ি দাম নেই। ওরা দামী কথা বলতে জানে না। ওদের কথা শুধু গান। তাই বুদ্ধিমান লোক তোতা পাখী পোষে, ময়না পাখী পোষে, ওরা ওদের রোজ 'রাধা কেষ্ট' বুলি শোনায়। আমরা যা বলি, তার মানেও নেই, দামও নেই। তোমায় বুদ্ধিমান লোকের দলের জানিনে বলে এত বকে যাচ্ছি। শুনতে যদি ভাল না লাগে জানিয়ো, সাবধান হব।

আমার জীবনের ছোট-খাট কথা জানতেচেয়েছ। বড় মুশকিল, কথা, ভাই। আমার জীবনের যে বেদনা, যে রং, তা' আমার লেখায় পাবে। অবশ্য লেখার ঘটনা-গুলো আমার জীবনের নয়, লেখার রহস্যটুকু আমার, ওর বেদনাটুকু আমার ঐখানেই তো আমায় সত্যিকার জীবনী লেখা রয়ে গেল। জীবনের ঘটনা দিয়ে কৌতুক অনুভব করতে পার। কিন্তু তা দিয়ে আমাকে চিনতে পারবে না। সূর্যের কিরণ আসলে সাতটা রঙ—রামধনুতে যে রং প্রতিফলিত হয়। কিন্তু সূর্য যখন ঘোরে, তখন তাকে দেখি আমরা শুভ্র জ্যোতির্ময়রূপে। সূর্যের চলাটা প্রতারণা করে আমাদের চোখকে—তার বুকের রং দেখতে দেয় না সে। কিন্তু ইন্দ্রধনু যখন দেখি, ওতেই দেখতে পাই ওর গোপন প্রাণের রং। ইন্দ্রধনু যেন সূর্যের লেখা-কাব্য। মানুষের জীবনই মানুষকে সবচেয়ে বেশী প্রতারণা করে। রাধা ভালবেসেছিল কৃষ্ণকে নয়, কৃষ্ণের বাঁশীকে। তোমরাও ঠিক ভালবাস আমাকে নয়—আমার সুরকে, আমার কাব্যকে। সে তো তোমাদের সামনেই রয়েছে। আবার আমায় নিয়ে কেন টানাটানি, ভাই? সূর্যের কিরণ আলো দেয়, কিন্তু সূর্য নিজে হচ্ছে দগ্ধ দিবানিশি। ওর কাছে যেতে যে চায়, সেও হয় দগ্ধীভূত। আলো সওয়া যায়, শিখা সওয়া যায় না। আমি জ্বলছি শিখার মত, আপনার আনন্দে আপনি জ্বলছি, কাছে এলে তা' দেয় দাহ, দূর হতে দেয় আলো। তোমাদের কাছে ছিলাম যে-আমি সেই-আমি কি এক? তোমরা কবিকে জানতে চাও, না নজরুল ইস্‌লামকে জানতে চাও, তা' আগে জানিয়ো; তা' হলে আমি এর পরের চিঠিতে একটু একটু ক'রে জানাব তার কথা। চাঁদ জোছনা দেয়, কথা কয় না। বহু চকোর-চকোরীর সাধ্যসাধনাতেও না। ফুল মধু দেয়, গন্ধ দেয়, কথা কয় না। বহু ভ্রমরার সাধ্যসাধনাতেও না। বাঁশী কাঁদে যখন গুণীর মুখে তার চুমোচুমি হয়; বাকী সময়টুকু সে এক কোণে নির্বাক, নিশ্চুপ হয়ে পড়ে থাকে। একই ঝাড়ের বাঁশ, ভাগ্যদোষে বা গুণে

কেউ হয়ে উঠে লাঠি, কেউ হয় বাঁশী। বীণা কত কাঁদে, কথা কয় গুণীর কোলে শুয়ে, বাকী সময়টুকু তার খোলের মধ্যে আপনাকে হারিয়ে সে নিস্পন্দিত হয়ে থাকে। গানের পাখী, তাকে গানের কথাই জিজ্ঞাসা কর, নীড়ের কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না। নিজেই বলতে পারবে না সে, কোথায় ছিল তার নীড়। জন্ম নিয়ে গান শিখে উড়ে যাবার পর নীড়টার মত অপ্রয়োজনীয় জিনিস আর তার কাছে নেই নীড়ের পাখী তখন বনের পাখী হয়ে ওঠে। গুরুদেব বলেছেন, ফসল কেটে নেবার পর মাঠটার মত অপ্রয়োজনীয় জিনিস আর নেই। তবু সেই অপ্রয়োজনের যদি প্রয়োজন অনুভব করে তোমাদের কৌতুক, তবে জানিয়ো।

চিঠি লিখছি আর গাচ্ছি একটা নতুন লেখা গানের দুটো চরণ—

"হে ক্ষণিকের অতিথি, এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া।
কোন্ অমরার বিরহিণীরে চাহনি ফিরে,
কার বিষাদের শিশির-নীরে এলে নাহিয়া।"

কবির আসা ঐ ঝরা শেফালির পথ বেয়ে আসা। কার বিষাদের শিশির জলে নেয়ে আসে, তা' সে জানে না। তার নিজের কাছেই সে একটা বিপুল রহস্য।

আমার লেখা কবিতাগুলো চেয়েছে। হাসি পাচ্ছে খুব কিন্তু। কী ছেলেমানুষ তোমরা দুটি ভাই বোন। যে-খন্তা দিয়ে মাটি খোঁড়ে মালি, সেটারও যে দরকার পড়ে ফুলবিলাসীর, এ আমার জানা ছিল না। যে পাতার কোলে ফুল ফোটে, সে-পাতা কেউ চায় না, এই আমি জানতাম। মালা গাঁথা হবার পর ফুল-রাখা পদ্ম-পাতাটার কোন দরকার থাকে, এও একটা খুব মজার কথা, না? যাক্, চেয়েছ—দেবো। তবে এ পল্লব শুকিয়ে উঠবে দুদিন পরে, থাকবে যা তা' ফুলের গন্ধ। তা ছাড়া, অত

কবিতাই বা লিখব কোত্থেকে যে খাতা ভর্তি ক'রে দেবো। বসন্ত তো সব সময় আসে না। শাখার রিক্ততাকে যে ধিক্কার দেয়, সে অসহিষ্ণু; ফুল ফোটার জন্যে অপেক্ষা করতে জানে যে, সে-ই ফুল পায়। যে অসহিষ্ণু চলে যায়, সে তো পায় না ফুল, তার ডালা চিরশূন্য রয়ে যায়। তোমাদের ছায়া-ঢাকা, পাখী ডাকা দেশ, তোমাদের সিন্ধু পর্বত গিরিদরীবন আমায় গান গাইয়েছিল। তোমাদের গান গাইয়েছিল। তোমাদের গান শোনার আকাঙ্খা আমায় গান গাইয়েছিল। রূপের দেশ ছাড়িয়ে এসেছি এখন রূপেয়ার দেশে, এখানে কি গান জাগে? বীণাপাণির রূপের কমল এখানকার বাস্তবতার কঠোর ছোঁয়ায় রূপার কমল হয়ে উঠেছে। কমলবনের বীণাপাণি ঢুকেছেন এখানের মাড়োয়ারী মহলে। ছাড়া যেদিন পাবেন, আসবেন তিনি আমার হৃদ্‌কমলে' সেদিনের জন্য অপেক্ষা কর ছাড়া উপায় নেই আমার।

আমার কবিতার উৎস মুখের সন্ধান চেয়েছ। তার সন্ধান যতটুকু জানি নিজে দেখিয়ে দেবো।

আর কিছু লিখবার অবসর নেই আজ। মানস-কমলের গন্ধ পাচ্ছি যেন, কেমন যেন নেশা করেছে, বোধ হয় বীণাপাণি তার চরণ রেখেছেন এসে আমার অন্তর শতদলে। এখন চললাম ভাই। চিঠি দিও শিগ্‌গীর। আমার আশিস্ নাও। ইতি—

তোমার

'নূরুদা'

পুঃ—

তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়ে এসেছি, সে সব ভুলে যেও। তোমার আম্মা ও নানী সাহেবার পাক কদমানে হাজার হাজার আদাব জানাবে

আমার। শামসুদ্দিন ও অন্যান্য ছেলেদের স্নেহাশিস্ জানাবে। তুমি কি বই পড়লে এর মধ্যে বা পড়ছ, কি কি লিখলে, সব জানাবে। তোমার লেখাগুলো আমায় আজই পাঠিয়ে দেবে। চিঠি দিতে দেরি ক'রো না। 'কালিকমল' পেয়েছ বোধ হয়। তোমায় পাঠানো হয়েছে। তোমার লেখা চায় তারা।

—'নূরুদা'

১৩.

(খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীনকে লিখিত। কার্ডখানিতে ৯-১০-২৬ তারিখ লেখা; কিন্তু ডাক-বিভাগের সিল দু'টিতে আছে "Krishnanagar. 9 Sep; 26" ও "Calcutta G. P. O. 10 Sep; 26"। যে 'খোকা'র কথা উল্লেখ করা, হয়েছে, সে কবির দ্বিতীয় পুত্র 'বুলবুল'।)

কৃষ্ণনগর,
৯-১০-২৬

স্নেহভাজনেষু,

মঈন! আজ সকালে আমাদের একটি খোকা এসেছে। তোর ভাবী ভাল আছে। খোকা বেশ মোটা-তাজা হয়েছে। নাসিরুদ্দীন সাহেবকে খবরটা দিস্। চট্টগ্রাম থেকে কোনো কবিতা পেয়েছিস কি আমার? "সর্বসহা" দিবি ত 'সওগাতে'? নতুন লেখা শীগ্গীরই দেবো। আমি যশোর-খুলনা ঘুরে' আজ ফিরছি।—এইবার গিয়ে শামসুদ্দীন সাহেবকে বইগুলো পাঠিয়ে দেবো। কা'ল কিম্বা পরশু যাব কলকতা। ৩৭ নম্বরে খবর নিস একবার। ভালোবাসা ও স্নেহাশীষ নে। ইতি—

কাজী ভাই

১৪.

(শ্রীব্রজবিহারী বর্মনকে লিখিত)

কৃষ্ণনগর

৯-১০-২৬

পরম স্নেহভাজনেষু—

স্নেহের ব্রজ ! আজ সকাল ছয়টায় আমার একটি পুত্র-সন্তান হ'য়েছে। তোমার বৌদি আপাততঃ ভাল আছে। আমিও আজ সকালে ফিরে এলাম যশোহব, খুলনা, বাগেরহাট, দৌলতপুর প্রভৃতি ঘুরে। টাকার বড্ড দরকার। যেমন ক'বে পার পঁচিশটি টাকা আজই টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডার ক'রে পাঠাও। তুমি ত সব অবস্থা জান। বলেও এসেছি তোমায়। কেবল 'সঞ্চিতা'র প্রুফ পেলাম— 'সর্বহারা'র শেষ প্রুফ কই ? "সর্ব্বহারা" কখন বেরুবে ? যেদিন বেরুবে অন্তত ৫০ কপি আমায় পাঠিযে দেবে।

ভুলো না যেন। টাকা কর্জ্জ ক'বেও পাঠাও। স্নেহাশীষ নাও। পত্র দিও। ইতি—

তো'মার

কাজীদা

১৫.

(পত্রটি শ্রীমরলীধর বসুকে লিখিত। নজরুলের 'দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু দুস্তর পারাবার' গানটি এবং ঐ গানের কবিকৃত স্বরপিলি প্রথম বর্ষের আশ্বিন সংখ্যা 'কালিকলমে' প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যায় তাঁর 'অনামিকা' কবিতাও

ছিল। প্রথম বর্ষের ভাদ্র সংখ্যা 'কালিকলমে' লেখ্রাজ সামন্ত ছদ্মনামে শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'শুঁটকি ও ফুপী' গল্পটি লেখেন।)

কৃষ্ণনগর

৯-১০-২৬

প্রিয় মুরালীদা!

আজ সকালে ৬টায় একটি "পুত্ররত্ন" প্রসব করেছেন শ্রীমতী গিন্নি। ছেলটা খুব 'হেল্‌দি' হয়েছে। শ্রীমতীও ভাল। আমি উপস্থিত ছিলাম না। হয়ে যাবার পর এলাম খুলনা হ'তে। খুলনা, যশোহর, বাগেরহাট, দৌলতপুর, বনগ্রাম প্রভৃতি ঘুরে ফিরলাম আজ। শৈলজা কী করছে? প্রেমেন কোথায়?.... চিঠি দিও। কবিতাটার ও স্বরলিপিটার প্রুফ পাঠিও, যদি সম্ভব হয়!....

"শুঁটকি ও ফুপী" অদ্ভুত—অপূর্ব গল্প হয়েছে।

—নজরুল

১৬.

(শ্রীব্রজবিহারী বর্মনকে লিখিত)

কৃষ্ণনগর

২০-১২-২৬

স্নেহের ব্রজ!

আজও আমি শয্যাগত। বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি রোগের ও অন্যান্য চিন্তার জ্বালায়। চিন্তার মধ্যে অর্থ-চিন্তাটাই সব চেয়ে বড়। কী করে যে দিন যাচ্ছে আল্লাহ্ জানেন। তোমার প্রেরিত পনর টাকা পেয়েছি। পঁচিশ টাকা চেয়েছিলুম। অবশ্য, তোমারও বিপদ-আপদের কথা শুনলাম।

আরও যদি পাঠাতে পার আমার এই দুর্দিনে, বড় উপকৃত হ'ব। তুমি ছোট ভাইয়ের মত, তোমাকে বেশী কি লিখব। তোমার অন্যান্য খবর দিও। "সর্ব্বহারা" কাটছে কেমন ?

তোমার

'কাজীদা'

১৭.

(শ্রীমুরলীধর বসুকে লিখিত।)

কৃষ্ণনগর

২৬-১২-২৬

মুরলীদা !

তোমার চিঠি যখন পাই, তখন আমি বিছানা-সই হয়ে পড়ে আছি। তাই উত্তর দিতে পারি নি। প্রায় মাসখানেক ধরে জ্বরে ভুগে আজ দিন চারেক হ'ল ভাল আছি। তুমি একা পড়েছ 'কালিকলম' নিয়ে। শৈলজা ভুগছে আজও—শুনলাম।

আমি এবার এত দুর্বল হয়ে পড়েছি এবং চারিদিক দিয়ে এত বিব্রত হয়ে পড়েছি যে, এবার বুঝি সামলানো দায় হবে এই ভেবেছিলুম প্রথমে। অবশ্য সাম্‌লে যে উঠেছি তা-ও নয়। নিত্য-অভাবের চিত্ত-ক্ষোভ আমায় আরো দুর্বল করে তুলছে। এখনও বাড়ী ছেড়ে বেরোবার সাধ্য নেই।—তোমার এ-সময় সময় নেই, তবু একটা কাজ দিচ্ছি। আমি শুয়ে শুয়ে কয়েকটা গান লিখেছি উর্দু গজলের সুরে। তার কয়েকটা "সাওগাতে" দিয়েছি। দুটো তোমার কাছে পাঠাচ্ছি—"বঙ্গবাণী"তে দিয়ে আমায় তাড়াতাড়ি কিছু নিয়ে দেবার জন্য। অন্য সব জায়গায় দশ টাকা ক'রে দেয় আমার প্রত্যেকটা কবিতার জন্য,

এ-কথা ওদের বলো। গান দুটি পেয়েই যদি ওরা টাকাটা দেয় তা'হলে আমার খুব উপকারে লাগে।—আমাদের আর মান-ইজ্জত রইল না, মুরলীদা,—না? অর্থাভাব বুঝি মনুষ্যত্বটাকে কেড়ে নেয় শেষে!

তোমাদের কালিকলমের জন্য মাঘ পর্যন্ত ত রয়েছে, তারপর আবার লেখা দেবো, অন্ততঃ দুটো গজল পাঠিয়ে দেবো। এখন যদি চাও ত লিখো।

হ্যাঁ, "বঙ্গবাণী"তে জিজ্ঞাসা করো, ওঁরা যদি স্বরলিপি চান তা হলে গজল দুটোর স্বরলিপি করে পাঠাতে পারি ২।১ দিনের মধ্যেই। 'বঙ্গবাণী'র সঙ্গে বন্দোবস্ত করে দাও না মুরলীদা—ওঁরা প্রতি মাসে কিছু করে দেবেন, আমিও সেই অনুসারে লেখা দেবো প্রতি মাসে। কি হয়, লিখে জানিও।....

আমাদের বাড়ীর আর সকলে ভাল। দেখলে, কেবল নিজের কথাই এক কাহন করলুম। প্রেমেনের ঠিকানাটা দিও।....

—নজরুল

১৮.

(শ্রীমুরলীধর বসুকে লিখিত।)

কৃষ্ণনগর
২-১-২৭

মুরলীদা!

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম।....এখন সন্ধ্যা। আজ সকালে শৈলজার চিঠি পেয়েছি—চিঠি ত নয়, বুক-চাপা কান্না। দুই বাল্য বন্ধু যৌবনের মাঝ-দরিয়ায় এসে পরস্পরের ভরাডুবি দেখছি। কারুর কিছু করবার শক্তি নেই!.... যত ভাঙ্গা তরীর ভিড় এক জায়গায়!....

আমার সম্বন্ধে আমার চেয়ে তুমি বেশী চিন্তিত, কাজেই আমার কোনো চিন্তা নেই, যা' করবার তুমি ক'রো। বসে শুয়ে লিখবার কসরৎ করি, আর ভাবি, কূল-কিনারা নেই সে ভাবার।....

আমার জ্বর আসে কিস্তিবন্দী হারে। দ্বিতীয় কিস্তির সময় কখন আসে—কে জানে। আজ 'কালিকলম' পেলুম। এত ভাল কাগজ ব'লেই এর অবস্থা এত মন্দ।....

—নজরুল

১৯.

(শ্রীশচীন কর-কে লিখিত)

কৃষ্ণনগর
৩-১-২৭

স্নেহভাজনেষু—

স্নেহের হাবুল! তুই এবার এলিনে, আসলে বড় খুশী হতুম। তোকে দেখবার ইচ্ছা ছিল, দেখিনি অনেক দিন তোদের; কিন্তু তোর চেয়েও তোর মাঝে যে কবি শিশুটি দিনের দিন বড় হ'য়ে উঠছে তাকে দেখবার বেশী ইচ্ছা ছিল। একদিন তাকে দেখবই, তখন হয়ত সে রীতিমত ঘোড়াদৌড় করছে দেখব। কিন্তু মানুষের ঘোড়দৌড় দেখার চেয়ে শিশুর হাঁটি-হাঁটি পা-পা দেখতে অধিক ভাল লাগে। প্রাণতোষকে দেখলাম, তার মনের কবি বোধ হয় তোর অগ্রজ। তার কবিশিশু এখন বেশ চল্‌তে শিখেছে, আগে পা পিছ্‌লাত, এখন পা শক্ত হয়েছে। চলার মিল ছিল না আগে, এখন দুইটা চরণই বেশ মিলে মিশে চলেছে।—ওর দুঃখের দিন ঘনিয়ে এল ব'লে। অর্থাৎ ও কবি ব'লে পরিচিত হ'ল ব'লে। কবি হওয়ার মত দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে আর নেই। ব'লেই এ-কথা বল্‌লুম। এদেশে কবির কবিতার

সব শব্দগুলো পাট্‌কেল হ'য়ে ফিরে আসে আর তা আঘাত করে তার বুকে। অবশ্য সব ক'বিই যে "ইট" লেখে, এবং তা পাট্‌কেল হ'য়ে ফিরে আসে, তা নয় যারা ফুল ফোটায় তাদের মাথাই সবচেয়ে অ-নিরাপদ।....

তোদের একটি "মুশাযেরা'র বৈঠক বসে তোর অল্পপরিসর কামরাটিতে—শুনলুম। বড় খুশী হ'য়েছি শুনে। তোদের আরম্ভ এম্‌নি ক'রেই হোক। বিপুল জগৎকে জানবার আকাঙ্খা শিশুর দুরন্ত চলায় গোপন থাকে। পা যখন হবে শক্ত তখন সে আপনি টেনে নিয়ে যাবে শিশুকে বিরাট বিস্ময়ের অন্তরে। তোদের কাপের চায়ের রসটুকু প্রাণের চুঁয়ানরসে মদির হ'য়ে ওঠে যে, একি কম সৌভাগ্যের কথা? আরম্ভের এই আনন্দ মাঝখানে গিযে তিক্ত হ'য়ে ওঠে, ঈর্ষায় বিস্বাদ হ'য়ে ওঠে,—এ আমরা অনুভব করছি—যারা মাঝখানে এসে পৌঁছেচি। আমাদের আরম্ভের আনন্দ তোদের চেয়ে কম ছিল না। অন্ততঃ দুরন্তপনা কম ছিল না। ফুল ফোটাবার আনন্দ যদি বিশ্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয় তা হ'লে তার পরিণত ট্র্যাজিডিতে। আনন্দ-লোকে দ্বন্দ্ব নেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। এ যারা ভোলে, তারা চা'লের গুদাম খুলুক গিয়ে—ফুলের বেসাতি না ক'রে। তোদের চলা আজো শুরু হয় নাই, আজো তোদের ফোটার আনন্দ কুঁড়ির প্রাকারে গুমরে মরছে—তাই এই সাবধান ক'রে দেওয়া। উপদেশের বেত উঁচাইনি আমি।

তোর খাটুনি দুনো। তোকে খুব আত্মরক্ষা ক'রে চল্‌তে হ'বে। এটা আমি খুব বুঝি যে কবিতা গান লেখা যায় হয়ত দিনে একশটা, কিন্তু হিসাবে লেখা যায় না এক পাতা। ফুল কুড়ান যায় ঝুড়ি ঝুড়ি, কিন্তু বেগুন বোধহয় এক ঝুড়ির বেশী তোলা যায় না। অবশ্য আমার এ মত তাঁদের জন্য নয়, যাঁরা কেয়াফুলের চেয়ে ভুট্টাকে বেশী দামী মনে করেন।....কবিতা লেখার একটা সোয়াস্তি আছে, কেননা তা' লেখা

যায় কাছা খুলে, কিন্তু হিসাব লিখতে হয় কাছাকোছা এঁটে, যেন একটা পাইও এধার ওধার না হয়।

এই হিসেবের আর বে হিসেবের দুটো বিপরীত মুখকে যে তুই কি ক'রে মিল খাইয়েছিস, তা ভেবে আমি অবাক হই। তার উপর তুই পড়ছিস। তুই পড়ছিস, লিখছিস, হিসাব লিখছিস। এই তিন শঙ্কায় প'ড়ে ত্রিশঙ্কু হয়ে পড়িসনে যেন, এই আশীর্বাদ করি। তোর হিসাবের ফিরিস্তি গরমিল হোক বা চুলোয় যাক—আমার তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু কাব্যের ফেরেশতা বেঁচে থাকুক—এ প্রার্থনা আমি চিরকাল করব। অবশ্য ফেরেশ্‌তা কখনও পটল তোলেনি, তুলেছে মুদি বা বেনে। ফেরেশ্‌তা অমর, কিন্তু অনেক পট্‌লাবেনেকে পটল তুলতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

পড়া ছাড়িস্‌নে তুই, তা হ'লে তোকে লেখায় ছাড়বে। অবশ্য পণ্ডিত হ'তে আমি বল্‌ছিনে, কিন্তু আমার আনন্দকে প্রকাশের পুঁজি ত আমার থাকা চাই। পণ্ডিত জমায়, সে কৃপণ; কবি বিলোয়, সে দাতা। কবি নেয়, কিন্তু সে দান করে,—নদীর মত সে চলে গাইতে গাইতে, দান ক'রে ক'রে 'দু' পাশে ফুল ফুটিয়ে। পণ্ডিত নেয়, মাড়োয়ারীর ভুঁড়ির মত, ওর পরিধি শুধু বেড়েই চলে নিয়ে নিয়ে, ও আর দিতে চায় না, তাই ওর মরণং ধ্রুবং। মাড়োয়ারীর নিলে সে নালিশ করে, নদীর নিলে সে খুশী হয়। জরদ্গবের মত তার পেটটা গজ্‌গজ্‌ করুক বিদ্যেয়, এ আমি বলছিনে তাই বলে জানতে শুনতে যতটুকু জানা শোনার দরকার—তা থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখবি কেন? কত ফুল কত পাখী কত গান কত রঙ্‌—এ আমি উপভোগ করব না?

চিঠি বড় হ'য়ে যাচ্ছে—অর্থাৎ এটা হ'য়ে উঠছে প্রবন্ধ—যাকে কবির ভয় করে। ক্লাসে ওর দরকার আছে, কিন্তু মুশায়েরায় ওর প্রবেশ নিষেধ। ফুলের ভাষা, কুঁড়ির ব্যথা, পাতার কথা, লতার আবেগ,

তরুর বাণী আমরা শুনতে পাই বুঝতে পারি ব'লে আচার্য জগদীশের ল্যাবরেটরী দেখতে যাইনে। তরুলতাকে মেরে ছুঁচ ফুটিয়ে তার হাসি-কান্না দেখার প্রবৃত্তি আমার নেই।

ক'দিন বেশ কাটল। প্রাণতোষটা আজ চ'লে যাচ্ছে। আবার প্রবেশ করব কাব্যলক্ষ্মীর হারেম-খানায়।

আমি শীগ্‌গীর কলকাতা যাব, তখন দেখা হবে। তোদের মুশায়েরার সব রস-পিপাসু হৃদয় ক'টিকে অভিনন্দন করছি আমি। তোরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ ও স্নেহ-ইচ্ছা নে। তোরা সুন্দর হ'য়ে ওঠ। ইতি।

নিত্য-শুভার্থী
'কাজীদা'

২০.

(শ্রীমুরালীধর বসুকে লিখিত।)

কৃষ্ণনগর
১১ই মাঘ, ১৩৩৩

মুরলীদা !

তোমার চিঠি পেলাম।....আমার জ্বর ছেড়েছে, দুর্বলতা সারেনি। কলকাতা গিয়েই জ্বরে পড়ি। অবশ্য যেতে হয়েছিল পেটের জ্বালায়।....'কল্লোলে' গিয়ে সেখানেই শয্যা নিই জ্বরে। তারপর 'সওগাত' অফিসে গিয়ে তিন চার দিন আর উঠতে পারিনি।....সেখানে অসুবিধা হওয়ায় জ্বর নিয়েই চলে আসি। তাই আর তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি।—'কালিকলম' ঠিক সময়ে বেরুবে নিশ্চয়। ফাল্গুনের 'কালিকলমে'র জন্য কী লিখব ভাবছি।—'বঙ্গবাণী'র

উত্তর যদি পাও কিছু, জানাবে। ভয়ানক দুর্দিন আমার এ-বছর। অথচ কোথাও একটু নড়লে চড়লেই জ্বর আসে।

....তুমি একা পড়েছ—খুব খাটুনী পড়ছে, না ? ভালবাসা নিও। বাড়ীর আর সকলে ভাল। চিঠি দিও অবসর ক'রে।—

নজরুল

২১.

(খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীনকে লিখিত।)

কৃষ্ণনগর
১০-২-২৭

স্নেহভাজনেষু,

মঈন! বহুদিন তোকে আর পত্র দিতে পারিনি! আবার জ্বরে পড়েছিলম। কাল জর-শয্যা ছেড়ে উঠেছি। আজ-ও "গাজী আবদুল করিম" কবিতাটা শেষ করতে পারিনি জ্বরের জন্য। আজ কিম্বা কাল শেষ করবো ইচ্ছা আছে। জ্বরে আমার শরীর ও মনের ক্ষতিই করলে না শুধু, কাব্যেরও বড় ক্ষতি করলে। নাসিরুদ্দীন সাহেব না জানি কী মনে করেছেন। তুই বুঝিয়ে বলিস তাঁকে। তাঁকে আলাদা পত্র দিলাম না, একেবারে কবিতার সঙ্গে চিঠি দেবো ব'লে অপেক্ষা করছি। তিনি এতদিন বোধ হয় বাড়ী হতে ফিরেছেন। ফাল্গুনের 'সওগাতের'র কতদূর ? এখানে আর সব ভাল। হাঁ, Variety entertainment এর কী কতদূর করলি জানাবি। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল আমার পক্ষে। কেননা, আমার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠছে। আর সপ্তাহ খানিকের মধ্যে কি পারবিনে ? নাসির সাহেবকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানাস। আমি সেইরূপ ভাবে প্রস্তুত হব। আশা করি ভাল আছিস। অন্যান্য খবর দিস। স্নেহাশীষ নে। ইতি—

শুভার্থী
নজরুল

২.২.

(১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী রবিবার ঢাকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন হয়; সম্মেলনের উদ্বোধন করার জন্য কাজী নজরুল ইসলামকে আমন্ত্রন করা হয়। সেই উপলক্ষে সাহিত্য-সমাজের সম্পাদককে কবি এই পত্রখানি লেখেন।)

কৃষ্ণনগর
১০-২-২৭

প্রিয় আবুল হোসেন সাহেব !

আপনার সাদর আমন্ত্রণ-লিপি নব-ফাল্গুনের দখিন হাওয়ার মতই খুশ্-খবরী নিয়ে এসেছে। আমার শরীর জ্বরের উপর্যুপরি অক্রমণে জর্জরিত হয়ে উঠেছে। তাই মন আমার এ আনন্দ-বার্তা পেয়ে যত হালকাই হয়ে উঠুক, শরীর হয়ত তেমন হাল্‌কা হয়ে উঠতে পারছে না। আর শরীর যদি অমনি ভারী হয়ে থাকে আর কিছুদিন, তা হলে এর ভার কোন রেলগাড়ীই বইতে সমর্থ হবে না! আমার বর্তমান অভিভাবক জ্বর, তারই আদেশের প্রতীক্ষা করছি।

বসন্তের হাওয়া জরা ও জ্বর সইতে পারে না। তাই আশায় বসে আছি, কখন্ আসবে দখিন হাওয়া,—আসবে আমার রোগশয্যায় ফুলের আমন্ত্রণ-লিপি।

আপনাদের আনন্দ-মহ্‌ফিলে আমার বাঁশী যদি নাই বাজে তা হলেও আপনাদের খুশীর "জাম" অপুর্ণ থাকবে না। ঢাকার অতগুলি কবি-কিশোরের কচি-কণ্ঠের সুরে সুরে আপনাদের সুরলোক মস্‌ত্ হয়ে উঠবে। এ আমি অত্যুক্তি করচিনে।—আপনাদের উৎসব-দিনের 'মুতরিব' হবার গৌরব আমায় দিতে চান; কিন্তু যে গান আমি গাঁথব, তার সুর যে আপনাদের মনের বেনুকুঞ্জে। কোন্ আনন্দ-মাণিক

আপনাদের উৎসবের মালার মধ্যমণি, কোন্ বেদনা-সুন্দর এর দেবতা কোন প্রকাশোন্মুখ অন্তরে এর পুজা-বেদী—এর আভাস না পেলে আমি কি ক'রে আগমনী গান রচনা করি? যদি আমাকে গাইতে হয় এ আনন্দ-জলসার আগমনী, তা হলে আপনাদের উৎসবের অন্তরের কথা—যাকে কেন্দ্র ক'রে সুর-লক্ষ্মীর নৃত্য চলবে—শীগ্‌গীর জানাবেন।

আর আমার বাণী? তার প্রকাশ কি শোভন হবে আপনাদের নৌরোজের মজলিশে? আমার সরস্বতী অশ্রুমতী,—বেদনা-শতদলে তাঁর চরণ। যুগযুগান্তরের অশ্রুর অঞ্জলি এসে পড়েছে তাঁর পায়ে। এ ক্রন্দসীর গান শুধু একটানা ক্রন্দন। আনন্দ-উৎসবের নৌরাতির দীপশিখা নিবে যায় এর হতাশ্বাসে। তবু হয়ত সে দুঃস্বপ্ন দেখার মত সুন্দরের নেশায় আনন্দ-গান গেয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। চোখের জলে ধোওয়া সে সুর। বেদনায় রাঙা সে হাসি। আমার বাণী শিল্পীর বাণী নয়, আমার বাণী বেদনাতুরের কান্না। আমার সুরলক্ষ্মী স্বর্গের উর্বশী নয়, মর্ত্যের শকুন্তলা—বিরহ-শীর্ণা অশ্রুমুখী পরিত্যক্তা শকুন্তলা, উৎপীড়িতা লায়লি!

আপনি আমার লেখা পড়ে মনে করেছেন, হয়তো আবার আমার জ্বর এসেছে। নৈলে এত বকছি কেন?

আপনারা যদি নেহাৎ না ছাড়েন, যেতেই হবে। কিন্তু এ কথা সত্য যে তাতে আপনাদের উৎসব-রজনী বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না। আপনার পত্র পেলে সেইরূপ ব্যবস্থা করব।

আমার আন্তরিক প্রীতি ভালবাসা নেবেন সকলে।

আপনাদের সুন্দর-পূজার আয়োজন সার্থক হোক, সুন্দর হোক, পুর্ণ হোক্! ইতি—

প্রীতি-সিক্ত—

নজরুল ইসলাম

২৩.

(শ্রীব্রজবিহারী বর্মণকে লিখিত।)

কৃষ্ণনগর

১১-৩-২৭

স্নেহভাজনেষু,

ব্রজ! আগামী পরশু রবিবার রাত্তিরে আমার খোকার মুখে ভাত দেওয়া উপলক্ষে বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণ করছি! কলকাতার ও স্থানীয় অনেক বন্ধু আসবেন। তুমি সেদিন অবশ্য এসো। না এলে দুঃখিত হব। হয় সকালের চট্টগ্রাম মেলে কিম্বা দুপুর ১টা ৩৪-মিনিটের সময় Calcutta-মুর্শিদাবাদ প্যাসেঞ্জারে আসবে। এই দুটি ছাড়া আর ট্রেণ নেই। এলে অন্যান্য কথা হবে।

তোমার প্রেরিত টাকা চব্বিশটা পেয়েছি। 'ফনিমনসা'র প্রুফ পেলাম আজ। স্নেহাশীষ নাও। ইতি—

শুভার্থী
নজরুল

২৪.

(শ্রীব্রজবিহারী বর্মণকে লিখিত।)

কৃষ্ণনগর

২০-৪-২৭

স্নেহের বর্ম্মণ!

আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। প্রায় প্রত্যহ Slow fever আসিতেছে। গোপালের টাকা পাঠাইবার কথা ছিল। আজও টাকা

পাঠাইল না। বাড়ীতে একটা পয়সাও নাই। তুমি পত্র-পাঠ মাত্রই অন্তত কুড়িটি টাকা T. M. O. করে পাঠাও! নৈলে বড় মুশকিলে পড়ব। বাজার খরচের পর্যন্ত পয়সা নেই। টাকা না পাঠালে বড় বিপদে পড়ব। বহু দেনা করেছি, আর টাকা পাওয়া যাবে না ধার এখানে!

তোমার
কাজীদা

২৫.

(১৩৩৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'নওরোজ' পত্রিকায় নজরুল ইসলামের নিকট লিখিত অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খার "একখানি পত্র" প্রকাশিত হইয়াছিল; সেই "চিঠির উত্তরে" ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যা 'সওগাত'-এ নজরুলের এই পত্রখানি প্রকাশিত হয়।)

শ্রদ্ধেয় প্রিন্সপাল ইব্রাহিম খান সাহেব!

আমাদের আশি বছরে নাকি স্রষ্টা ব্রহ্মার একদিন। আমি অত বড় স্রষ্টা না হলেও স্রষ্টা তো বটে, তা আমার সে সৃষ্টির পরিসর যত ক্ষুদ্র পরিধিই হোক। কাজেই আমারও একটা দিন অন্ততঃ তিনটে বছরের কম যে নয়. তা' অন্য কেউ বিশ্বাস করুক চাই না করুক, আপনি নিশ্চয়ই করবেন।

আপনার ১৯২৫ সালের লেখা চিঠির উত্তর দিচ্ছি ১৯২৭ সালের আয়ু যখন ফুরিয়ে এসেছে তখন। এমনও হতে পারে ১৯২৭ এর সাথে সাথে হয়ত বা আমারও আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, তাই আমিও আমার অজ্ঞাতে কোন অনির্দেশের ইঙ্গিতে আমার শেষ বলা বলে যাচ্ছি আপনার চিঠির উত্তর দেওয়ার সুযোগে। কেননা, আমি এই তিন বছরের মধ্যে কারুর চিঠির উত্তর দিয়েছি, এত বড় বদনাম আমার শত্রুতেও দিতে পারবে না —বন্ধুরা তো নয়ই। অবশ্য আয়ু আমার ফুরিয়ে এসেছে—এ সুসংবাদটা

উপভোগ করবার মত সৎসাহস আমার নেই, বিশ্বাসও হয়ত করিনে,; কিন্তু আমারই স্বজাতি অর্থাৎ কবি জাতীয় অনেকেই এ-বিশ্বাস করেন এবং আমিও যাতে বিশ্বাস করি তার জন্যে অর্থ ও সামর্থ ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণেই করছেন। কিন্তু আমার শরীরের দিকে তাকিয়ে তাঁরা যে নিঃশ্বাস মোচন করেন, তা হ্রস্ব নয় এবং সে নিঃশ্বাস বিশ্বাসীরও নয়! হতভাগা আমি, তাঁদের এই আমার প্রতি অতি মনোযোগ নাকি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিনে—মন্দ লোকে এমন অভিযোগও করেছে তাঁদের দরবারে।

লোকে বল্‌লেও আমি মনে করতে ব্যথা পাই যে তাঁরা আমার শত্রু। কারণ, একদিন তাঁরাই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আজ যদি তাঁরা সত্যি সত্যিই আমার মৃত্যু কামনা করেন, তবে তা আমার মঙ্গলের জন্যই, এ আমি আমার সকল হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করি। আমি আজও মানুষের প্রতি আস্থা হারাইনি—তাদের হাতের আঘাত যত বড় এবং যত বেশীই পাই। মানুষের মুখ উল্টে গেলে ভূত হয়, বা ভূত হলে তার মুখ উল্টে যায়, কিন্তু মানুষের হৃদয় উল্টে গেলে সে যে ভূতের চেয়েও কত ভীষণ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র হয়ে ওঠে—তা-ও আমি ভাল ক'রেই জানি। তবু আমি মানুষকে শ্রদ্ধা করি—ভালবাসি। স্রষ্টাকে আমি দেখিনি, কিন্তু মানুষকে দেখেছি। এই ধূলিমাখা পাপলিপ্ত অসহায় দুঃখী মানুষই একদিন বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত করবে, চির-রহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করবে, এই ধূলোর নীচে স্বর্গ টেনে আনবে, এ আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। সকল ব্যথিতের ব্যথায়, সকল অসহায়ের অশ্রুজলে আমি আমাকে অনুভব করি, এ আমি একটুও বাড়িয়ে বলছিনে, এই ব্যথিতের অশ্রু-জলের মুকুর যেন আমি আমার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। কিছু করতে যদি নাই পারি, ওদের সাথে প্রাণ ভরে যেন কাঁদতে পাই!

কিন্তু এ ত আপনার চিঠির উত্তর হচ্ছে না। দেখুন, চিঠি না লিখ্‌তে লিখ্‌তে চিঠি লেখার কায়দাটা গেছি ভুলে। তাতে করে কিন্তু লাভ

হয়েছে অনেক। যদিও চোখ-কান বুঁজে উত্তর দিয়ে ফেলি কারুর চিঠির, সে উত্তর পড়ে তাঁর প্রত্যুত্তর দেবার মত উৎসাহ বা প্রবৃত্তির ইতি ঐখানেই হয়ে যায়। কেননা, সেটা তাঁর চিঠির উত্তর ছাড়া আর সব কিছুই হয়। এ-বিষয়ে ভুক্তভোগীর সাক্ষ্য নিতে পারেন। সুতরাং এটাও যদি আপনার চিঠির উত্তর না হয়ে আর কিছুই হয়, তবে সেটা আপনার অদৃষ্টের দোষ নয়, আমার হাতের অখ্যাতি।

আমাদের দেখা না হলেও শোনার ত্রুটি কোনো পক্ষ থেকেই ঘটেনি দেখছি। আপনাকে চিনি, আপনি আমায় যতটুকু চেনেন তার চেয়েও বেশী ক'রে, কিন্তু জানতে যে আজও পারলাম না, তার জন্য অভিযোগ আমার অদৃষ্টকে ছাড়া আর কা'কে করব বলুন। এতদিন ধরে বাঙলার এত জায়গা ঘুরেও যখন আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল না তখন আর যে হবে সে আশা রাখিনে। বিশেষ ক'রে—আজ যখন ক্রমেই নিজেকে জানা-শোনার আড়ালে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এ ভালই হয়েছে—অন্ততঃ আপনার দিক থেকে। আমার দিকের ক্ষতিটাকে আমি সইতে পারব এই আনন্দে যে, আপনার এত শ্রদ্ধা অপাত্রে অর্পিত হয়েছে বলে দুঃখ করবার সুযোগ আপনাকে দিলাম না। এ আমার বিনয় নয়; আমি নিজে অনুভব করেছি যে, আমায় শুনে যাঁরা শ্রদ্ধা করেছেন, দেখে তাঁরা তাঁদের সে শ্রদ্ধা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তাই আমি অন্তরে অন্তরে প্রার্থনা করছি, কাছে থেকে যাঁদের কেবল ব্যথাই দিলাম, দূরে গিয়ে অন্ততঃ তাঁদের সে দুঃখ ভুলবার অবসর যদি না দিই, তবে মানুষের প্রতি আমার ভালোবাসা সত্য নয়।

তা ছাড়া নৈকট্যের একটা নিষ্ঠুরতা আছে। চাঁদের জ্যোৎস্নায় কলঙ্ক নেই, কিন্তু চাঁদে কলঙ্ক আছে। দূরে থেকে চাঁদ চক্ষু জুড়ায়, কিন্তু মৃত চন্দ্রলোকে গিয়ে কেউ খুশী হয়ে উঠবেন বলে মনে হয় না। বাতায়ন দিয়ে যে-সূর্যালোক ঘরে আসে তা আলো দেয়, কিন্তু চোখে দেখার সূর্য দগ্ধ করে। চন্দ্র-সূর্যকে আমি নমস্কার করি, কিন্তু তাঁদের পৃথিবী-দর্শনের

কথা শুনলে আতঙ্কিত হয়ে উঠি। ভালোই হয়েছে ভাই, কাছে গেলে হয়ত আমার কলঙ্কটাই বড় হয়ে দেখা দিত।

তারপর শ্রদ্ধার কথা। ওদিক দিয়ে আপনার জিতে যাবার কোন আশা নেই, বন্ধু। শ্রদ্ধা যদি ওজন করা যেত, তা' হলে আমাদের দেশের একজন প্রবীণ সম্পাদক—যিনি মানুষের দোষগুণ বানিয়ার মত ক'রে কড়ায় গণ্ডায় ওজন করতে সিদ্ধহস্ত, তাঁর কাছে গিয়েই এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যেত! গ্রহের ফেরে তাঁর কাঁচি-পাকি ওজনের ফের আমার পক্ষে কোনদিনই অনুকূল নয়; তা সত্ত্বেও আপনিই হারতেন, এ আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি।

হঠাৎ মুদির প্রসঙ্গটা এসে পড়বার কারণ আছে, বন্ধু! জানেনই ত, আমরা কাণাকড়ির খরিদ্দার। কাজেই ওজনে এতটুকু কম হ'তে দেখলে প্রাণটা ছ্যাঁক ক'রে ওঠে। মুদিওয়ালার ওতে লাভ কতটুকু জানিনে, কিন্তু আমাদের ক্ষতির পরিমাণ আমরা ছাড়া কেউ বুঝ্‌বে না; —মুদিওয়ালা ত নয়ই। তবু মুদিওয়ালাকে তুল দাঁড়ি ধরতে দেখ্‌লে একটু ভরসা হয় যে, চোখের সামনে অতটা ঠকাতে তার বাধবে; কিন্তু তার পাঁচসিকা মাইনের নোংরা চাকরগুলো যখন দাঁড়ি-পাল্লার মালিক হয়ে বসে, তখন আর কোন আশা থাকে না। আগেই বলেছি, আমরা দরিদ্র খরিদ্দার। থাক্‌ত বড় বড় মিত্রদের মত সহায়-সম্বল, তা হলে এ-অভিযোগ করতাম না।

পায়া-ভারী লোকের ভারী সুবিধে। তা' সে পায়া-ভারী পায়ে ফাইলেরিয়া-গোদ হয়েই হোক, বা ভার গুণেই হোক। এঁদের তুলতে হয় কাঁধে ক'রে, আর কাছে যেতে হয় মাথাটা ভুঁই-সমান নীচু ক'রে। ব্যবসা যারা বোঝে, তারা অন্য দোকানীর বড় খদ্দেরকে হিংসা ও তজ্জনিত ঘৃণা যতই করুক, তাঁকে নিজের দোকানে ভিড়াতে তার দোকানের সবটুকু তেল তাঁর ভারী পায়ে খরচ করতে তার এতটুকু বাধে না। দরকার হলে তার পুত্র ছোটে তেলের টিন ঘাড়ে ক'রে,

সাঁতরে পার হয় রূপনারায়ণ নদ তাঁর ভারী পায়ে ঢালে তৈল,—তা সে পা যতই কেন ঘানি গাছের মত অবিচলিত থাক। সাথে সে ভাঁড় ও স্তুতি-গাইয়ে নিয়ে যেতেও ভোলে না।

যাক এখন এ সব বাজে কথা। অনেক কথার উত্তর দিতে হবে।

আমি আপনার মত অসঙ্কোচে 'তুমি' বলতে পারলাম না ব'লে ক্ষুণ্ণ হবেন না যেন। আমি একে পাড়াগেঁয়ে স্কুল-পালানো ছেলে, তার ওপর পেটে ডুবুরি নামিয়ে দিলেও 'ক' অক্ষর খুঁজে পাওয়া যাবে না (পেটে বোমা মারার উপমাটা দিলাম না স্পেশাল ট্রিবিউনালের ভয়ে)। যদি বা 'খাজা' বা ইবরাহিম খানকে তুমি' বল্‌তে পারতাম, কিন্তু কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেবের নাম শুনেই আমার হাত-পা একেবারে পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেছে। আরে বাপ্‌! স্কুলের হেডমাষ্টারের চেহারা মনে করতেই আমার আজও জল তেষ্টা পেয়ে যায়, আর কলেজের প্রিন্সিপাল, সে না জানি আরও কত ভীষণ! আমার স্কুল-জীবনে আমি কখনও ক্লাসে বসে পড়েছি, এত বড় অপবাদ আমার চেয়ে এক নম্বর কম পেয়ে যে "লাষ্ট বয়" হয়ে যেত—সেও দিতে পারবে না। হাই বেঞ্চের উচ্চাসন হতে আমার চরণ কোনদিই টলেনি, ওর সাথে আমার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে গেছিল। তাই হয়ত আজও বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিলে মনে হয়, মাষ্টার মশাই হাই বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন!

যার রক্তে রক্তে এত শিক্ষক-ভীতি, তাকে আপনি সাধ্যসাধনা ক'রেও "তুমি" বলাতে পারবেন না, এ স্থির নিশ্চিত।

এইবার পালা শুরু।

বাঙলার মুসলমান সমাজ ধনে কাঙাল কি না জানিনে, কিন্তু মনে যে কাঙাল এবং অতি মাত্রায় কাঙাল, তা আমি বেদনার সঙ্গে অনুভব ক'রে আসছি বহুদিন হতে। আমায় মুসলমান সমাজ 'কাফের' খেতাবের যে শিরোপা দিয়েছে, তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। একে আমি

অবিচার ব'লে কোনোদিন অভিযোগ করেছি ব'লে ত মনে পড়ে না। তবে আমার লজ্জা হয়েছে এই ভেবে, কাফের-আখ্যায় বিভূষিত হবার মত বড় ত আমি হইনি, অথচ হাফেজ খৈয়াস-মনসুর প্রভৃতি মহাপুরুষদের সাথে কাফেরের পংক্তিতে উঠে গেলাম!

হিন্দুরা লেখক-অলেখক জন-সাধারণ মিলে যে-স্নেহে যে নিবিড়-প্রীতি ভালবাসা দিয়ে আমায় এত বড় করে তুলেছেন, তাঁদের সে ঋণকে অস্বীকার যদি আজ করি তা'হলে আমার শরীরে মানুষের রক্ত আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। অবশ্য কয়েকজন নোংরা হিন্দু ও ব্রাহ্ম লেখক ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে আমায় কিছুদিন হ'তে ইতর ভাষায় গালাগালি করছেন, এবং কয়েকজন গোঁড়া 'হিন্দু-সভাওয়ালা' আমার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনাও ক'রে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু এঁদেরে আঙ্গুল দিয়ে গোণা যায়। এঁদের আক্রোশ সম্পূর্ণ সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত। এঁদের অবিচারের জন্য সমস্ত হিন্দুসমাজকে দোষ দিই নাই এবং দিবও না। তা' ছাড়া, আজকার সাম্প্রদায়িক মাতলামির দিনে আমি যে মুসলমান এইটেই হয়ে পড়েছে অনেক হিন্দুর কাছে অপরাধ,—আমি যত বেশী অসাম্প্রদায়িক হই না কেন।

প্রথম গালাগালির ঝড়টা আমার ঘরের দিক অর্থাৎ মুসলমানের দিক থেকেই এসেছিল—এটা অস্বীকার করিনে; কিন্তু তাই বলে মুসলমানেরা যে আমায় কদর করেন নি, এটাও ঠিক নয়। যাঁরা দেশের সত্যিকার প্রাণ, সেই তরুণ মুসলিম বন্ধুরা আমায় যে ভালোবাসা, যে প্রীতি দিয়ে অভিনন্দিত করেছেন তাতে নিন্দার কাঁটা বহু নিচে ঢাকা পড়ে গেছে। প্রবীণদের আশীর্বাদ—মাথার মণি হয়ত পাইনি, কিন্তু তরুণদের ভালোবাসা, বুকের মালা আমি পেয়েছি। আমার ক্ষতির ক্ষেতে ফুলের ফসল ফলেছে।

এই তরুণদেরই নেতা ইব্রাহিম খান, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর, ওয়াজেদ আলি, আবুল হোসেন।

আর এই বন্ধুরাই ত আমায় বড় করেছেন, এই তরুণদের বুকে আমার জন্য আসন পেতে দিয়েছেন—প্রীতির আসন! ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফরিদপুরে যারা তাদের গলার মালা দিয়ে আমায় বরণ করল, তারা এই তরুণেরই দল। অবশ্য, এ তরুণের জাত ছিল না। এরা ছিল সকল জাতির।

সকলকে জাগাবার কাজে আমায় আহ্বান করেছেন। আমার মনে হয়, আপনাদের আহ্বানের আগেই আমার ক্ষুদ্র শক্তির সবটুকু দিয়ে এদের জাগাবার চেষ্টা করেছি—শুধু যে লিখে তা নয়,—আমার জীবনী ও কর্মশক্তি দিয়েও।

আমার শক্তি স্বল্প, তবু এই আট বছর ধরে আমি দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক-শ্রমিক তরুণদের সঙঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি—লিখেছি, বলেছি, চারণের মত পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছি। অর্থ আমার নাই, কিন্তু সামর্থ্য যেটুকু আছে, তা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত কোনদিন হয়েছি, এ-বদনাম আর যেই দিক, আপনি দেবেন না বোধ হয়। আমার এই দেশ-সেবার সমাজ-সেবার 'অপরাধের' জন্য শ্রীমৎ সরকার বাবাজির আমার উপর দৃষ্টি অতি মাত্রায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। আমার সবচেয়ে চল্‌তি বইগুলোই গেল বাজেয়াফ্‌ত হয়ে। এই সে-দিনও পুলিশ আবার আমায় জানিয়ে দিয়েছে, আমার নব প্রকাশিত 'রুদ্র-মঙ্গল' আর বিক্রি করলে আমাকে রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত করা হবে। আমি যদি পাশ্চাত্ত্য ঋষি হুইটম্যাণের সুরে সুর মিলিয়ে বলি :

'Behold, I do not give a little charity,
When I give, I give myself."

তা হ'লে সেটাকে অহঙ্কার ব'লে ভুল করবেন না।....

আপনি সমাজকে "পতিত, দয়ার পাত্র" বলেছেন। আমিও সমাজকে পতিত demoralized মনে করি—কিন্তু দয়ার পাত্র মনে করতে পারিনি। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি আমার সমাজকে মনে করি ভয়ের পাত্র। এ-সমাজ সর্বদাই আছে লাঠি উচিয়ে :

এর দোষ-ত্রুটীর আলোচনা করিতে গেলে নিজের মাথা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। আপনি হয়ত হাসছেন, কিন্তু আমি ত জানি, আমার শির লক্ষ্য ক'রে কত ইট-পাটকেলই না নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

আমার কি মনে হয় জানেন? স্নেহের হাত বুলিয়ে এ পচা সমাজের কিছু ভাল করা যাবে না। যদি সে রকম 'সাইকিক কিওর'-এর শক্তি কারুর থাকে, তিনি হাত বুলিয়ে দেখতে পারেন। ঘোঁড়া যখন পে'কে প'চে ওঠে, তখন রোগী সবচেয়ে ভর করে অস্ত্র চিকিৎসককে। হাতুড়ে ডাক্তার হয়ত তখনো আশ্বাস দিতে পারে যে, সে হাত বুলিয়েই ঐ গলিত ঘা সারিয়ে দেবে এবং তা শুনে রোগীরও খুশী হয়ে উঠবারই কথা। কিন্তু বেচারী 'অবিশ্বাসী' অস্ত্র চিকিৎসক তা বিশ্বাস করে না। সে বেশ করে তার ধারালো ছুরি চালায় সে-ঘায়ে; রোগী চেঁচায়, হাত পা ছোঁড়ে, গালি দেয়। সার্জন তার কর্তব্য ক'রে যায়। কারণ সে জানে, আজ রোগী গালি দিচ্ছে, দুদিন পরে ঘা সেরে গেলে সে নিজে গিয়ে তার বন্দনা ক'রে আসবে।

আপনি কি বলেন? আমি কিন্তু অস্ত্রচিকিৎসার পক্ষপাতী। সমাজ তো হাত-পা ছুঁড়বেই, গালিও দেবে, তা সইবার মত শক্ত চামড়া যাঁদের নেই, তাঁদের দিয়ে সমাজ-সেবা হয়ত চলবে না। এই জন্যই আমি বারে বারে ডাক দিয়ে ফিরছি নির্ভীক তরুণ ব্রতীদলকে। এ-সংস্কার সম্ভব হবে শুধু তাঁদের দিয়েই। এরা যশের কাঙাল নয়, মানের ভিখারী নয়। দারিদ্র্য সইবার মত পেট, আর মার সইবার মত পিঠ যদি কারুর থাকে, ত এই তরুণদেরই আছে। এরাই সৃষ্টি করবে নূতন সাহিত্য, এরাই আনবে নূতন ভাবধারা, এরাই গাইবে 'তাজা বতাজা'র গান।

আপনি হয়ত আমায় এদেরই অগ্রনায়ক হতে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু আপনার মত আমিও ভাবি, আজও ভাবি যে, কে সে ভাগ্যবান এদের অগ্রনায়ক। আমার মনে হয়, সে ভাগ্যবান আজো আসেনি। আমি

অনেকবার বলেছি, আজো বলছি—সে ভাগ্যবানকে আমি দেখিনি, কিন্তু দেখলে চিনতে পারব। আমার বাণী—তাঁরই আগমনী-গান। আমি তাঁরই অগ্রপথিক তূর্যবাদক। আমার মনে হয়, সেই ভাগ্যবান পুরুষেরই ইঙ্গিতে আমি শুধু গান গেয়ে গেয়ে চলেছি—জাগরণী গান। আঘাত, নিন্দা, বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা দশদিক হতে বর্ষিত হচ্ছে আমার উপর, তবু আমি তাঁর দেওয়া তূর্য বাজিয়ে চলেছি। এ-বিশ্বাস কোথা হ'তে কি ক'রে যে আমার মাঝে এল, তা আমি নিজেই জানিনে। আমার শুধু মনে হয় কার যেন আদেশ—কার যেন ইঙ্গিত আমার বেদনার রন্ধ্রপথে নিরন্তর ধ্বনিত হয়ে চলেছে। তাঁর আসার পদধ্বনি আমি নিরন্তর শুনছি আমার হৃৎপিণ্ডের তালে তালে, আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি আক্ষেপে।

তবে, এও আমি বিশ্বাস করি, সেই অনাগত পুরুষের, আমাদের যে-কারুর মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করা বিচিত্র নয়।

আমি এতদিন তাঁকে খুঁজেছি আমারও উর্ধ্বে। তাঁকে আমারই মাঝে খুঁজতেও হয়ত চেয়েছি। দেখা তাঁর পেয়েছি এমন কথা বলব না, তবে এ-কথা বলতেও আমার আজ দ্বিধা নেই যে, আমি ক্রমেই তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করছি। এমনও মনে হয়েছে কতদিন, যেন আর একটু হাত বাড়ালেই তাঁকে ধরতে পারি।

আপনার "হাত বাড়াবে কি?" কথাটা আমায় সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছে। তাই আমি খুঁজে ফিরছি নিরাশ-হতাশ্বাসে সেই নিশ্চিন্ত শান্তি—যার ধ্যান-লোকে বসে আমি তপস্যা-প্রোজ্জ্বল নেত্রে আমার অবহেলিত আমাকে খুঁজে দেখবার অবকাশ পাব। এ-শান্তি আমার এ-জীবনে পাব কি না জানি না; যদি পাই—আপনার জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর দিয়ে যাব সেদিন।

আপনার কয়েকটি মৃদু অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা করব এইবার।

আপনি আমার যে-দায়িত্বের উল্লেখ করেছেন, সে-দায়িত্ব আমার সত্যিকার কাব্য-সৃষ্টির,না সমাজ-সংস্কারের? আমি আর্টের সুনিশ্চিত সংজ্ঞা জানিনে, জান্‌লেও মানিনে।

"এই সৃষ্টি করলে আর্টের মহিমা অক্ষুন্ন থাকে, এই সৃষ্টি করলে আর্ট ঠুঁটো হয়ে পড়ে"—এমনিতর কতকগুলো বাঁধা নিয়মের বল্‌গা ক'ষে ক'ষে আর্টের উচ্চৈঃশ্রবার গতি পদে পদে ব্যাহত ও আহত করলেই আর্টের চরম সুন্দর নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ হ'ল—এ কথা মান্‌তে আর্টিস্টের হয়ত কষ্টই হয়, প্রাণ তার হাঁপিয়ে ওঠে। জানি ক্লাসিকের কেশো রোগীরা এতে উঠ্‌বেন হাড়ে চ'টে, তাঁদের কলম হয়ে উঠ্‌বে বাঁশ। এরই মধ্যে হয়েও উঠেছে তাই। তবু আজ এ-কথা জোর গলায় বল্‌তে হবে নবীনপন্থীদেরে। এই সমালোচকদের নিষেধের বেড়া যাঁরাই ডিঙিয়েছেন, তাঁদেরই এঁদের গোদা পায়ের লাথি খেতে হয়েছে, প্রথম শ্রেণী হতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নেমে যেতে হয়েছে।

বেদনা সুন্দরের পূজা যাঁরাই করেছেন, তাঁদের চিরকাল একদল লোক হুজুগে ব'লে নিন্দা করেছে। আর, এরাই দলে ভারী। এরা মানুষের ক্রন্দনের মাঝেও সুর-তাল-লয়ের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখ্‌লে হল্লা করে যে, ও-কান্না হাততালি দেবার মত কান্না হ'ল না বাপু, একটু আর্টিস্টিক ভাবে নেচে নেচে কাঁদ! সকল সমালোচনার উপরে যে-বেদনা, তাকে নিয়েও আর্টশালারক্ষী—এই প্রাণহীন আনন্দ-গুণ্ডার কুশ্রী চীৎকারে হুইট্‌ম্যানের মত ঋষিকেও অ-কবির দলে পড়তে হয়েছিল!

আমার হয়েছে সাপের ছুঁচো গেলা অবস্থা। "সর্বহারা' লিখলে বলে—কাব্য হ'ল না; 'দোলন-চাঁপা' 'চায়ানট' লিখলে বলে—ও হ'ল ন্যাকামী! ও নিরর্থক শব্দ-ঝঙ্কার দিয়ে লাভ হবে কী? ও না শিখ্‌লে কা'র কি ক্ষতি হ'ত?

'লিরিক' নাকি 'লভ' এবং 'ওয়ার' নিয়ে। আমাদের দেশে যুদ্ধ নাই

(হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধ ছাড়া) ; কাজেই মানুষের নির্যাতন দেখে তার সেই মর্মব্যথার গান গাইলে এখানে হয় তা 'বীভৎস বিদ্রোহ রস'। ওটা দিয়ে নাকি মানুষের প্রশংসা সহজ-লভ্য হয় বলেই আজকালকার লেখকরা রসের চর্চা করে।

"আমার লেখা কাব্য হচ্ছে না, আমি কবি নই"—এ বদনাম সহ্য করতে হয়ত কোনো কবিই পারে না। কাজেই যারা করছিল মানুষের বেদনার পুজা, তারা এখন করতে চাচ্ছে প্রাণহীন সৌন্দর্য সৃষ্টি। এমন একটা যুগ ছিল—সে সত্যযুগই হবে হয়ত—যখন মানুষের দুঃখ আজকের মত এত বিপুল হ'য়ে ওঠেনি। তখন মানুষ নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সঙ্গে ধ্যানের তপোবনে শান্ত সামগান গাইবার অবকাশ পেয়েছে। কিন্তু যেইমাত্র মানুষ নিপীড়িত হ'তে লাগল, অমনি সৃষ্টি হ'ল বেদনার মহাকাব্য—রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড প্রভৃতি। আর তাতে সমাজের আজকালকার বেঁড়ে-উস্তাদ সমালোচকদের তথাকথিত "বীভৎস বিদ্রোহ বা রুদ্র রসের" প্রাধান্য থাকলেও তা কাব্য হয়নি, এমন কথা কেউ বলবে না।

এই বেদনার গান গেয়েই আমাদের নবীন সাহিত্য-স্রষ্টাদের জন্য নূতন সিংহাসন গড়ে তুলতে হবে। তারা যদি কালিদাস, ইয়েট্স্, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি রূপ-স্রষ্টাদের পাশে বসতে নাই পায়,—পুশ্‌কিন, দস্তয়ভস্কি, হুইট্‌ম্যান, গর্কি, যোহান বোয়ারের পাশে ধূলির আসনে বসবার অধিকার তারা পাবেই এই ধূলির আসনই একদিন সোনার সিংহাসনকে লজ্জা দেবে ; এই ত আমাদের সাধনা।

দুঃখী বেদনাতুর হতভাগ্যদের একজন হয়েই আমি বেদনার গান গেয়েছি,—সে-গানে হয়ত রূপ-রঙ্‌ ফুটে ওঠেনি আমি ভাল রংরেজ নই বলে' ; কিন্তু সেই বেদনার সুরকে অশ্রদ্ধা করবার মত নীচতা মানুষের কেমন ক'রে আসে। অথচ এই সব গালাগালির বিপক্ষে কোন প্রতিবাদও ত হ'তে দেখিনি।

আজ কিন্তু মনে হচ্ছে শত্রুর নিক্ষিপ্ত বাণে এতটা বিচলিত হওয়া আমার উচিত হয়নি আমার দিনের সূর্য ওদের শরনিক্ষেপে মুহূর্তের তরে আড়াল পড়লেও চিরদিনের জন্য ঢাকা পড়বে না—আমার এ বিশ্বাস থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এর জন্য দুঃখও করিনে। অন্ততঃ আমি ত জানি, আমার এই ত চলার আরম্ভ, আমার সাহিত্যিক জীবনের এই ত সবেমাত্র সেদিন শুরু। আজই আমি আমার পথের দাবী ছাড়ব কেন? ওদের রাজপথে ওরা চল্‌তে যদি না-ই দেয়, কাঁটার পথেই চল্‌ব সমস্ত মারকে সহ্য ক'রে। অন্ততঃ পথের মাঝ পর্যন্ত ত যাই। আমার বনের রাখাল ভাইরা যে মালা দিয়ে আমায় সাজাল, সে-মালার অবমাননা-ই বা করব কেমন ক'রে? ঠিক বলেছ বন্ধু, এবার তপস্যাই করব—পথে চলার তপস্যা।

'বিদ্রোহী'র জয়-তিলক আমার ললাটে অক্ষয় হয়ে গেল আমার তরুণ বন্ধুদের ভালোবাসায়। একে অনেকেই কলঙ্ক-তিলক ব'লে ভুল করেছে, কিন্তু আমি করিনি। বেদনা সুন্দরের গান গেয়েছি বলেই কি আমি সত্য-সুন্দরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি? আমি বিদ্রোহ করেছি—বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে,—যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন-পচা সেই মিথ্যা-সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। হয়ত আমি সব কথা মোলায়েম ক'রে বল্‌তে পারিনি, তলোয়ার লুকিয়ে তার রূপার খাপের ঝকমকানিটাকেই দেখাইনি—এই ত আমার অপরাধ। এরই জন্য ত আমি বিদ্রোহী। আমি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, সমাজের সকল কিছু কুসংস্কারের বিধি-নিষেধের বেড়া অকুতোভয়ে ডিঙিয়ে গেছি, এর দরকার ছিল মনে ক'রেই।

যাক্। আগেই বলেছি, এ কুম্ভকর্ণ-মার্কা সমাজকে জাগাতে হ'লে আঘাত দিয়েই জাগাতে হবে। একদল প্রতিক্রিয়াশীল বিদ্রোহীর উদ্ভব না

হলে এর চেতনা আসবে না। কুম্ভকর্ণের পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে বা চিমটি কেটে এর ঘুম ভাঙাবার যে-সব পলিসির উল্লেখ আছে, তা একেবারে মোলায়েম নয়। সেই পলিসিই একবার একটু পরখ ক'রে দেখুকই না ছেলেরা! এতে কি আর এমন হবে! আপনি বল্‌বেন, কুম্ভকর্ণ না হয় জাগ্‌ল ভায়া, কিন্তু জেগে সে যে রকম 'হা' টা করবে, সে 'হা' ত সঙ্কীর্ণ নয়, তখন! আমি বলি কি, তখন কুম্ভকর্ণ তাদেরই ধরে 'জলপানি' করবে, যারা তাঁর ঘুম ভাঙাতে গিয়েছিল।

এতই ত মরেছে, না হয় আরো দু'দশটা মরবে! আপনি বলবেন, ভয় ত ঐ-খানেই, বন্ধু; বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধ্‌তে এগোয় কে? আমি বলি, সে দুঃসাহস যদি আমাদের কারুর না থাকে, তা'হলে নিশ্চিন্ত হযে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে সকলে 'আস্‌হাব কাহাফে'র মত রোজ কিয়ামত তক্‌ ঘুমোতে পারেন। সমাজকে জাগাবার আশা একেবারেই ছেড়ে দিন! কারুর পান থেকে এতটুকু চূণ খস্‌বে না, গায়ে আঁচড়টি লাগ্‌বে না; তেল কুচ্‌কুচে নাদুস-নুদুস ভুঁড়িও বাড়বে এবং সমাজও সাথে সাথে জাগতে থাকবে—এ আশা আলেম সমাজ করিতে পারেন, আমরা অবিশ্বাসীর দল করিনে।

আমার কথাগুলো 'মরিয়া হইয়া'র মত শুনাবে, কিন্তু বড় দুঃখে দেখে-শুনে তেতো-বিরক্ত হয়ে এ-সব বলতে হচ্ছে। তাই ত বলি যে, 'বাবা! তোকে রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে। মরতে হয় ত এদেরই একজনের হাতে মর বেশ একটু হাতাহাতি ক'রে; তাতে সুনাম আছে। কিন্তু ঐ হনুমানের হাতে মরিস কেন? হনুমানের হাতে মরার চেয়ে বরং কুম্ভকর্ণকে জাগাতে গিয়ে মরা ঢের ভাল।' কথগুলো যখন বলি, তখন লোকে হাততালি দেয়, 'আল্লাহু আকবর' 'বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনিও করে; কিন্তু তারপর আর তাদের খবর পাইনে।

আমিও মানি, গড়ে তুলতে হলে একটা শৃঙ্খলার দরকার। কিন্তু ভাঙার কোনো শৃঙ্খলা বা সাবধানতার প্রয়োজন আছে মনে করিনে। নূতন ক'রে গড়তে চাই বলেই ত ভাঙি—শুধু ভাঙার জন্যই ভাঙার গান আমার নয়। আর ঐ নূতন ক'রে গড়ার আশাতেই ত যত শীঘ্র পারি ভাঙি—আঘাতের পর নির্মম আঘাত হেনে পচা-পুরাতনকে পাতিত করি। আমিও জানি, তৈমুর, নাদির সংস্কারপ্রয়াসী হয়ে ভাঙতে আসেনি, ওদের কাছে নূতন-পুরাতনের ভেদ ছিল না। ওরা ভেঙেছিল সেরেফ ভাঙার জন্যই। কিন্তু বাবর ভেঙেছিল দিল্লী-আগ্রা-ময়ূরাসন-তাজমহল গড়ে তোলার জন্য। আমার বিদ্রোহও 'যখন চাহে এ মন যা'র বিদ্রোহ নয়, ও আনন্দের অভিব্যক্তি সর্ববন্ধন মুক্তের —পূর্ণতম স্রষ্টার।

আপনার 'মুসলিম-সাহিত্য' কথাটার মানে নিয়ে অনেক মুসলমান সাহিত্যিকই কথা তুলবেন হয় ত। ওর মানে কি মুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্য, না মুসলিম-ভাবাপন্ন সাহিত্য? যদি সত্যিকার সাহিত্য হয়, তবে তা সকল জাতিরই হবে। তবে তার বাইরের একটা ধর্ম থাকিবে নিশ্চয়। ইস্‌লাম ধর্মের সত্য নিয়ে কাব্যরচনা চলতে পারে, কিন্তু তার শাস্ত্র নিয়ে চলবে না। ইস্‌লাম কেন, কোন ধর্মেরই শাস্ত্র নিয়ে কাব্য লেখা চলে বলে বিশ্বাস করি না। ইস্‌লামের সত্যকার প্রাণশক্তি: গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ।

ইস্‌লামের এই অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমি ত স্বীকার করিই, যাঁরা ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী নন, তাঁরাও স্বীকার করেন। ইস্‌লামের এই মহান সত্যকে কেন্দ্র ক'রে কাব্য কেন, মহাকাব্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমি ক্ষুদ্র কবি, আমার বহু লেখার মধ্য দিয়ে আমি ইস্‌লামের এই মহিমা গান করেছি। তবে কাব্যকে ছাপিয়ে ওঠেনি সে-গানের সুর। উঠতে পারেও না। তা'হলে তা কাব্য

হবে না। আমার বিশ্বাস, কাব্যকে ছাপিয়ে উদ্দেশ্য বড় হয়ে উঠলে কাব্যের হানি হয়। আপনি কি চান, তা আমি বুঝতে পারি—কিন্তু সমাজ যা চায়, তা সৃষ্টি করতে আমি অপারগ। তার কাছে এখনও—

"আল্লা আল্লা বল রে ভাই নবী কর সার।
মাজা দুলিয়ে পারিয়ে যাব ভবনদীর পার॥"

রীতিমত কাব্য। বুঝবার কোন কষ্ট হয় না, আল্লা বলতে এবং নবীকে সার করতে উপদেশও দেওয়া হ'ল, মাজাও দুল্‌ল এবং ভবনদী পারও হওয়া গেল। যাক, বাঁচা গেল!—কিন্তু বাঁচল না কেবল কাব্য। সে বেচারী ভবনদীর এ পারেই রইল পড়ে'। ঝগড়ার উৎপত্তি এইখানেই। কাব্যের অমৃত যারা পান করেছে, তারা বলে—মাজা যদি দুলাতেই হয় দাদা, তবে ছন্দ বেখে দুলাও, পারে যদি যেতেই হয়, তবে তরী একেবারে কমল বনের ঘাটে ভিড়াও। অমৃত যারা পান করেনি—আর এরাই শতকরা নিরানব্বই জন—তারা বলে, কমল বন, টমল বন জানিনে বাবা, সে যদি বাঁশবন হয়, সে-ওভি আচ্ছা—কিন্তু একেবারে ভবনদীর পারঘাটায় লাগাও নৌকা। এ-অবস্থায় কি করব বল্‌তে পারেন? আমি 'হুজ্জতুল্ ইস্‌লাম' লিখ্‌ব, না সত্যিকার কাব্য লিখ্‌ব?

এরা যে শুধু হুজ্জতুল্ ইস্‌লামই পড়ে, এ আমি বল্‌ব না; রসজ্ঞানও এদের অপরিমিত। আমি দেখেছি, এরা দল বেঁধে পড়্‌ছে—

"ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ্দ হাটিয়া চলল।"
"লাখে লাখে ফৌজ মরে কাতারে কাতার।
শুমার করিয়া দেখি পঞ্চাশ হাজার॥"

আর এই কাব্যের চরণ প'ড়ে কেঁদে' ভাসিয়ে দিয়েছে। উম্মর উম্মিয়ার প্রশংসায় রচিত—

"কাগজের ঢাল মিঞার তালপাতার খাঁড়া
আর লগির গলায় দড়ি দিয়ে বলে চল্ হামারা ঘোড়া।"

পড়্‌তে পড়্‌তে আনন্দে গদ্‌গদ হয়ে উঠেছে।

বিদ্রূপ আমি করছিনে, বন্ধু, এ আমার চোখের জল-মেশানো হাসির শিলাবৃষ্টি।

সত্য সত্যই আমার লেখা দিয়ে যদি আমার মুমূর্ষু সমাজের চেতনা সঞ্চার হয়, তা হ'লে তার মঙ্গলের জন্য আমি আমার কাব্যের আদর্শকেও না হয় খাটো করতে রাজি আছি। কিন্তু আমার এ-ভালবাসার আঘাতকে এরা সহ্য করবে কি না, সেইটাই বড় প্রশ্ন। হিন্দু লেখকগণ তাঁদের সমাজের গলদ-ত্রুটি-কুসংস্কার নিয়ে কি না কশাঘাত করেছেন সমাজকে,—তা সত্ত্বেও তাঁরা সমাজের শ্রদ্ধা হারাননি। কিন্তু এ হতভাগ্য মুসলমানের দোষ-ত্রুটির কথা পর্যন্ত বলবার উপায় নেই। সংস্কার ত দূরের কথা, তার সংশোধন করতে চাইলেও এরা তার বিকৃত অর্থ ক'রে নিয়ে লেখককে হয়ত ছুরিই মেরে বসবে। আজ হিন্দুজাতি যে এক নবতম বীর্যবান জাতিতে পরিণত হতে চলেছে, তার কারণ তাদের অসম-সাহসিক সাহিত্যিকদের তীক্ষ্ণ লেখনী।

আমি জানি যে, বাঙলার মুসলমানকে উন্নত করার মধ্যে দেশের সব চেয়ে বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এদের আত্ম-জাগরণ হয়'নি বলেই ভারতের স্বাধীনতার পথ আজ রুদ্ধ!

হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না, এ আমিও মানি। এবং আমিও জানি যে, একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এ-অশ্রদ্ধা দূর হ'তে পারে। কিন্তু ইস্‌লামের 'সভ্যতা-শাস্ত্র-ইতিহাস' এ-সমস্তকে কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার নয় কি?

আমার মনে হয়, আমাদের নূতন সাহিত্যব্রতীদল এর এক-একটা দিক নিয়ে রিসার্চ ও আলোচনার দায়িত্ব নিলে ভাল হয়। আগেই বলেছি, নিশ্চিন্ত জীবন-যাত্রার পূর্ণ শান্তি কোনোদিন পাইনি। যদি

পাই, সেদিন আপনার এই উপদেশ বা অনুরোধের মর্যাদা রক্ষা যেন করতে পারি—তাই প্রার্থনা করছি আজ।

আবার বলি, যাঁরা মনে করেন—আমি ইস্‌লামের বিরুদ্ধবাদী বা তার সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি, তাঁরা অনর্থক এ-ভুল করেন। ইস্‌লামের নামে যে কুসংস্কার মিথ্যা আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে—তাকে ইস্‌লাম বলে না-মানা কি ইস্‌লামের বিরুদ্ধে অভিযান? এ-ভুল যাঁরা করেন, তাঁরা যেন আমার লেখাগুলো মন দিয়ে পড়েন দয়া ক'রে—এ ছাড়া আমার কি বলবার থাকতে পারে।

আমার 'বিদ্রোহী' পড়ে যাঁরা আমার উপর বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠেন, তাঁরা যে হাফেজরুমীকে শ্রদ্ধা করেন—এ ও আমার মনে হয় না। আমি ত আমার চেয়েও বিদ্রোহী মনে করি তাদের। এঁরা কি মনে করেন, হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিলেই সে কাফের হয়ে যাবে? তা হ'লে মুসলমান কবি দিয়ে বাঙলা-সাহিত্য সৃষ্টি কোনো কালেই সম্ভব হবে না—জৈগুণ বিবির পুঁথি ছাড়া।

বাঙলা-সাহিত্য সংস্কৃতের দুহিতা না হলেও পালিতা কন্যা। কাজেই তাতে হিন্দুর ভাবধারা এমন ওৎপ্রোতভাবে জড়িত যে, ও বাদ দিলে বাঙলা ভাষার অর্দ্ধেক ফোর্স নষ্ট হয়ে যাবে। ইংরাজী-সাহিত্য হতে গ্রীক পুরাণের ভাব বাদ দেওয়ার কথা কেউ ভাবতে পারে না। বাঙলা-সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুরও তেমনি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মধ্যে নিত্য-প্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী; তাই তাদের এ-সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্য অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্য হানি হয়েছে। তবু আমি জেনে শুনেই তা করেছি।

কিন্তু বন্ধু, এ-কর্তব্য কি একা আমারই? আমার শক্তি সম্বন্ধে আপনার যেমন বিশ্বাস, আপনার উপরও আমার সেই বিশ্বাস—একই শ্রদ্ধা। আপনিও 'কামাল পাশা' না লিখে এই হতভাগ্য মুসলমানদের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে আরম্ভ করুন না। কেন আমার মনে হয়, ওদিকে আপনার জুড়ি নেই অন্ততঃ আমাদের মধ্যে কেউ। 'কামাল পাশা'র দরকার আছে জানি, কিন্তু তার চেয়েও দরকার—আমাদের চোখের সামনে আমাদেরই জীবনের এই ট্রাজেডি তুলে ধরা। কবিতা ও প্রবন্ধ-লেখকের আমাদের অভাব নেই। নাটক-লিখিয়ের অভাবও আপনাকে দিয়ে পূরণ হতে পারে। আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব কথা-সাহিত্যেকের এর তো কোনো আশা-ভরসাও দেখছিনে কারুর মধ্যে। অথচ কথা-সাহিত্য ছাড়া শুধু কাব্যের মধ্যে আমাদের জীবন, আমাদের আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে কেউ পারবেন না। অনুবাদের দিক দিয়েও আমরা সবচেয়ে পিছনে। সঙ্গীত, চিত্রকলা, অভিনয় ইত্যাদি ফাইন আর্টের কথা নাই বললাম।

এত অভাবের কোন্ অভাব পূর্ণ করব আমি একা, বন্ধু! অবশ্য একাই হাত দিয়েছি অনেকগুলি কাজেই—তাতে ক'রে হয়ত কোনোটাই ভাল ক'রে হচ্ছে না।

জীবন আমার যত দুঃখময়ই হোক, আনন্দের গান, বেদনার গান গেয়ে যাব আমি, দিয়ে যাব নিজেকে নিঃশেষ ক'রে সকলের মাঝে বিলিয়ে, সকলের বাঁচার মাঝে থাকব আমি বেঁচে। এই আমার ব্রত, এই আমার সাধনা, এই আমার তপস্যা।

আপনার এত সুন্দর, এমন সুলিখিত চিঠির কি বিশ্রী ক'রেই না উত্তর দিলাম। ব্যথা দিয়ে থাকি, আমার গুছিয়ে বলতে না পারার দরুণ, তা হ'লে আমি ক্ষমা না চাইলেও আপনি ক্ষমা করবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে।

আপনার বিরাট আশা, ক্ষুদ্র আমার মাঝে পূর্ণ যদি না-ই হয়, তবে

তা' আমাদেরই কারুর মাঝে পুর্ণত্ব লাভ করুক, আমি কায়মনে এই প্রার্থনা করি।

—কাজী নজরুল ইসলাম

২৬.

(১৯ ৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয়। কবি নজরুল ইসলাম সম্মেলনের উদ্বোধন করেন, সেই উপলক্ষেই "চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল" গানটি রচনা করেন। সে-সময় তিনি কিছুকাল ঢাকায় অবস্থান করেছিলেন। ঢাকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি সাহিত্য-সমাজের তৎকালীন সম্পাদক অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে এই পত্রখানি লেখেন।)

পদ্মা

২৮-২-২৮

সন্ধ্যা

(" Vulture"—ষ্টীমার)

প্রিয় মোতাহার !

আমার কেবলি মনে পড়ছে (বোধ হয় ব্রাউনিং-এর) একটা লাইন,—

How sad and bad, mad it was,—

But then, how it was sweet !

আর, মনে হচ্ছে, ছোট্ট দুটি কথা—'সুন্দর' ও 'বেদনা'। এই দুটি কথাতেই আমি সমস্ত বিশ্বকে উপলব্ধি করতে পারি।....

'সুন্দর' ও 'বেদনা', এই দুটি পাতার মাঝখানে একটি ফুল—বিকশিত বিশ্ব !....

একটি মক্ষী-রাণী, তাকে ঘিরেই বিশ্বের মধুচক্র ....

বাগানের মালি রাতদিন লাঠি নিয়ে বাগান আগ্‌লে আছে। বেচারা মানুষ তাকে ডিঙিয়ে যেতে পারে না। মৌমাছি তার মাথার ওপর দিয়ে গজল-গান গেয়ে বাগানে ঢোকে, সুন্দরের মধুতে ডুবে যায়, অফুট কুঁড়ির

কানে বিকাশের বেদনা জাগায়, প্রস্ফুটিত যে—তাকে ঝরে পড়ার গান শোনায়;—তার এতটুকু বাধে না, দেহেও না, মনেও না। বেচারা মালি—যেন অঙ্কশাস্ত্রী মশাই! হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখে, আর মৌ-মক্ষীর চরিত্রের এবং 'আরো-কত কি-'র আলোচনা জুড়ে দেয়! মৌ-মক্ষী কিছু শোনে না, সে কেবলি গান করে—সুন্দরের স্তব সে গান। তাকে মার, সে সুন্দরের স্তব করতে করতেই মরবে। কোন দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই, ভয় নেই। তাকে আবার বাঁচিয়ে ছেড়ে দাও, সে আবার সুন্দরের স্তব করবে, আবার বাগানে ঢুকে ফুলের পরাগে অন্ধ হয়ে ভগ্নপক্ষ হয়ে মরবে।

সুষমা-লক্ষ্মীর বাগান অগ্‌লে ব'সে আছে নীতিবিদ্ বুড়ো সামাজিক হিতকামীর দল,—ষ্টার্ণ, রিজার্ভ, রিজিড, ডিউটিফুল! কত বড় বড় বিশেষণ তাদের সামনে ও পেছনে! তারা সর্বদা এই "পোজ" নিয়ে ব'সে আছে যে, তারা যদি না থাকত, তা হ'লে একদিনে এই জগৎটা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত, একটা ভীষণ ওলটপালট হয়ে যেত! ....বেচারা! দেখলে দয়া হয়।

এদের মাঝেই—হয়ত কোটির মাঝে একটি—আসে সুন্দরের ধেয়ানী, কবি। সে রিজার্ভ নয়, ডিউটিফুল নয়, সে কেবলি ভুল করে, সে কেবলি falls upon the thorns of life, he bleeds! সে সমস্ত শাসন, সমস্ত বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে উঠে সুন্দরের স্তব গান করে skylark-এর মত। সে কেবলি বলে, "সুন্দর—বিউটিফুল!" মিল্টনের স্বর্গের পাখীর মত তার পা নেই, সে ধূলার পৃথিবী স্পর্শও করে না।........

কবি এবং মৌ-মক্ষী! বিশ্বের মধু আহরণ ক'রে মধু-চক্র রচনা করে গেল এরাই।

কোকিল, পাপিয়া, 'বৌ কথা-কও', 'নাইটিঙ্গেল্', বুলবুল ডিউটিফুল ব'লে এদের কেউ বদনাম দিতে পারেনি। কোকিল তার শিশুকে রেখে

যায় কাকের বাসায়, পাপিয়া তার শিশুর ভার দেয় ছাতার পাখীকে, 'বৌ-কথা-কও' শৈশব কাটায় তিতির পাখীর পক্ষপুটে! তবু, আনন্দের গান গেয়ে গেল এরাই। এরা ছন্নছাড়া, কেবলি ঘুরে বেড়ায়, শ্রী নাই, সামঞ্জস্য নাই, ব্যালেন্স-জ্ঞান নাই; কোথায় যায়, কোথায় থাকে— ভ্যাগাবণ্ড্ একের নম্বর! ইয়ার ছোক্‌রার দল! তবু এরাই ত স্বর্গের ইঙ্গিত এনে দিল, সুন্দরের বৈতালিক, বেদনার ঋত্বিক—এই এরাই, শুধু এরাই! কবি আর বুলবুল!

কবি আর বুল্‌বুল্ পাপ করে, তারা পাপের অস্তিত্বই মানে না ব'লে। ভুল—ভুলের কাঁটায় ফুল ফোটাতে পারে ব'লে।

আমার কেবলি সেই হতভাগিনীর কথা মনে পড়্‌ছে—যার ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে "ডিউটিফুল," আর পায়ের তলায় প্রস্ফুটিত শতদলের মত— "বিউটিফুল!" পায়ের তলার পদ্ম—তার মৃণাল কাঁটায় ভরা, দুদিনে তার দল ঝরে যায়, পাপড়ি শুকিয়ে পড়ে—তবু সে সুন্দর! দেবতা গ্রেট হতে পারে—কিন্তু সুন্দর নয়। তার আর-সব আছে, চোখে জল নেই।

তুমি মনে করতে পার মোতাহার—আমারি চিরজনমের কবি-প্রিয়া আমারই বুকে শুয়ে কাঁদছে তার স্বর্গের দেবতার জন্য! মনে কর—সে বলছে—আমায়—মাটীর ফুল আর তার দেবতাকে—আকাশের চাঁদ! আচ্ছা, এম্‌নি ক'রে তোমায় কেউ বল্‌লে তুমি কী করতে বল ত!

আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি এক সঙ্গে কবি এবং নজরুল। ঐ কথা শুনে কবি খুশী হয়ে উঠল—বল্‌লে—"এই বেদনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ তুমি, 'তোমায়' এর ঊর্ধ্বে, তোমার দেবতারও ঊর্ধ্বে নিয়ে যাব আমি—আমি তোমায় সৃষ্টি করব!"

কিন্তু নজরুল কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। মনে হ'ল সারা বিশ্বের অশ্রুর উৎস-মুখ যেন তার ঐ দুটো চোখ। নজরুলের চোখে জল! খুব অদ্ভুত শোনাচ্ছে, না? এই চোখের দু'ফোঁটা জলের জন্য কত চাতকীই না বুক ফেটে ম'রে গেল! চোখের সাম্‌নে!

তুমি ভাবছ—আমি কী হেঁয়ালী! কী সব বক্‌ছি—যার মাথামুণ্ডু কিছু খুঁজে পাবে না। সত্যিই পাবে না। বুকের গোলক-ধাঁধায় কখনো ঢুকেছ কি বন্ধু? ওর পথ নেই, সমাধান নেই, মাথামুণ্ডু মানে—কিছু না!

ওর মাঝে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে শিশুর মত কাঁদা ছাড়া আর কোন কিছু কর্‌বার নেই!

তুমি হয়ত পরজন্ম মান না, তুমি সত্যান্বেষী গণিতজ্ঞ। কিন্তু আমি মানি—আমি কবি।

আমি বিশ্বাস করি যে, যে আমায় এমন ক'রে চোখের জলে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে—সে আমার আজকের নয়, সে আমার জন্মজন্মান্তরের, লোক-লোকান্তরের দুখ-জাগানিয়া বন্ধু। তার সাথে নব নব লোকে এই চোখের জলে দেখা এবং ছাড়াছাড়ি।

তুমি হয়ত মনে কর্‌ছ—বেচারা শেলী, বেচারা কীট্‌স্‌, বেচারী নজরুল! কেঁদেই মর্‌ল!

রবীন্দ্রনাথ আমায় প্রায়ই বল্‌তেন, "দেখ্‌ উন্মাদ্‌. তোর জীবনে শেলীর মত কীট্‌স্‌-এর মত খুব বড় একটা tragedy আছে, তুই প্রস্তুত হ!" জীবনে সেই ট্রাজেডি দেখবার জন্য আমি কতদিন অকারণে অন্যের জীবনকে অশ্রুর বরষায় আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছি, কিন্তু আমারই জীবন রয়ে গেছিল বিশুষ্ক মরুভূমির মত তপ্ত—মেঘের ঊর্ধ্বে শূন্যের মত। কেবল হাসি কেবল গান! কেবল বিদ্রোহ! —যে বিপুল সমুদ্রের ওপর এত তরঙ্গোচ্ছ্বাস, এত ফেনপুঞ্জ, তার নিস্তরঙ্গ নিথর অন্ধকার তলার কথা কেউ ভাবে না। তাতে কত বড় বড় জাহাজ-ডুবি হ'ল সেইটেরই হিসেব রাখলে শুধু,—আর সে যে কত যুগ ধরে আপনার অতল তলায় বসে কেবলই শুক্তির পর শুক্তির বুকে মুক্তা-মালা রচনা করে গেল এবং আজ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়ে রইল তার সেই মুক্তা-মালা,—এ খবর কেউ রাখ্‌লে না!

ফরহাদ, মজনুঁ, চন্দ্রাপীড়, শাজাহান—এরা যেন এক-একটা দৈত্য-শিশু। কিন্তু স্বর্গকে আজো ম্লান ক'রে রেখেছে এরাই।—ফরহাদ পাগলটা শিরিঁর কথায় একটা গোটা পাহাড়কেই কেটে ফেল্‌লে! পাহাড়ের সব পাথর শিরিঁ হয়ে উঠ্‌ল। প্রেমিকের ছোঁয়ায় পাহাড় হয়ে উঠ্‌ল ফুলের স্তবক। পাষাণের স্তব-গান উঠ্‌ল ঊর্দ্ধে! কোথায় স্বর্গ। কোন্ তলায় রইল প'ড়ে!

লায়লি—সাধারণ মেয়ে, মজনুঁ তাকে এমন ক'রে সৃষ্টি ক'রে গেলো, যেমন ক'রে—দেবতা ত দূরের কথা, ভগবানও সৃষ্টি করতে পারে না!

শাজাহান—আরেক ফরহাদ! মোমতাজকে শিরিঁর মত অমর ক'রে গেল তাজমহলের মহাকাব্য রচনা ক'রে। তাজমহল—যেন নির্ব্বাক ভস্কারের পাষাণ-স্তব! মর্ম্মরের মহাকাব্য!

এইখানেই মানুষ স্রষ্টাকে হার মানিয়েছে!

আমি চাচ্ছিলাম এই দুঃখ, এই বেদনা। কত দেশ-দেশান্তরে, গিরি-নদী-বন-পর্ব্বত-মরুভূমি ঘুরেছি আমার এই অশ্রুর দোসরকে খুঁজতে। কোথাও "দেখা পেয়েছি"—এই আনন্দের বাণী উচ্চারিত হয়নি আমার মুখ দিয়ে।

তাই ত এবারকার তীর্থযাত্রাকে আমি বারে বারে নমস্কার করেছি। এতদিনে আমি যেন আপনাকে খুঁজে পেলাম। এবারে আমি পেয়েছি—প্রাণের দোসর বন্ধু তোমায় এবং চোখের জলের প্রিয়াকে।

আর আজ লিখ্‌তে পারলাম না বন্ধু! বালিস চেপে কি বুকের যন্ত্রণার উপশম হয়?

তোমার

নজরুল

২৭.

(অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত।)

কৃষ্ণনগর
২৫-২-২৮
বিকেল।

বন্ধু,

আজ সকালে এসে পৌঁচেছি। বড্ডো বুকে ব্যথা। ভয় নেই, সেরে যাবে এ ব্যথা। তবে ক্ষত-মুখ সারবে কিনা ভবিতব্যই জানে। ক্ষত-মুখের রক্ত মুখ দিয়ে উঠ্‌বে কিনা জানি না। কিন্তু আমার সুরে আমার গানে আমার কাব্যে সে রক্তের যে বন্যা ছুটবে তা কোনো দিনই শুকোবে না।

আমার জীবনে সবচেয়ে বড় অভাব ছিল Sadnessএর। কিছুতেই Sad হ'তে পার্‌ছিলাম না। তাই ডুবছিলাম না। কেবল ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। কিন্তু আজ ডুবেছি, বন্ধু! একেবারে নাগালের অতলতায়।

প্রতাপ-শৈবলিনী ভেসেছিল এক সাথে, তাদের কূলও মিল্‌ল। ভাসে যারা, তাদের কূল মেলা বিচিত্র নয়। কিন্তু যে ডোবে, তার আর উঠবার কোনো ভরসা রইল না।

তোমাকে দুদিনেই বুকে জড়িয়ে ধর্‌তে পেরেছি—তোমার গণিতের পাষাণ-টবে ফুলের চারা পেয়েছি ব'লে। অদ্ভুত লোক তুমি কিন্তু! নিজেকে কেবলি অসুন্দরের আড়াল দিয়ে রাখছ! তোমাকে আমার নখ-দর্পণে দেখতে পাচ্ছি। —নিঃস্বার্থ, কোমল, অভিমানী, প্রেমিক —কিন্তু সবকে গোপন ক'রে চল্‌তে চাও কেন, তোমার তৃষ্ণা আছে, কিন্তু সিডনীর মত তোমার তৃষ্ণার বারি অনায়াসে আরেক জনের মুখে তুলে দিতে পার।

৫

তুমি দেবতা! তোমাকে যদি কেউ ভুল করে, তবে তার মত ভাগ্যহীন আর কেউ নেই।........

তুমি ভাবতে পার যে, সুন্দরই যার ধ্যান, সেই নারী রাস্তায় বসে দিনের পর দিন পাথর ভাঙবে, আর তারই পাশে সমানে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে পাহারা দেবে কর্তব্যপরায়ণ স্টার্ণ একটা লোক? এবং ঐ পাথর ভাঙিয়ে লোকটা মনে করবে—সে একটা খুব বড় কাজ করছে! আর যে-কেউ তাকে দেবতা বলুক,—আমি তাকে বলি প্রাণহীন যক্ষ। অকারণে ভূতের মত রত্ন-মাণিক আগলে ব'সে আছে। সে রত্ন সেও গলায় নিতে পারে না—অন্যকেও নিতে দেবে না।

হায় রে মূঢ় নারী! তাকে চিরকাল আগলে রইল বলেই যক্ষ হ'য়ে গেল দেবতা! অঙ্কের পাষাণ-টবে ঘিরে রেখে তিলোত্তমাকে তিলে তিলে মারাই যদি বড় দেবত্ব হয়—তবে মাথায় থাক আমার সে দেবত্ব! আমি ভালোবাসলে তাকে আমার বাঁধন হ'তে মুক্তি দিই। আমি কবি, আমি জানি কী ক'রে সুন্দরের বুকে ফুল ফুটাতে হয়!

যে যক্ষ রাজকুমারীকে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে পাষাণ-পুরীতে সোনার খাটে শুইয়ে রাখলে, তার অতি স্নেহকে কি দেবত্ব ব'লে ভুল করব? হয়—তাকে মেরে ফেল, কিম্বা ছেড়ে দিয়ে বাঁচতে দাও। রূপার কাঠির যাদুতে ঘুমিয়ে রইল বলেই রাজকুমারী হয়ত যক্ষকে অভিশাপ দিলে না—হয়ত বা দেবতাই মনে করলে! কিন্তু যেদিন না-চাওয়ার পথ দিয়ে এল না-দেখা রূপকুমার, তখন কোথায় রইল 'যক্ষ'—কোথায় রইল পাষাণ-পুরী! আমার মনে হয় কি জান? ঐ দেবতার মোহ যে দিন তেপান্তরের রূপকুমারীর ঘুচবে, সেদিন সে বেঁচে যাবে—বেঁচে যাবে!

সে শুভদিনের প্রতীক্ষা ক'রেই আমি মালা গাঁথব, গান রচনা করব।—

যার কল্যাণ কামনা কর, সে যদি কোনদিন তোমার দুর্ভাগ্যবশতঃ বিষদৃষ্টিতে দেখে—তাকেই বরণ ক'রে নিও। তাকে ত্যাগ করো না। এ তোমার শুধু বন্ধুর অনুরোধই নয় আরো কিছু।

খবর দিও—সব খবর। বুকের ব্যথা হয়ত তাতে কমবে। এমন কী ইচ্ছে করছে জান? চুপ ক'রে শুয়ে থাকতে, সমস্ত লোকের সংস্রব ত্যাগ ক'রে পদ্মার ধারে একটি একা কুটীরে! হাসি-গান আহার নিদ্রা সব বিস্বাদ ঠেকছে।

তোমার ছেলেমেয়েকে চুমু দিও—তোমার বৌকে সালাম।

সেরে উঠলে জানাব। তোমার চিঠি চাই।

কয়েকটা ঝরা মুকুল দিলাম, নাও।

তোমার
—নজরুল

২৮.

(অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত।)

কৃষ্ণনগর
১-৩-২৮
বিকেল

প্রিয় মোতিহার!

তোমায় এবার থেকে মোতিহার ব'লে ডাকব। কাল সকাল সাড়ে দশটায় তোমার এবং তোমার····চিঠি পেয়েছি। কালই উত্তর দিতাম, কিন্তু পরশু রাত্তির থেকে জ্বরটা ও গলার ব্যথা বড্ডো বেড়ে উঠায় কিছুতেই বসতে পারলাম না। তোমাদের চিঠি পাওয়ার পর জ্বর আরো বেড়ে ওঠে। সমস্ত দিনরাত্তির ছিল—আজ ছেড়েছে

সকালে। জ্বর ছেড়েছে, কিন্তু গলার ব্যথা সারেনি। কথা বল্‌তে পর্য্যন্ত কষ্ট হচ্ছে—আজও উপোস কর্‌ছি। আল্লা মিঞা রোজা না-রাখার শোধ তুলে নিবেন দেখছি—আচ্ছা ক'রেই।

বড্‌ডো 'শক' পেয়েছি কাল ওঁর চিঠি পড়ে'। শরীর মন দুই অসুখ ব'লে হয়ত এতটা লাগল—হবেও বা! কেমন লাগল—জান? বাজপাখীর ভয়ে বেচারী কোকিল রাজকুমারীর ফুল-বাগানে লুকোতে গিয়ে সহসা ব্যাধের তীর বিঁধে যেমন ঘাড়মুড় দুম্‌ড়ে পড়ে, তেম্‌নি।

কাল থেকেই কোথায় পালাই কোথায় পালাই করছিল মনটা। দৈব মুখ তুলে চেয়েছে। একটু আগে দিলীপের তার পেলাম,—আমি ফিরেছি কিনা জান্‌তে চেয়েছে। এক্ষুণি তার করলাম—ফিরেছি। কাল দুপুরে কলকাতা যাচ্ছি। এখন সেখানেই দু দশদিন থাকব। অতএব তোমরা কেউ পত্র দিলে সেখানেই দিও।

আমার কলকাতার ঠিকানা,—১৫, জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ওখানে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার (musician থাকেন। যাঁকে "বাঁধন-হারা" dedicate করেছি।

এর মধ্যে তোমাদের চিঠি এসে পড়লে কলকাতায় redirected হয়ে যাবে—ব্যবস্থা ক'রে গেলাম।

তোমার অভিমান-তপ্ত চিঠি আমার যে কী ভালো লাগছে—তা আর কী বলবো! কত বারই না পড়লাম—যেন প্রিয়ার চিঠি! ভাগ্যিস্‌ তুমি মেয়ে হয়ে জন্মাওনি—নৈলে এবার তোমায়ই হয়ত ভালোবেসে ফেলতাম ঢাকা গিয়ে। এমন দর্পণের মত স্বচ্ছ, শহদের মত মিষ্টি মন কোথায় পেলে বল ত নীরস গণিত-বিদ্‌?

কাল তোমার চিঠিটা যদি না পড়তো....চিঠির সাথে,—তা হলে কি যে হ'ত আমার—তা আমি ভাবতেও পারিনে।

সে থাক। আজ যে তোমার চিঠি পাবই মনে করেছিলাম। কেন চিঠি এল না বল ত আমি রবিবারে তোমায় চিঠি পোষ্ট করেছি এখানে

সে চিঠি অন্তত মঙ্গলবার সকালে পাওয়া উচিত ছিল তোমার। দেরী হয়ে গেছিল বলে Late-fee দিয়ে পোষ্ট করতে দিয়েছিলাম। নিজে যেতে পারিনি পোষ্ট করতে—কিন্তু যাকে দিয়েছি সে ত ভুল করে না।

কাল তোমার চিঠি পাবই আশা করছি। বোধ হয় নিরাশ হব না। আর, যদি হই, কী আর করব!

তুমি ছাড়া আর কারুর চিঠি পেতে ভয় করবে আমার—যদি ঐ রকম চিঠি হয়!

তবে, ঐ এক চিঠি পেয়েই যতদূর বুঝেছি—আমায় তিনি দ্বিতীয় চিঠি দিয়ে দয়া করবেন না।

তোমার চাওয়া গানটা এবং তোমার লেখা (অগ্রদূত) চিঠিটা পাঠালাম। কপি করবার মত হাতে জোর নেই ভাই। কী যে দুর্বল হয়ে গেছি, তা ভাবতে পার না। গলার ভিতর ঘা-ই হ'ল না কি, soild কিছু খেতে পারছিনে। এর জন্যও অন্তত: কলকাতা যাওয়ার দরকার আমার। অগ্রদূতের চিঠিটা তোমার দেখা হলে পর আবার আমায় পাঠিয়ে দিও কলকাতায়। ওটার উপর তোমার কোন দাবী নেই।

বুদ্ধদেব বসুকে একটা কবিতা পাঠালাম। গজল-গানের স্বরলিপিও পাঠাচ্ছি আজকালের মধ্যে—দেখা হলে বলো।

আবুল হোসেন খুব রেগেছেন, নয়? ওর কাছে আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ো। আমি যে কেমন ক'রে ফিরে এসেছি, আমিই জানিনে।

আবুল হোসেন, মিঃ বোরা, কাজী ওদুদ প্রভৃতিকে আমার অপরাধ ক্ষমা করতে বলো।

বুদ্ধদেব খুব রেগে চিঠি দিয়েছে—কেন অমন ক'রে না বলে চলে এলাম, তা কি আমিই জানি।

আচ্ছা মোতিহার! তুমি কোনদিন কাউকে ভাল বেসেছিলে?

তখন তোমার কি মনে হ'ত ? খুব কি যন্ত্রণা হ'ত বুকে ? সে ছাড়া জগতের আর সব কিছুই কি বিস্বাদ ঠেকত তখন ?

এত সুন্দর এত কোমল—একমুঠো ফুলের মত তোমার মন—হয়তো আজো পিষ্ট হয়নি কোন বেদরদীর চরণে। তোমার চিঠি পড়ে এক এক বার হাসি পাচ্ছে, আবার খুশিও হ'য় উঠছি যে, তুমি ত পুরুষ মানুষ—তোমারই যদি এই অবস্থা হয় আমায় দেখে', ভাল লেগে'—তা হলে কোন তরুণী যদি কোনদিন ভালবাসতো আমায়, তা'হলে তার কি অবস্থা হ'ত।

তুমি একজায়গায় লিখেছ,—"মনে হয় যেন একটু দুঃখ পাচ্ছি- কিন্তু কি মধুর সে দুঃখ !" এ দুঃখ কি আমাকে পারিয়ে ? আমায় বলতে তোমার সঙ্কোচ হবে না নিশ্চয়। 'সেতুই কি শেষে জলে পড়ে গেল ?'

আচ্ছা মোতিহার ! তুমি যে দেবতার পায়ে "চুঙ্গল" (অবশ্য তোমার এ-কথাটার মানে জানি না) এবং মাথায় শিং দেখেছ—সে দেবতা কি আমিই ? আমার বন্ধুরা আমার গোঁ ও শরীর দেখে আমায় "বাবা তারকনাথের ষাঁড়" বলে গালি দেন—শত্রুরাও অন্ততঃ এই শরীরটার আর শিং দুটোর জন্যই ভয়ে জড়সড়—কিন্তু এরি মধ্যে তুমি এ-কথা জানলে কি ক'রে বল ত ! এ জানার "সোর্স" কি অন্য কেউ ? তুমি আমার শিং দেখেছ—তিনি ত আমার হয়ত দশটা মুণ্ডু বিশটা হাত দেখেছেন ! কোরানে আছে—শয়তানের চেয়ে সুন্দর ক'রে কাউকে সৃষ্টি করেননি খোদা। আমরাও বিউটিফুলের উপাসক,—জগতে সুন্দর ছাড়া—পাপ-পুণ্য-মন্দ-ভালোর খবর রাখিনে ;—কাজেই শিং যে দেখবে ফুলচন্দন দিতে এসে—তাতে আর বিচিত্র কি !

আচ্ছা, সত্যি ক'রে লিখো ত, আমি যে তোমায় চিঠি দিয়েছি—এ খবর তুমি জেনেছিলে—না দেখেছিলে ?

গত বছর এমনি দিনে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা—ঢাকায়। কিন্তু সে-বার ত তুমি অনেকটা দূরে দূরেই ছিলে। এবার কি খুব বড়

একটা দুঃখের ভিতর দিয়েই আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পেয়েছি? এ রহস্যের ত হদিস খুঁজে পাচ্ছিনে, বন্ধু! তোমরা গণিতবিদ্, ক্লিয়ার ব্রেণ তোমাদের, হয়তো এর solution খুঁজে পাবে।

"Sympathetic vibration" music এই আছে জানতাম—ওটা mathematics এ আছে জেনে mathematicsএ আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে।

আচ্ছা, telepathyটা কি Science-এর না কাব্যের? এমনি দ'একটা জায়গায় এসে—অঙ্কে-কবিতায়-বিজ্ঞানে-সুরে—হৃদয়-বিনিময় হয়ে গেছে বোধ হয়। আকাশের দিকে তাকিয়ে—এইবার নতুন ক'রে মনে হচ্ছে স্রষ্টা—গণিতবিদ্, না কবি? লোকটা এত হিসেবী অথচ এত সুন্দর। আমার বেদনা অনেকটা উপশম হয়েছে এই ভেবে' যে, অন্ততঃ এক জনের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়েছে আমার পত্রের প্রতীক্ষায় থেকে—তা হোক্ না সে পুরুষ। আচ্ছা বন্ধু, এত শক্ত মনের পুরুষ, তার কান্না পায় আমার এতটুকু অবহেলায়,—আর একজন নারী—হোক্ না সে পাষাণ-প্রতিমা—তার কিছু হয় না? কিন্তু বুঝতে পারছিনে—মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে বন্ধু, একজন নারী সে এত নিষ্ঠুর হতে পারে?

যাক্, আজ ডাকের সময় যাচ্ছে। আবার লিখব····। কলকাতাতে ঐ ঠিকানায় চিঠি দিও। তুমি আমার ভালোবাসা নাও। খোকা-খুকীদের চুমু দিও। ইতি—

তোমার

নজরুল

২৯.

(অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত।)

১৫, জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
৮-৩-২৮
সন্ধ্যা

প্রিয় মোতিহার !

পরশু বিকেলে এসেছি কলকাতা। ওপরের ঠিকানায় আছি। ওর আগেই আসবার কথা ছিল—অসুখ বেড়ে ওঠায় আসতে পারিনি।

দু'চারদিন এখানেই আছি। মনটা কেবলই পালাই পালাই করছে। কোথায় যাই ঠিক করতে পার্‌ছিনে। হঠাৎ কোন্‌দিন কোন এক জায়গায় চলে যাব। অবশ্য দু'দশ দিনের জন্য।

যেখানেই যাই—আর কেউ না পাক, তুমি খবর পাবে।

বন্ধু! তুমি আমার চোখের জলের মোতিহার', বাদল-রাতের বুকের বন্ধু। যেদিন এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর এরা সব্বাই আমায় ভুলে যাবে, সেদিন অন্ততঃ তোমার বুক ব্যথিয়ে উঠবে তোমার ঐ ছোট্ট ঘরটিতে শুয়ে—যে-ঘরে তুমি আমায় প্রিয়ার মত জড়িয়ে শুয়েছিলে। অন্ততঃ এইটুকু সান্ত্বনাও নিয়ে যেতে পার্‌ব—এ কি কম সৌভাগ্য আমার ? সেদিন তোমার শয়ন-সাথী প্রিয়ার চেয়েও হয়ত বেশী ক'রে মনে পড়বে এই দূরের বন্ধুকে। কেন এ-কথা বলছি শুনবে ?

বন্ধু আমি পেয়েছি—যার সংখ্যা আমি নিজেই করতে পারবো না। এরা সবাই আমার হাসির বন্ধু, গানের বন্ধু। ফুলের সওদার খরিদ্‌দার এরা। এরা অনেকেই আমার আত্মীয় হয়ে উঠেছে, প্রিয় হয়ে ওঠেনি কেউ!

আমার চোখের জলের বাদ্‌লা রাতে এরা কেউ এসে হাত ধরেনি। আমার চোখের জল! কথাটা শুনলে এরা হেসে কুট্‌পাট হবে!

আমার জীবনের সব চেয়ে করুণ পাতাটির লেখা তোমার কাছে রেখে গেলাম। আমার দিক দিয়ে এর একটা কী যেন প্রয়োজন ছিল!....আচ্ছা, আমার রক্তে রক্তে শেলীকে কীট্‌স্‌কে এত ক'রে অনুভব কর্‌ছি কেন? বলতে পার? কীট্‌স্‌-এর প্রিয়া ফ্যানিকে লেখা তাঁর কবিতা পড়ে মনে হচ্ছে যেন এ কবিতা আমিই লিখে গেছি। —কীট্‌স্‌-এর সোরথ্রোট হয়েছিল—আর তাতেই মর্‌লও শেষে—অবশ্য তার সোর্‌ হার্ট কি না কে বলবে!—কণ্ঠ-প্রদাহ রোগে আমিও ভুগছি ঢাকা থেকে এসে অবধি, রক্তও উঠছে মাঝে মাঝে—আর মনে হচ্ছে আমিই যেন কীট্‌স্‌। সে কোন্‌ ফ্যানির নিষ্করুণ নির্মমতায় হয়ত বা আমারও বুকের চাপ-ধরা রক্ত তেমনি ক'রে কোন্‌দিন শেষ ঝলক উঠে আমায় বিয়ের বরের মত ক'রে রাঙিয়ে দিয়ে যাবে।

তারপর হয়ত বা বড় বড় সভা হবে। কত প্রশংসা কত কবিতা বেরুবে হয়ত আমার নামে! দেশপ্রেমিক, ত্যাগী, বীর, বিদ্রোহ— বিশেষণের পর বিশেষণ! টেবিল ভেঙে ফেল্‌বে থাপ্‌পড় মেরে— বক্তার পর বক্তা।

এই অসুন্দর শ্রদ্ধানিবেদনের শ্রাদ্ধ-দিনে—বন্ধু! তুমি যেন যেয়ো না। যদি পার চুপটি ক'রে বসে আমায় অলিখিত জীবনের কোন একটি কথা স্মরণ করো। তোমার ঘরের আঙিনায় বা আশেপাশে যদি একটি ঝরা, পায়ে পেশা ফুল পাও, সেইটিকে বুকে চেপে বলো—"বন্ধু, আমি তোমায় পেয়েছি!"

আকাশের সব চেয়ে দূরের যে তারাটির দীপ্তি চোখের জলকণার মত ঝিলমিল কর্‌বে—মনে করো, সেই তারাটি আমি। আমার নামে তার নামকরণ করো। কেমন?

মৃত্যুকে এত ক'রে মনে করি কেন, জান? ওকে আজ আমার সব চেয়ে সুন্দর মনে হচ্ছে ব'লে। মনে হচ্ছে, জীবনে যে আমার ফিরিয়ে দিলে, মরণে সে আমায় বরণ ক'রে নেবে।

সমস্ত বুকটা দিনরাত ব্যথায় টন্‌টন্ করছে—মনে হচ্ছে, সমস্ত যেন ঐখানে এসে জমাট বেঁধে যাচ্ছে। ওর যদি মুক্তি হয়, বেঁচে যাবে। কিন্তু কী হবে কে জানে!

হয়ত দিব্যি বেঁচে থাক্‌ব—কিন্তু ঐ বেঁচে থাকাটা অসুন্দর ব'লেই ওকে যেন দু'হাত দিয়ে ঠেলছি। বেঁচে থাকলে হয়ত তাকে হারাব তারই বুকে তিলে তিলে আমার মৃত্যু হবে।

কেবলই মনে হচ্ছে কোন নবলোকের আহ্বান আমি শুনতে পেয়েছি। পৃথিবীর সুধা বিস্বাদ ঠেকচে যেন।....

তোমার চিঠি পেয়ে অবধি কেবলি ভাবছি আর ভাবছি। কত কথা—কত কি, তার কি কুল-কিনারা আছে?

কত কথা জানতে ইচ্ছে করে! কিন্তু কি সে কত কথা, তা বলতে পারিনে। দুদিন আগে পারতাম, আজ আর পারব না। হৃদয়ের প্রকাশ যেখানে লজ্জার কথা—হয়ত বা অবমাননাকরও, সেখানে পর্যন্ত গিয়ে পহুঁচবে আমার কাঙাল মনের এই করুণ যাচ্ঞা, এ ভাবতেও মনটা কেমন যেন মোচড় খেয়ে ওঠে!

আমার ব্যথার রক্তকে রঙীন রঙের খেলা বলে উপহাস যিনি করেন, তিনি হয়ত দেবতা—আমাদের ব্যথা-অশ্রুর বহু ঊর্ধ্বে। কিন্তু আমি মাটির নজরুল হলেও সে-দেবতার কাছে অশ্রুর অঞ্জলি আর নিয়ে যাব না।

কবির কাব্যের প্রতি এত অশ্রদ্ধা যাঁর—তাঁকে শ্রদ্ধা আমি যতই করি না কেন—পুনরায় কাব্যের নৈবেদ্য দিয়ে তাঁকে খেলো করবার দুর্মতি যেন আমার কোনদিন না জাগে।

ফুল ধূলায় ঝরে পড়ে, পায়ে পিষ্টও হয়, তাই বলেই কি ফুল এত অনাদরের? ভুল করে সে ফুল যদি কারুর কবরীতেই খসে পড়ে, এবং

তিনি সেটাকে উপদ্রব ব'লে মনে করেন, তা'হলে ফুলের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে তখনি কারুর পায়ের তলায় পড়ে আত্মহত্যা করা।

পদ্ম তার আনন্দকে শতদলে বিকশিত ক'রে তোলে বলেই কি ওটা পদ্মের বাড়াবাড়ি? কবি তার আনন্দকে কথায়-ছন্দে-সুরে পরিপূর্ণ পদ্মের মত ক'রে ফুটিয়ে রাঙিয়ে তোলে ব'লেই কি তার নাম হবে খেলো? অকারণ উচ্ছ্বাস? সুন্দরের অবহেলা সইতে পারিনে বন্ধু, তাই এত জ্বালা।

তুমি আমার "শেষ চিঠি" দেখেছ, লিখেছ। "শেষ চিঠি" লিখে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়েছ। তোমার এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব?

জল খুব তরল, সদা টলটলায়মান,—কিন্তু যে দেশের ঋতুলক্ষ্মী অতিরিক্ত cold সে দেশের জলও জমে বরফ হয়ে যায়—শুনেছ? অতিরিক্ত শৈত্যে জল জমে পাথর হয়, ফুল যায় ঝরে, পাতা যায় মরে, হৃদয় যায় শুকিয়ে ....

ভিক্ষা যদি কেউ তোমার কাছে চাইতেই আসে অদৃষ্টের বিড়ম্বনায়, তা'হলে তাকে ভিক্ষা না দাও, কুকুর লেলিয়ে দিও না যেন।........

আঘাত আর অপমান এ দুটোর প্রভেদ বুঝবার মত মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়ত আছে আমার। আঘাত করবার একটা সীমা আছে, যেটাকে অতিক্রম করলে—আঘাত অসুন্দর হয়ে ওঠে—আর তখনই তার নাম হয় অবমাননা। —গুণীও বীণাকে আঘাত ক'রেই বাজান, তাঁর অঙ্গুলির আঘাতে বীণার কান্না হয়ে ওঠে সুর। সেই বীণাকেই হয়ত আর একজন আঘাত করতে যেয়ে ফেলে ভেঙে।

মন্থনের একটা স্টেজ আসে—যাতে ক'রে সুধা ওঠে। সেই খানেই থামতে হয়। তার পরেও মন্থন চালালে ওঠে বিষ।

যে দেবতাকে পূজা করব—তিনি পাষাণ হন তা সওয়া যায়, কিন্তু তিনি যেখানে আমার পূজার অর্ঘ্য উপদ্রব বলে পায়ে ঠেলেন, সেখানে আমার সান্ত্বনা কোথায় বলতে পার?

আমার আহত অভিমানের দুঃখে তুমি ব্যথা পেয়ে কী করবে বন্ধু ? সত্যিই আমি হয়ত অতিরিক্ত অভিমানী। কিন্তু তার ত ওষধ নেই। বীণার তারের মত নার্ভগুলো সুরে বাঁধা বলেই হয়ত একটু আঘাতে এমন ঝনঝন করে ওঠে। —ছেলেবেলা থেকে পথে পথে মানুষ আমি। যে স্নেহে যে প্রেমে বুক ভরে ওঠে কানায় কানায়—তা কখনো কোথাও পাইনি। শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা—শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল ! ও নিয়ে আমি ধুয়ে খাব ? তাই হয়ত অল্পেই অভিমান হয়। বুকের রক্ত চোখের জল হয়ে দেখা দেবার আগেই তাকে গলার কাছে প্রাণপণ বলে আট্‌কিয়েছি। এক গুণ দুঃখ হলে দশ গুণ হেসে তার শোধ নিয়েছি। সমাজ রাষ্ট্র মানুষ—সকলের ওপর বিদ্রোহ ক'রেই ত জীবন কাট্‌ল !

এবার চিঠির উত্তর দিতে বড্ড্ দেরী হয়ে গেল। না জানি কত উদ্বিগ্ন হয়েছ। কী করি বন্ধু, শরীরটা এত বেশী বেয়াড়া আর হয়নি কখখনো। ওষুধ খেতে প্রবৃত্তি হয় না। কেন যেন "মরিয়া হইয়া" উঠছি ক্রমেই। বুকের ভিতর কী যেন অভিমান অসহায় বেদনায় ফেনায়িত হয়ে উঠছে। রোজ তাই কেবলি গান গাচ্ছি। ডাকের অভাব নেই। রোজ অন্ততঃ দশ জায়গা হতে ডাক আসে। কেবলি মনে হচ্ছে আমার কথার পালা শেষ হয়েছে ; এবার শুধু সুরে সুরে গানে গানে প্রাণের আলাপন।........

কাল একটি মহিলা বল্‌ছিলেন, 'এবার আপনায় বড্ড্ নতুন নতুন দেখাচ্ছে—যেন পাথর হয়ে, গেছেন ! সে হাসি নেই। সে কথার খই ফুট্‌ছে কই মুখে ? বেশ ভাবুক ভাবুক দেখাচ্ছে কিন্তু !"........

আচ্ছা ভাই মোতিহার, বলতে পারিস্—তোর ফিজিক্‌স্ শাস্ত্রে আছে কি না জানিনে—আকাশের গ্রহতারার সাথে মানুষের কোনো relation আছে কি না। সত্যিই তারায় তারায় বিরহারা তাদের প্রিয়ের আশায় অপেক্ষা করে ?

আমায় সবচেয়ে অবাক করে নিশীথ রাতের তারা। তার শব্দহীন উদয়াস্ত ছেলেবেলা থেকে দেখি আর ভাবি। তুমি হয়ত অবাক হবে, আমি আকাশের প্রায় সব তারাগুলিকে চিনি। তাদের সত্যিকার নাম জানিনে, কিন্তু ওদের প্রত্যেকের নামকরণ করেছি আমার ইচ্ছা-মত। সে কত রকম মিষ্টি মিষ্টি নাম, শুনলে তুমি হাসবে। কোন্ তারা কোন্ ঋতুতে কোন দিকে উদয় হয়, সব বলে দিতে পারি। জেলের ভিতর যখন সলিটারি-সেলে বন্ধ ছিলাম—তখন গরমে ঘুম হ'ত না। সারারাত জেগে কেবল তারার উদয়াস্ত দেখতাম—তাদের গতিপথে আমার চোখের জলে বুলিয়ে দিয়ে বলতাম—"বন্ধু! ওগো আমার নাম-না-জানা বন্ধু! আমার এই চোখের জলে পিচ্ছিল পথটি ধরে তুমি চলে যাও অস্তপারের পানে, আমি শুধু চুপটি করে দেখি!" হাতে থাকত হাতকড়া—দেয়ালের সঙ্গে বাঁধা, চোখের জলের রেখা আঁকা থাকত বুকে মুখে—বালুচরে ক্ষীণ ঝর্ণাধারার চলে যাওয়ার রেখা যেমন ক'রে লেখা থাকে।

আজও লিখছি—বন্ধুর ছাদে ব'সে। সব্বাই ঘুমিয়ে। তুমি ঘুমুচ্ছ প্রিয়ার বাহুবন্ধনে। আরো কেউ হয়ত ঘুমুচ্ছে—একা—শূন্য ঘরে কে যেন সে আমার দূরের বন্ধু—তার সুন্দর মুখে নিবু নিবু প্রদীপের ম্লান রেখা প'ড়ে তাকে আরো সুন্দর আরো করুণ ক'রে তুলেছে—নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের তালে তালে তার হৃদয়ের ওঠাপড়া যেন আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি—তার বাম পাশের বাতায়ন দিয়ে একটি তারা হয়ত চেয়ে আছে— গভীর রাতে মুয়াজ্জিনের আজানে আর কোকিলের ঘুম-জড়ানো সুরে মিলে তার স্তব করছে—"ওগো সুন্দর! জাগো! জাগো! জাগো!"

আচ্ছা বন্ধু, ক'ফোঁটা রক্ত দিয়ে এক ফোঁটা চোখের জল হয়—তোমাদের বিজ্ঞানে বলতে পারে? এখন কেবলি জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে—যার উত্তর নেই, মীমাংসা নেই সেই সব জিজ্ঞাসা।

যেদিন আমি ঐ দূর তারার দেশে চ'লে যাব—সেদিন তাকে ব'লো

এই চিঠি দেখিয়ে—সে যেন দুটি ফোঁটা অশ্রু অর্পণ দেয় শুধু আমার নামে! হয়ত আমি সে দিন খুশীতে উল্কা ফুল হয়ে তার নোটন-খোঁপায় ঝ'রে পড়ব।

তাকে বলো বন্ধু, তার কাছে আমার আর চাওয়ার কিছু নেই। আমি পেয়েছি—তাকে পেয়েছি—আমার বুকের রক্তে, চোখের জলে। বড্ড্ ঝড় উঠেছিল মনে, তাই দু'টা ঝাপটা লেগেছে তার চোখে মুখে। আহা! সুন্দর সে, সে সইতে পারবে কেন এ নিষ্ঠুরতা? সে লতার আগায় ফুল, সে কি ঝড়ের দোলা সইতে পারে? দখিনের গজল-গাওয়া মলয় হাওয়া পশ্চিমের প্রভঞ্জনে পরিণত হবে—সে কি তা জান্‌ত? ফুল-বনে কি ঝড় উঠতে আছে?

বলো বন্ধু, আমার সকল হৃদয় মন তারি স্তবগানে মুখরিত হয়ে উঠেছে। আমার চোখে মুখে তারই জ্যোতি—সুন্দরের জ্যোতি—ফুটে উঠেছে। পবিত্র শান্ত মাধুরীতে আমার বুক কাণায় কাণায় ভরে উঠেছে—দোল্ পূর্ণিমার রাতে বুড়িগঙ্গায় যেমন ক'রে জোয়ার এসেছিল তেমনি ক'রে। আমি তার উদ্দেশ্যে আমার শান্ত স্নিগ্ধ অন্তরের পরিপূর্ণ চিত্তের একটি সশ্রদ্ধ নমস্কার রেখে গেলাম। আমি যেন শুন্‌তে পাই, সে আমায় সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছে। আমার সকল দীনতা সকল অত্যাচার ভুলে আমাকে আমারো উর্ধ্বে সে দেখতে পেয়েছে—যেন জানতে পাই। ভুলের কাঁটা ভুলে গিয়ে তাঁর উর্ধ্বে ফুলের কথাই যেন সে মনে রাখে।

সত্যিই ত তা'র—আমার সুন্দরের—চরণ ছোঁয়ার যোগ্যতা আমার নেই। আমার যে দু'হাত মাখা কালি। বলো, যে কালি তার রাঙা পায়ে লেগেছিল, চোখের জলে তা ধুয়ে দিয়েছি।

আর—অগ্রদূত! বন্ধু! তোমায়ও আমি নমস্কার—নমস্কার করি। তুমি আমার ভাবালোকের ছায়াপথ। তোমার বুকেই পা ফেলে আমি আমার সুন্দরের ধ্রুব-লোকে ফিরে এসেছি। তুমি সত্যই সেতু, আমার স্বর্গ ওপারের সেতু।

ভয় নেই বন্ধু, তুমি কেন এ ভয় করেছ যে, আমি তার নারীত্বের অবমাননা করব। কিন্তু তুমি ভুলে গেছ যে—আমি সুন্দরের ঋত্বিক। আমি দেবতার বর পেলাম না ব'লে, অভিমান ক'রে দুদিন কেঁদেছি বলেই কি তাঁর অবমাননা করব? মানুষ হলে হয়ত পারতাম। কিন্তু বলেছি ত বন্ধু, যে, কবি মানুষের হয় ঊর্ধ্বে অথবা বহু নিম্নে। হয়ত নিম্নেই। তাই সে ঊর্ধ্বে স্বর্গের পানে তাকিয়ে কেবলি সুন্দরের স্তবগান করে।

আমি হয়ত নীচেই পড়ে থাকব; কিন্তু যাকে সৃষ্টি করব—সে স্বর্গেরও ঊর্ধ্বে—আমারও ঊর্ধ্বে উঠে যাবে। তারপর আমর মুক্তি।

সে যদি আমার কোনো আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে, তা'হলে তা'কে বলো—আমি তা'কে প্রার্থনার অঞ্জলির মত এই করপুটে ধ'রে তু'লে ধরতে—নিবেদন করতেই চেয়েছি—বুকে মালা ক'রে ধরতে চাইনি। দুর্বলতা এসেছিল. তাকে কাটিয়ে উঠেছি। সে আমার হাতের অঞ্জলি, button-hole-এর ফুল-বিলাস নয়।........

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে আবার লিখ্‌ছি। কিন্তু আর লিখ্‌তে পারছিনে ভাই। চোখের জল কলমের কালি দুই শুকিয়ে গেল।

তোমরা কেমন আছ জানিয়ো। তার কিছু খবর দাও না কেন? না, সেইটুকুও নিষেধ করেছে? সময়মত ওষুধ খায় ত?

কেবলি কীট্‌সকে স্বপ্ন দেখ্‌ছি—তার পাশে দাঁড়িয়ে ফ্যানি ব্রাউন। পাথরের মত। ভালোবাসা নিও। ইতি—

তোমার—

নজরুল

৩০.

(আবদুল কাদিরকে লিখিত)

৮।১, পান বাগান লেন,
ইণ্টালী, কলিকাতা।
২-১-২৯

কল্যাণীয়েষু,

তোমায় চিঠি লিখছি দেখে তোমার চেয়ে বিস্মিত আমিই বেশী হচ্ছি। চিঠি না লেখাটাই মুখস্থ হয়ে গেছে, কাজেই ওটাকে যখন দায়ে পড়ে হস্তস্থ করতে হয়, তখন হাতের চেয়ে মনটাই বেশী বিব্রত হয়ে পড়ে।

আমি চিঠি-পত্তর দিইনে বলে তোমাদের অভিমান যদি কখনো হয়, তা হলে অন্ততঃ এইটুকু ভেবে সান্ত্বনা লাভ করো যে, আমার চিঠি পায় ব'লে কেউ আমার সুনাম ঘোষণা করেনি কোনোদিন! রবিবাবু চিঠি পেয়েই তার উত্তর দিয়ে ভদ্রতা রক্ষা করেন, তিনি মস্ত বড় কবি। আমি চিঠি পেয়ে তার উত্তর না দিয়েই আমার অভদ্রতার প্রিন্সিপ্‌ল্‌ রক্ষা করি। আমি মুসাফির কবি। ভদ্রতা, সৌজন্য, স্নেহ, প্রীতির খাতির কোনদিনই করিনি। এই যা সান্ত্বনা। রবিবাবুকে চিঠি দিয়ে লোকে ভাবে, উত্তর এল ব'লে। আমাকে চিঠি দিয়ে কারুর অশোয়াস্তির আশঙ্কা নেই; সে দিব্যি নিশ্চিন্ত থাকে, তার চিঠির উত্তর কোনদিনই পাবে না।

ব্যবসাদারীর কথাটা আগে বলি নিই, তারপর কবির অকাজের কথা হবে।

এতদিন আমার পাবলিশাররাই আমায় ঠকিয়ে এসেছে। আমার বোধোদয় হয়েছে, তাই মনে করেছি—এবার তার শোধ নেব। এবার থেকে বইগুলো নিজেই প্রকাশ করব। 'চক্রবাক' নাম দিয়ে আমার

একখানা কবিতার বই ছাপাতে দিয়েছি। তারির বিজ্ঞাপন পাঠালাম পাঁচখানা তোমার কাছে। তুমি (১) "জাগরণে" (২) "সঞ্চয়ে" (৩) "আলফারুকে" (৪) "আমানে" ও (৫) "আজাদে" গিয়ে দিয়ে এস। যেন তাঁরা তাঁদের কাগজে প্রকাশ করেন। আমি আমার সাধ্যমত তাঁদের কবিতা দিয়ে সাহায্য করব—যদি তাঁরা সাহায্য করেন। ঐ কাগজের সম্পাদকদের আলাদা আলাদা চিঠি দিতে পারলাম না সময়ের ও ধৈর্যের অভাবে। তোমার মারফতেই আমার অনুরোধ জানাচ্ছি সম্পাদক সাহেবানদের।

তুমি ত ফেল করতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছ জসীমের সাথে, কাজেই এই হাটাহাটি করিয়ে তোমার পড়ার ক্ষতি করতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই। আশা করি, এবারও পাশ না করার জন্য তুমি চেষ্টার ত্রুটি করছ না।

ডিগ্রী যদি নাই পাও, অন্ততঃ তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। ডিগ্রীটা থাকে শেষের দিকে, অর্থাৎ ওটা ন্যাজের সামিল। আর ও জিনিষটা অর্জন করার জন্য গর্ব আর যাঁরাই করুন আমি পাইনি ব'লে বিধাতাকে তার জন্য ধন্যবাদ দিই। ন্যাজ নিয়ে গর্ব করবার মতো বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়নি আমার। আমি মানুষের স্তরে উঠে গেছি; আমি নির্লাঙ্গুল।

তোমার কাব্য-সাধনা তোমায় যে ডিগ্রী দান করেছে বা দেবে, তা হবে তোমার মাথার অলঙ্কার—শিরোপা। ঐটাই তোমার সত্যিকার গর্ব করবার জিনিস।

তুমি আর জসীম যেন একই নদীর জোয়ার-ভাঁটা, একই স্রোতের রকম-ফের।

একটু উপদেশের ঢিল ছুড়ব? তুমি আজকের মানুষকে খুশী করতে গিয়ে কালকের অনাগতদের অসম্মান অর্জন করো না যেন! ঐ রোগে আমার যে সর্বনাশ করেছে, তার ক্ষতিপূরণ বুঝি সারা জীবনেও হবে না। বহুদিন আনন্দলোকের দ্বারে বসে কনসার্টই

বাজিয়েছি হাতের বাঁশী ফেলে। তাতে বুকের ব্যথা বেড়েছে বৈ কমেনি। আজ সেই ব্যথার কথাই যখন সুরের সূতোয় গাঁথলাম, তখন ব্যথাও যেমন কমেছে, ক্ষতটাও তেমনি মালায় ঢাকা পড়েছে। আমার চোখের জলে সকলের চোখের জল এসে মিশেছে। আমার বেদনা-লোক তীর্থলোকে পরিণত হয়েছে। সরব হাততালির লোভের চেয়ে নীরব চোখের জলের অর্ঘ্য তোমার কাম্য হোক—এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার নেই। তোমাদের দেখে কত আশাই না পোষণ করি! মনে হয়, আমার গান থামলেও গানের পাখীর অভাব হবে না এই নতুন বুলবুলিস্তানে।

আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের সঙ্গে আলাপ হলো—অনেক কথা। তার মনটাই বড় রত্ন। আর্শির মতো স্বচ্ছ। আর আর খবর দিও।

ইতি—

শুভার্থী

নজরুল ইসলাম

P. S. কংগ্রেসে আসনি, ভালই করেছ। কংগ্রেস চৌত্রিশ ঘোড়ার রাজাকে এনে পেয়েছে চৌত্রিশ ঘোড়ার ডিম! দেখা যাক, স্বরাজের কেমন বাচ্চা বেরোয়!

৩১.

(বেগম শামসুন্ নাহার মাহমুদকে লিখিত)

8/1, Pan Bagan Lane
Calcutta
4-2-29.

চিরআয়ুষ্মতীসু!

ভাই নাহার! কাল ঠাকুরগাঁও (দিনাজপুর) থেকে এসে তোমার চিঠি পেলাম। পেয়ে যেমন খুশী হলাম, তেমনি

একটু অবাকও হলাম। খুশী হলাম তার কারণ, আমি তোমায় চিঠি দিইনি এসে, দিয়েছি বাহারকে। অসম্ভাবিতের দেখা সকলের মনেই একটু দোলা দেয় বই-কি! অবাক হলাম, আমাদের দেশে বিশেষ ক'রে আমাদের সমাজের কোন কোন বিবাহিতা মেয়ে একজন অনাত্মীয়কে (আমি রক্তের সম্পর্কের কথা বলছি ভাই, রেগো না যেন এ কথাটাতে!) চিঠি লিখতে সাহস করে, তা' সে যত সহজ চিঠিই হোক। তা'ছাড়া, তুমি স্বভাবতঃই একটু অতিরিক্ত SHY বা Timid.

সত্যি বলতে কি, তোমার চিঠি পেয়ে বড্ড্ বেশী আনন্দিত হয়েছি।

সলিম কি ফিরেছে? ওরা অর্থাৎ বাহার, সলিম কখন আসবে কলকাতায়?

সাতই তারিখে চিঠি দিয়েছ এবং লিখেছ, 'কালই কবিতাগুলো পাঠাব'। আজ চৌদ্দ তারিখ। আমার মনে হয় তোমার 'কাল' হয়তো কোন অনাগত দিনকে লক্ষ্য ক'রে লিখিত হয়েছিল, যার কোন বাঁধা-ধরা তারিখ নেই!

আমি জানি তোমার শরীর কি রকম ভেঙে গেছে, এর ওপর যদি ওসব রাবিশের তোমাকেই নকল-নবীশ হতে হয় তা' হলে আমার দুঃখের আর অবধি থাকবে না। একটু পড়তেই তোমার মাথা ধরে, আর লিখতে গেলে মাথা হাত-পা সবগুলো হয়তো conspiracy ক'রে ধরবে। আমার অগতির গতি মেতু মিয়া তো আছেন। তাঁকে দিয়েই না হয় কপি করিয়ে পাঠিয়ে দাও। নইলে ফাল্গুনের কাগজে দেওয়া যাবে না।

কপি প্রেসে দিতে পারছি না লেখাগুলোর জন্যে। বাহারকে আর বলব না। আশা করি তোমায় এ-ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকব। তুমি একটু আদেশ দিয়ে মেতু মিয়া, হুক্কা মিয়া এণ্ড কোম্পানীকে দিয়ে এটা করিয়ে নিও।

দুপুরটা তোমার বাচ্চা-ই-সাক্কাওর জন্যে কেমন যেন উদাস উদাস ঠেকে। ঐ সময়টুকু এক মুহূর্তের জন্য সে আমায় সব ভুলিয়ে দিত! ওকে আদর জানিয়ো আমার।

নানী আম্মার কান্নার কাণায় ভাটির জলের দাগ পড়েছে হয়তো এতদিনে। ওঁকে ব'লো আবার জোয়ারের জন্য প্রতীক্ষা করতে। আমার সাম্পানের সব গান আজও লেখা হয়নি। আমার খেয়াপারের শেষ গান হয়তো তিনি শুনে যাবেন।

কলকাতার ঘেরা-টোপে ঘেরা খাঁচায় বন্দী হয়ে নব ফাল্গুনের উৎসব দেখতে পাচ্ছিনে চোখ দিয়ে, কিন্তু মন দিয়ে অনুভব করছি। নীলা আকাশ তার মুখচোখ বোধ হয় একটু অতিরিক্ত ধোওয়া-মোছা করছে, কেননা তার মুখে যখন তখন সাবানের ফেনা—সাদা মেঘ ফেঁপে উঠতে দেখছি। তার ফিরোজা উড়নী বনে বনে লুটিয়ে পড়ছে। মাধবী লতায় পুষ্পিত বেণী, উড়ন্ত ভ্রমরের সারিতে আঁখি-পল্লব, পায়ের কাছে দীঘিভরা পদ্ম। সমস্ত মন খুশীতে বেদনায় টলমল করছে।

রোজায় বোধ হয় আর কোথাও যাচ্ছিনে। তবে বলতেও পারিনে ঠিক ক'রে।

আম্মা কখন নোয়াখালি যাচ্ছেন হবু বউ দেখতে? ভাল দিনখন দেখে পাঠিও। মহী খুব গলা সাধছে, না? অর্থাৎ আমি চলে এলেও আমার ভূত এখনও চড়াও ক'রে আছে?

আমার বন্ধু সিন্ধু, কর্ণফুলীর খবর তো তুমি দিতে পারবে না, তবে 'গুবাক তরুর সারি'র খবর নিশ্চয় দিতে পারবে। ওরা যেন কত শুকিয়ে গেছে, ওদের আঁখিপল্লবে হয়তো আজকাল একটু অতিরিক্ত শিশির ঝরে, বাতাসে হয়তো একটু বেশী ক'রে শ্বাস ফেলে। মনের চক্ষে ওদের আমি দেখি আর কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে উঠি। তোমাদের পাড়ার ফাল্গুনী কোকিলরা হয়তো ভোরে তেমনি কোলাহল ক'রে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। এতদিনে হয়তো আমের শাখাগুলি মুকুলে মুকুলে

নুয়ে পড়েছে, গন্ধে তোমাদের আঙিনা ভারাতুর হয়ে উঠেছে। আমি যেন এখান থেকেই তার মদগন্ধ পাচ্ছি।

আমার বুক-ভরা স্নেহাশীস্ নাও। নানীআম্মা, আম্মা প্রভৃতিকে সালাম; অন্য সকলকে ভালবাসা, শুভাশিস্ দিও। ইতি—

তোমার—'নূরুদা'

৩২.

(আজিজুল হাকিমকে লিখিত।)

১১, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট
কলিকাতা
৫।১০।২৯

কল্যাণীয়েষু—

এই মাত্র তোমার চিঠি ও কবিতা পেলাম। কবিতাটি 'সওগাতে' দিলাম।

আমি চিঠির উত্তর দিইনে কারোর, এ বদনামটা কায়েম হয়ে গেছে। সময়ের অভাব বলেই দিতে পারিনে। পলিটিক্স, কাব্য, গান, আড্ডা ইত্যাদির চাপে আমার ভদ্রতার ভাদ্র-বধূ বহুদিন হ'ল ঘোমটা টেনে ঘরের কোণ নিয়েছে।

তোমার কবিতা মাঝে মাঝে দেখছি 'মোহাম্মদী'তে। দু'একটা খুবই ভাল লেগেছে। ছন্দ ও ভাষা দুই ঘোড়াকেই তুমি বেশ আয়ত্ত করেছ। ভাবের নীহারিকা-লোক তোমার উজ্জ্বল গ্রহ হয়ে দেখা দেয়নি বলে অধৈর্য হয়ো না। ও দানা বাঁধতে একটু সময় লাগবে হয়তো।

তোমার সামনে আজো বিপুল ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে, অসীম শূন্য তোমার চারপাশে, তোমার স্বপ্ন-লোকের নীহারিক-পুঞ্জ আজো বাষ্পাতুর। ওই ভালো, আমি হয়ে উঠার চেয়ে সম্ভাবনাকে বেশী ভালোবাসি।

আমি এসেছি হঠাৎ ধূমকেতুর মত, হয়তো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এ বিস্ময় থাকবে না বেশী দিন। ধূমকেতু যেমন সাহসা আসে, তেমনি সহসা চলে যায়। তোমরা আমাদের আকাশের অনাগত জ্যোতিষ্ক, গ্রহপুঞ্জ, তোমরা যেদিন রূপ ধরে উঠবে, সেদিন তোমাদের আড়াল ক'রে থাকার কোন প্রয়োজন হবে না এ ধূমকেতুর। আমার সমস্ত লেখার কামনায় শুধু এই প্রার্থনাই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—তোমরা এস অনাগত কবির দল, আমি ঘুম ভঙিয়ে দিয়ে গেলাম, তোমরা ভোরের পাখী, তাদের গান শুনোয়।

জসীম, কাদির প্রভৃতিকে আমি ভালোবাসি আমারও চেয়ে। আজ হতে তুমি তাদেরই একজন হলে যাদের আমি ভালোবাসি। সব সময় খবর যদি না-ই নিতে পারি, মনে রাখব। আমার আন্তরিক শুভাশীষ ও স্নেহ গ্রহণ করো! ইতি—

শুভার্থী

নজরুল ইসলাম

৩৩.

(মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ বাহারকে লিখিত)

চির-স্নেহাস্পদেষু,

প্রিয় বাহার! তোমার কাছে "সাত ভাই চম্পা"র যে কবিতাগুলি ছিল—শ্রীমান কাদিরকে তা দিও। জেলে গেলে দেখা ক'রো সেখানে গিয়ে। নাহার কোথায়? তার খোকা কেমন আছে? ইতি।

শুভার্থী—

নজরুল ইসলাম

২০-১২-৩০

৩৪.

(১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ও ৬ই নভেম্বর সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক জনাব এম্. সেরাজুল হককে লিখিত।)

কলিকাতা
৩০শে আশ্বিন, ১৩৩৯।

জনাব সম্পাদক সাহেব,

আপানারা আমাকে অনাগতের আগমনী গাইতে আমন্ত্রণ করেছেন; আমি অযোগ্য, তবুও আহ্বান করেছেন। সেজন্য মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

বিশ্ব জুড়ে আজ মহাজাগরণ। শিক্ষা ধর্মের নব নব স্ফুরণ। অভ্যুত্থানের বজ্রবিষাণ দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত। বিশ্ব-ব্যাপী মহা-জাগরণের এই প্রদীপ্ত প্রভাতে বাঙ্‌লার মুসলিম তরুণেরা কি মোহ-নিদ্রায় মোহাচ্ছন্ন হয়েই থাকবে? ধর্ম অধর্মের অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মহাসংঘর্ষের এই মহাসন্ধিক্ষণে তৌহিদের শান্তি-সাম্য-ঐক্য-মন্ত্রে সে কি ক্লান্ত-শ্রান্ত-ভ্রান্ত মানব-চিত্তের অবসন্নতা বিদূরিত করবে না? জাতি ও কওমকে ধর্মপথে—সেরাতুল মুস্তাকীমে—পরিচালিত সংঘবদ্ধ করতে প্রয়াস পাবে না? তরুণ বন্ধুরা কি মহা-কোরানের মহাবাণী "কুম্ বে-ইজ-নিল্লাহ"—ওঠো-জাগো, এ বাণী ভুলে গিয়েছে? আমি তো দিব্য-চোখে দেখতে পাচ্ছি, ঐ স্বর্গের দুয়ারে দাঁড়ায়ে আমাদের কীর্তিমান পুর্বপুরুষগণ আকুল প্রাণে আমাদের কর্মের দিকে চেয়ে রয়েছেন। তরুণদের মন-মন্দিরে তৌহিদের রুদ্রানল প্রজ্বলিত হউক। বাবর, হুমায়ুন, শাহজাহান, সালাহউদ্দীন, খালিদ, তারিক, মুসা, হাঞ্জেলা, ওকবার সাধনা তাদের কর্মে রূপলাভ করুক। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, পরবশ্যতার প্রাচীন প্রাচীর চূর্ণ ক'রে বাঙলার মুসলিম তরুণেরা জ্ঞান, চরিত্র, নীতি, সখ্য ও মনুষ্যত্বের পথে কাতারবন্দী হউক—এই আশা অন্তরে পোষণ ক'রেই আপনাদের নির্ধারিত দিনে আমন্ত্রণ গ্রহণ করছি। আপনাদের চেষ্টায় যুবকেরা নবজেন্দেগীর পথে অগ্রসর হোক—সকলের সাধনার জয়যাত্রা সাফল্য লাভ করুক, এই কামনা।

৩৫.

(এম. সিরাজুল হককে লিখিত।)

কলিকাতা

২, নভেম্বর ১৯৩২

জনাব সম্পাদক সাহেব,

তস্‌লিম! আপনাদের নেতা আসাদ-উদ্দৌলা শিরাজীর মারফৎ আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ পেলাম। যে সময় সারা বাঙ্‌লা দেশ আমার বিরুদ্ধে সেই সময় এই বিদ্রোহীকে আপনারা তরুণদের পথ প্রদর্শনের জন্য ডেকেছেন। ধন্য আপনাদের সাহস!

'ধূমকেতু'র সারথী-রূপে নয়—যুদ্ধের ময়দান হতেই তারুণ্যের নিশান-বর্দার আমি। তাই ছুটে এসেছি দেশবাসীর পাশে। আজাদী অনাগত—তারই আগমনী গাওয়া ও তা হাসিল করাই বিপ্লবীর প্রাণের লক্ষ্য। আপনারা লক্ষ্যপথ ধরে যাত্রা করুন। কোন বিঘ্নই সে-পথে দাঁড়াতে সক্ষম হবে না। দেশ গোলামীর জিঞ্জির হতে মুক্ত হোক! মুক্ত-প্রাণে মুক্ত-বাতাসে যেদিন মুক্তির গান গাইতে পারব, সেই দিন হবে আমার অভিযানের শেষ। আপনারা জন কয়েক তরুণ আমার সহযাত্রী হচ্ছেন, এ জন্য আমি একান্ত আশান্বিত। আজ যদিও চারদিকে বিপ্লব বিভীষিকা—অনাদর অকৃতজ্ঞতা দেখা দিয়েছে—তবুও পিছপা হবার কিছু নেই। প্রতিভা, মণীষা, পাণ্ডিত্য, ত্যাগ ও সাধনার মূল্য একদিন সমাজ দেবেই। গায়ক আববাসউদ্দীনও আপনাদের আমন্ত্রণ কবুল করেছেন। ইনশাল্লাহ্ ৫ই নভেম্বর ভোরের ট্রেণে সিরাজগঞ্জ বাজার ষ্টেশনে পৌঁছব।

৩৬.

(নারায়ণগঞ্জ সঙ্গীত-সংসদের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিকে লিখিত।)

৩৯, সীতানাথ রোড
কলিকাতা
২৩-৮-৩৩

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীমান আজিজুল হাকিমের মারফৎ আপনাদের প্রস্তাব-মত নিম্ন-লিখিত সর্ত্তে আমরা ছয়জন আর্টিষ্ট নারায়ণগঞ্জ যাইতে রাজী হইয়াছি।

প্রথম সর্ত্ত :—আপনি আমাদিগকে ১২০০৲ টাকা (বার শত টাকা) দিবেন। ঐ টাকায় আমরা নারায়ণগঞ্জে আগামী ১৪ই ও ১৫ই সেপ্টেম্বর দুই রাত্রি গান করিব।

দ্বিতীয় সর্ত্ত :—আপনারা আগামী ১০ই সেপ্টেম্বরেব মধ্যে অর্ধেক টাকা অর্থাৎ ৬০০৲ (ছয় শত টাকা) অগ্রিম পাঠাইয়া দিবেন এবং বাকী ছয় শত টাকা (৬০০৲) প্রথম রাত্রি অর্থাৎ ১৪ই সেপ্টেম্বর গান হইয়া যাওয়ার পরেই পরিশোধ করিবেন। ঐ বাকী টাকা পাইলে তবে দ্বিতীয় রাত্রি আমরা গান করিবার জন্য বাধ্য থাকিবে।

তৃতীয় সর্ত্ত :—আপনি আমাদের যাওয়া আসার সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়া দিবেন। পথে ও নারায়ণগঞ্জে খাওয়া দাওয়ার সমস্ত খরচ আপনাকে বহন করিতে হইবে।

৪র্থ সর্ত্ত :—নিম্নলিখিত ছয় জন আর্টিষ্টের মধ্যে যদি কেহ অসুস্থ হইয়া যাইতে অসমর্থ হন, আমরা তাঁহার পরিবর্তে অন্য আর্টিষ্ট লইয়া যাইব—অবশ্য আপনাদের মত লইয়া।

৫ম সর্ত্ত :—আপনি যদি কোন কারণে, আমাদের সহিত চুক্তি করিয়া সে চুক্তি ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে

হইবে। আমরাও চুক্তি ভঙ্গ করিলে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিব। ইহাই হইল মোটামুটি সর্ত্ত। আপনার অন্য কোনো কিছু জানাইবার থাকিলে পত্র দিয়া জানাইবেন। আপনার সুবিধামত অন্য তারিখেও, —অবশ্য সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে—আমাদেব যাইতে আপত্তি নাই।

আমরা নিম্নলিখিত ছয় জন আর্টিষ্ট যাইব :—

১। অন্ধ গায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে। ২। শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দাস। ৩। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার। ৪। আব্বাস উদ্দীন আহমদ। ৫। শ্রীরামবিহারী শীল (সঙ্গতিয়া)। ৬। কাজী নজরুল ইসলাম।

আপনার পত্র ও সম্মতি পাইলে আপনার লিখিত-মত চুক্তি-পত্র সহি করিয়া পাঠাইয়া দিব। ইতি—

বিনীত—

নজরুল ইসলাম

৩৭.

(মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকাকে লিখিত)

৩৯, সীতানাথ রোড

কলিকাতা

৩-৯-৩৫

কল্যাণীয়াসু!

যে কোনোদিন সন্ধ্যা সাতটার পর আসতে পারেন। আমি সাধারণতঃ সন্ধ্যার পর বাড়ীতেই থাকি। আসবার দিন খবর দিয়ে এলে ভাল হয়। ইতি।

শুভার্থী—

নজরুল ইসলাম

৩৮.

(কবি এই পত্রখানি তাঁর চাচা কাজী কায়েম হোসেন সাহেবকে ইংরেজিতে লিখেছিলেন। তা বাঙলায় অনুবাদ করেছেন কবি খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন।)

৩৯, সীতানাথ রোড,
কলিকাতা
২৭ ৮-৩৫

প্রিয় চাচাজী !

তসলিম ! এক যুগ পরে আপনাকে আমি চিঠি লিখ্‌ছি। আমি আমার ভাইদের কাছ থেকে শুনলাম, আপনি তাদের উপর যথেষ্ট দয়া এবং সহানুভূতি দেখিয়ে থাকেন। আমার নসীব খারাব। আমি তাদের কোনো সাহায্য করিতে পারি না, বরং তাদের যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছি। আমার নিজেকেও (আর্থিক) সাহায্য করার ক্ষমতা আমার নেই।

আমি আমার দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছি নতুবা আমি হয়তো সহজেই বেশ ধনীর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুতে পারতাম।

ছোট বেলা থেকেই আমরা আপনার মহানুভব পরিবারের সাহায্য পেয়ে আস্‌ছি। আমার প্রতি রক্তবিন্দুতে রয়েছে আপনার স্বর্গীয় করুণা ও মহানুভবতার স্বাক্ষর। নির্যাতিতদের প্রতি আপনার এই সহানুভূতির জন্যই আল্লাহ্‌ আপনাকে দিয়েছেন বিত্ত, খ্যাতি ও শান্তি ! আমি জানি না, আপনার কদমবুসি করার জন্য কখন আল্লাহ্‌ আমাকে আমার গ্রামে যাওয়ার সুযোগ দেবেন।

আমি যেখানেই থাকি না কেন, গভীর শ্রদ্ধার সাথে আপনার কথা সব সময় স্মরণ করি।

আমার বড় ভাই কোনো এক রোগে ভুগছেন। কি রোগ, তা আপনই ভালো বুঝতে পারবেন। আপনি কি মেহেরবানী ক'রে

আপনার রোগী হিসেবে তাঁর সকল দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন? আপনি সরাসরি অথবা আমার ভ্রাতার মাধ্যমে আপনার ঔষুধপত্রাদির বিল পাঠিয়ে দেবেন। যদিও আমি একজন গরীব, তবু আপনার টাকা আমি অবিলম্বে পাঠিয়ে দেব। আশা করি, ওঁর জন্য যা কিছু করণীয় তা' আপনি করবেন।

আর একটি কথা—আমার ভাইয়ের কাছে শুনলাম, আমাদের গ্রামবাসী এবং জ্ঞাতিরা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং যথেষ্ট কষ্ট দিচ্ছে। আমি আমার ভ্রাতাদের সাথে আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করছি। আপনি মেহেরবাণী ক'রে এঁদের উপর স্নেহদৃষ্টি রাখবেন এবং এঁরা যাতে কারো দ্বারা কোনো কষ্ট না পায়, তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন।

শুধু একজন বিচারক এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হিসেবেই নয়, আমাদের উপর চির-স্নেহশীল মুরুব্বী এবং আশ্রয়দাতা হিসেবেই আপনার কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি। লাখ সালাম।

আপনার স্নেহভাজন—
নজরুল ইসলাম

৩৯.

(জসীমউদদীনকে লিখিত।)

Hinoo House
P.o. Hinoo
Ranchi
13.1.36

সোদর প্রতিমেষু—,

স্নেহের জসীম! আমার আন্তরিক শুভাশীর্বাদ নাও। আমি পরশু (বুধবার) মোটর করে কলকাতা যাচ্ছি—সাথে ছেলেমেয়েরাও যাবে। বিষ্যুৎবার সকাল বা বিকালে তোমার সাথে গিয়ে দেখা করব। গ্রামোফোন রিহার্স্যাল রুমে তোমায় বলেছিলাম যে, এইবার আমি

মক্তবের জন্য একখানা বই (মক্তব-সাহিত্য) পেশ করেছি approval এর জন্য।....

খোদা তোমার দিন দিন উন্নতি করুন, এ আমি সর্বদা প্রার্থনা করি। তোমার যশঃ খ্যাতি যে আমার কাছে কত বেশী গৌরবের তা বোধ হয় তুমি নিজেও জানো না। আমি সাহিত্য-লোক হতে যাবজ্জীবন নির্বাসনদণ্ড গ্রহণ করেছি; কাজেই আমাদের সমাজের সমস্ত সুনাম যশঃ গৌরব নির্ভর করছে তোমার কৃতিত্বের উপর। তুমি তাতে নিরাশ করবে না, এ বিশ্বাসও যথেষ্ট আছে আমার।

বইটা পড়ে দেখো গতানুগতিক পন্থাকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে অভিনবত্ব দেবার চেষ্টা করেছি। ওটা সত্যিই আমার লেখা ও সম্পাদনাও আমার—ওর কবিতাগুলো ও কয়েকটা গদ্য লেখা পড়লেই বুঝতে পারবে।

বিন্নাৎবার কি গ্রামোফোন রিহার্স্যল রুমে আসবে, না আমিই যাব তোমার কাছে?—আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন। ইতি।

নিত্য শুভার্থী

কবিদা

৪০.

(নজরুল যখন মাথরুন স্কুলের ছাত্র তখন কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ছিলেন সে স্কুলের হেড মাষ্টার। নজরুল উত্তরকালে কবি-খ্যাতি লাভের পর হিজ মাষ্টার্স ভয়েস গ্রামোফোন কোম্পানীর পক্ষ থেকে কবি কুমুদরঞ্জনকে এই পত্রটি লেখেন।)

37/1, Sitanath Road, Calcutta
6-4-36

শ্রীচরণারবিন্দেষু,

বহুদিন আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিনি—কলকাতা এলে খবর দেবেন যেন। আমি বর্তমানে H. M. V. Company-র Exclusive

Composer। তাঁদেরই নির্দেশ-মত আপনার কাছে একটি নিবেদন জানাতে এই পত্র লিখছি। আপনার "অধরে নেমেছে মৃত্যু কালিমা" গানটির permission (রেকর্ড করার জন্য) চান কোম্পানী। এর আগে আপনার দু'চারটি গান আছে রেকর্ডে। আপনি যদি উক্ত কোম্পানীকে চিঠি দেন, আপনার গানের Royalty (5% Commission) পাবেন। আপনার অনুমতি পেলেই কোম্পানী আপনাকে Royalty দেওয়ার অঙ্গীকারপত্র পাঠিয়ে দেবে। আশা করি পত্রোত্তর পাব। নিবেদন ইতি—

প্রণত—
নজরুল ইসলাম

P.S. আপনার ঐ গানের সঙ্গে আরও কোন্ গান গেলে ভাল হয় তা যদি নির্দেশ করেন, বা লিখে পাঠান সেই গানটি, ভাল হয়।

—নজরুল

৪১.

ইজা[illegible]ন আহমদকে লিখিত।)

কলিকাতা
১২-৩-৪০

কল্যাণীয়েষু,

শিরাজী পাবলিক লাইব্রেরীর দ্বার-উদ্‌ঘাটনে আমায় আমন্ত্রণ করেছ। এই জন্য যাঁরা উদ্যোগী, তাঁদের সকলকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শিরাজী সাহেব আমার পিতৃতুল্য ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র-রূপে আজীবন ভালবেসেছেন, তা বোধ হয় তোমরা অনেকে জান না। তাঁর ভালবাসা ও প্রেম আমার উর্ধ্বলোকে যাত্রার পথে চিরদিন সহায় স্বরূপ ছিল—আজও

আছে। আমার আর কোনো কর্মে স্পৃহা নেই, তবু তোমাদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম—পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য স্বরূপ। শিরাজী সাহেব সম্বন্ধে যা বলবার, সভাতেই বলব। ইতি—

নজরুল ইসলাম

৪২.

(১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ইষ্টারের ছুটিতে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক উৎসবে সঙ্গীত-বিভাগের অধিনায়কত্ব করার জন্য কাজী নজরুল ইস্‌লামকে অনুরোধ করা হয় ; তদুপলক্ষে কবি এই পত্রখানি লিখেছিলেন।)

আগামী ইষ্টারের ছুটিতে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, তাহাতে আমাকে সঙ্গীত-জলশার অধিনায়কত্ব করার জন্য যে-আমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহাতে আমি সানন্দ সম্মতি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি, এই উৎসবে রস-তৃষাতুর চিত্তের জন্য অমৃত ও আনন্দের "দৌড়" চলিবে, নব-যৌবনের উচ্ছল প্রাণ-তরঙ্গ প্রবাহিত হইবে।

কাজী নজরুল ইসলাম

৪৩.

(কবি নজরুল ইস্‌লাম ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর মোতাবেক ১৩৪৭ সালের ৬ই পৌষ শনিবার কলিকাতা মুসলিম ছাত্র-সম্মিলনের উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ক'রে এই বাণী প্রেরণ করেছিলেন।)

আমার আত্মার আত্মীয় প্রিয় মুসলিম ছাত্রবৃন্দ !

আপনাদের সাদর দাওতের 'মুজদা' বহন ক'রে এনেছিলেন আমার প্রিয় বন্ধু আবুল মনসুর, মহীউদ্দিন ও নুরুল হুদা। আমি আপনাদের এ-দাওয়াতের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তা'ছাড়া, ঢাকা থেকে ফিরে

এসে শরীরও সুস্থ নয়। ইন্‌শা-আল্লাহ্‌ আগামী কাল আপনাদের প্রাণের-নওরোজে শরীক হব।

আমার মন্ত্র—"ইয়াকা না' বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন"। কেবল এক আল্লাহ্‌র আমি দাস, অন্য কারুর দাসত্ব স্বীকার করি না, একমাত্র তাঁরই কাছে শক্তি ভিক্ষা করি।—আমি ফকীর, আল্লহ্‌র দরবারে আজ আমি পরম ভিক্ষু, যদি তাঁর কাছে রহমত ও শক্তি ভিক্ষা পাই—ইন্‌শা-আল্লাহ্‌, শুধু ভারত কেন—সারা দুনিয়ায় সত্যের ডঙ্কা বেজে উঠবে—তৌহিদের—পরম অদ্বৈতবাদের অমৃতবন্যা বয়ে যাবে! এই অদ্বৈত-বাদেই সারা বিশ্বের মানব এসে মিলিত হবে। আমায় আপনারা ভাব-বিলাসী স্বপ্ন-চারী কবি মনে করতে পারেন—কিন্তু যুগে যুগে এই স্বপ্ন-চারীই ঊর্ধ্বতম জগৎ থেকে, আল্লার আর্শ, কুর্শী, লওহ্‌, কলম থেকে—শক্তি, সাহস, বাণী, অমৃত, শান্তি আনয়ন করেছে। এই সত্যদ্রষ্টা স্বপ্নপথের পথিকরাই দারিদ্র-দুঃখ-শোক-ব্যাধি-উৎপীড়ন-জর্জরিত মানবকে আনন্দের পথে, মুক্তির পথে নিয়ে গেছেন—ইমান হয়ে—অগ্রপথিক হয়ে। আপনাদের মধ্যে যে মহাশক্তি আজ প্রকাশের জন্য ব্যাকুল আবেগে সকল বন্ধ দুয়ার ভাঙতে চাচ্ছে, আমি নকীব হয়ে সেই শক্তিকেই আবাহন করেছি। ঐ শক্তিরই খাদেম হওয়ার জন্য অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছি। কত হিটলার, কত কামাল আপনাদের মাঝে লুকিয়ে আছেন, তা আপনারা জানেন না,—কিন্তু আল্লাহ্‌ আমায় তাঁদের স্বরূপ দেখিয়েছেন। সর্বশক্তিদাতা আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করুন—যেন আমার প্রতীক্ষার অন্ধকার রাত্রি নব-যুগের সুবহ-সাদেকের অরুণালোকে আশু রঞ্জিত হয়ে ওঠে। এই প্রতীক্ষার শেষ মুহূর্ত আমরা কলরব করলেই শেষ হবে না। কৃষক বীজ বপন ক'রে জমিতে গাছ উদ্‌গত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে, জমিতে লাঠি মেরে গাছ উদ্‌গত করবার চেষ্টা করে না। তবে আপনাদের এই উৎসব ও আগ্রহ যদি ঈদ-মোবারকের শুভ দিনের শেষ রাত্রির আনন্দ

কলরব হয়—তবে তাকে আমি অভিনন্দিত করি—আমার সালাম জানাই।

আল্লাহ্ আপনাদের "সেরাতুল-মুস্তাকিম্" সুদৃঢ় সরল পথে পরিচালিত করুন। যে অনাগত মোজাহেদীনের জন্য আল্লাহ্‌র ফেরদৌস-আ'লা আজও শূন্য রয়েছে—তার পবিত্র বক্ষ পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্‌র আহ্বান নেমে আসুক আপনাদের অন্তরে—দেহে, আত্মায়। আল্লাহ্ আকবর।

আপনাদের ভাই—
নজরুল ইসলাম

৪৪.

(বনগাঁ মহাকুমার তৎকালীন মহাকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মীজানুর রহমানকে লিখিত।)

১৫, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
২৭-২-৪১

প্রিয় মিজান ভাই,

আপনার অপুর্ব পত্রখানা এর আগে পেয়েছি। পরেও পত্র পেয়েছি। উত্তর দিতে পারিনি ব'লে ক্ষুণ্ণ হবেন না। পত্র না দিলেও মনের পত্রাবগুণ্ঠনে আপনি ফুলের নত ফুটে আছেন। আমার পরম প্রেমময় প্রিয়তম আল্লাহ্ জানেন, কেন মাঝে মাঝে আপনাকে মনে পড়ে' কান্না পায়। এ ফকীর এটুকু জানে যে, অনাগত বিপুল কর্মজগতে আপনার কাজ বিরাট। আল্লাহ্ আপনার অগোচরে তাই আপনাকে তাঁর আপন প্রিয় সখা ক'রে নিচ্ছেন। আল্লাহ্ যাঁর ছবি আমার অশ্রুর আর্শিতে প্রতিফলিত করেন, তিনি আল্লাহ্‌র প্রিয়তমদের মধ্যে একজন। তিনি নিত্য আল্লাহ্‌র রহমত পাচ্ছেন। আল্লাহ্‌কে প্রেমময় রূপে চিন্তা ক'রে তাঁর সান্নিধ্য ও প্রেম লাভ করুন।

রবিবার 'জাগরণে'র লেখা দেবো। আমার জন্য ভাববেন না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে আপনি সব হয়ে যাবে। আমার অন্তরের ভালবাসা নিন। ইতি—

সখ্যধন্য
নজরুল

৪৫.

[কবির বর্তমান রোগের প্রথম স্পষ্ট লক্ষণ দেখা দেয় ১০-৭-৪২ ইং তারিখে। সে-সময় কবি বাস করতেন কলকাতায় ১৫।৪ নং শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে। এই পত্রখানি সুফী জুলফিকার হায়দারকে লিখিত। পত্রে উল্লেখিত 'অমলেন্দু' হচ্ছেন অমলেন্দু দাসগুপ্ত; তিনি তখন দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতেন।]

১০-৭-৪২

প্রিয় হাইদর !

তুমি এখনই চলে এস। অমলেন্দুকে আজ পুলিশে arrest করেছে। আমি কাল থেকে অসুস্থ। ইতি—

নজরুল

৪৬.

[কবি এই পত্রখানি আনুমানিক ১২-৭-৪২ ইং তারিখে পরলোকগত শ্রীব্রজেন রায়চৌধুরীকে উদ্দেশ্য ক'রে লিখেন। সে-সময় ব্রজেন বাবু দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় সাব্-এডিটর পদে কাজ করছিলেন। পত্রে উল্লিখিত 'মনসুর' হচ্ছেন জনাব আবুল মনসুর আহমদ; 'কালিপদ' হচ্ছেন শ্রীকালিপদ গুহরায়— সে-সময় 'নবযুগ'—পত্রিকার এসিস্ট্যাণ্ট এডিটার; 'হেমদত্ত' হচ্ছেন শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত—সে-সময় 'নবযুগ' পত্রিকার অন্যতম সত্বাধিকারী। এই পত্রখানির ভাষা থেকে কবির তৎকালীন মানস বিপর্যয় ও চিন্তা-বিকৃতি অনুমেয়।]

প্রিয় ব্রজেন,

কাল থেকে....সে....তুমি editorial লিখবে। "আমি অক্টোবরের মধ্যেই ভালো হয়ে যাব। ফাল্গুন থেকে নব বসন্তের মত তেজ পাব।

নৌজোয়ান হব, আমার "বন্ধু"র দেহ হয়ে যাবে, "বন্ধু" বলেছেন। তোমাদের বৌদি ভালো হয়ে যাবেন, বন্ধু বলেছেন। এঁরা এখন মাসে একশ টাকা ক'রে পাবেন। বন্ধু বলেছেন।....কদিন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছে, ও কয়দিন বিশ্রাম করুক। ফাল্গুন মাস থেকে তোমাদের মাইনে বেড়ে যাবে। ফল্গুন মাস থেকে মনসুর আসবে—ওর মাইনে ৩০০৲ টাকা হয়ে যাবে। ও ফজলুল্ থেকে দুমাস ধ'রে চীফ মিনিষ্টারের পা ধ'রে কেঁদেছে। ও ফাল্গুন আমারও পা ধ'রে কাঁদবে। ও আমায় যে ভালোবেসেছিল, সে ভালোবাসা সে স্ত্রীকে বাসেনি ছেলেমেয়েকেও বাসেনি। ইতি—

ইতি
নজরুল্

P.S. কালিপদ সকালে হেম দত্তকে দেখা করব। সে সব ব্যবস্থা করবে। তুমি এদের সাহায্য করো।

৪৭.

[কবি এই পত্রখানি ১৭-৭-৪২ তারিখে তাঁর কোনো 'বন্ধু'-কে উদ্দেশ্য ক'রে লিখেন। পত্রখানির নীচে ইংরেজীতে Confidential & Personal লেখা ছিল।]

....আমি Blood pressure-এ শয্যাগত, অতি কষ্টে চিঠি লিখছি। আমার বাড়ীতে অসুখ, ঋণ, পাওনাদারদের তাগাদা প্রভৃতি Worries, সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত খাটুনী। তার পর নবযুগের Worries ৩।৪ মাস পর্য্যন্ত। এই সব কারণে আমার Nerves shattered হয়ে গেছে। ৭ মাস ধরে হক সাহেবের কাছে গিয়ে ভিখারীর মত ৫ ৬ ঘণ্টা ব'সে থেকে ফিরে এসেছি—। হিন্দু-মুসলিম Equity-র টাকা কারু বাবার সম্পত্তি-নয়—বাঙলার, বাঙালীর টাকা। আমি ভাল চিকিৎসা করতে পারছি না। একমাত্র তুমিই আমার জন্য Sincerely appeal করেছ সত্যকার বন্ধু হয়ে। আমার হয়ত এই

শেষ পত্র তোমাকে, একবার শেষ দেখা দিয়ে যাবে বন্ধু ? কথা বন্ধ হয়ে গিয়ে অতি কষ্টে দু একটা কথা বলতে পারি, বললে যন্ত্রণা হয় সর্ব্ব শরীরে। হয়ত কবি ফিরদৌসীর মত ঐ টাকা আমার জানাজার নামাজের দিন পাব। কিন্তু ঐ টাকা নিতে নিষেধ করেছি আমার আত্মীয়-স্বজনকে,

হয়ত ভালই আছ।

তোমার
নজরুল
17-7-42.

কবি-পরিচিতি

নজরুল ইস্‌লামের সাহিত্য-সম্পদ্‌ ও সুরসৃষ্টি সম্বন্ধে যাঁরা আলোচনায় অগ্রণী, তাঁদের মধ্যে জনাব আবদুল কাদির অন্যতম। বিভিন্ন সময়ে নজরুল-প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি যে-সব আলোচনা করেছেন, তা থেকে বাছাই ক'রে কয়েকটি রচনা এখানে সঙ্কলিত হলো। নজরুলের জীবন ও সাহিত্যের অন্তর-রূপ পাঠকের চোখে পরিস্ফুট ক'রে তুলতে এ রচনাগুলি কিছুটা সহায়ক হবে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নজরুলের জীবন-কথা নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন জনাব আবদুল কাদির। ১৩৪৭ সালে ২৯শে পৌষ সোমবারের দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকায় "নজরুল-জন্মবার্ষিকী" শিরোনামে এবং সে-বছরেরই বিশেষ ঈদ-সংখ্যা সাপ্তাহিক 'কৃষক' পত্রিকায় "নজরুল-জীবনী" শিরোনামে তিনি যে দু'টি প্রবন্ধ লেখেন, তাতেই সর্বপ্রথম পরিবেশিত হয়েছিল নজরুল-জীবনীর উপকরণ। দু'টি প্রবন্ধই কবি সাগ্রহে পড়েছিলেন এবং সে-বিষয়ে আবদুল কাদিরের সঙ্গে আলোচনা-কালে দু'একটি তথ্যের উপর নতুন আলোকপাত করেছিলেন। অতঃপর, ১৩৫৩ সালে "নজরুলের জীবন ও সাহিত্য" সম্পর্কে আবদুল কাদির কলকাতা বেতার মারফৎ একটি কথিকা (talk) প্রচার করেন, তা পরবর্তীকালে পরিবর্ধিত হ'য়ে 'সাওগাত'-পত্রে প্রকাশিত হয়। সেইটিই এ-অধ্যায়ের প্রথমে সন্নিবেশিত হলো।

নজরুলের প্রথম পরিণয়ের কাহিনী বিবৃত হয়েছে দ্বিতীয় লেখাটিতে। নজরুল তাঁর প্রথমা পত্নীকে অন্তরস্পর্শী ভাষায় যে পত্রখানি লিখেছিলেন, কবির মানস-প্রকৃতি উপলব্ধির জন্য সেইটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান।

নজরুলের জীবন ও সাহিত্য

বাঙলার পরম জনপ্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাঢ়-বঙ্গে বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নজরুলের পিতার নাম কাজী ফকির আহ্‌মদ এবং পিতামহের নাম কাজী আমিনুল্লাহ্‌। কবির মাতার নাম জাহেদা খাতুন এবং মাতামহের নাম মুন্‌শী তোফায়েল আলী। কবির পূর্বপুরুষগণ পাটনার অধিবাসী ছিলেন এবং সম্রাট শাহ্‌আলমের সময় পাটনার হাজীপুর থেকে চুরুলিয়ায় আগমন করেন। তাঁদের বাড়ীর পূর্বপার্শ্বে রাজা নরোত্তম সিংহের গড় এবং দক্ষিণ পার্শ্বে পীর-পুকুর। এরূপ প্রবাদ আছে যে, হাজী পাহ্‌লোয়ান নামে এক জবরদস্ত ফকির ঐ পুকুরটি খনন করিয়েছিলেন তাই তার নাম 'পীর-পুকুর'। পীর-পুকুরের পূর্বপাড়ে হাজী পাহলোয়ানের মাজার এবং পশ্চিম পাড়ে একটি মসজিদ। কবির পিতা-পিতামহ আজীবন ঐ মাজার শরীফ ও মসজিদের তত্ত্বাবধান ক'রে গেছেন। কবির পিতা স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ ছিলেন; সাধক-বৃত্তি তাঁর স্বভাবগত ছিল,—প্রত্যহ মাজার-শরীফে সাঁঝবাতি দেওয়া এবং মসজিদে বসে' এশা'র নামাজ পর্যন্ত তস্‌বিহ্‌ তেলাওৎ করা তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

কবি বাল্যকালে পিতৃহীন হন। ১৩১৪ সালের ৭ই চৈত্র কবির পিতা দেহত্যাগ করেন। ফলে দরিদ্রের সংসারে বিষম বিপর্যয় দেখা দেয়; কবির পড়াশোনায় অতিশয় ব্যাঘাত ঘটে। ১৩১৬ সালে ১০ বৎসর বয়সে নজরুল গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন-প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করেন। অতঃপর এক বৎসর কাল সেই মক্তবেই শিক্ষকতা করেন। সে-সময় আশে-পাশের পল্লীতে মোল্লাগিরি ক'রে দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টাও তিনি দেখেছিলেন এবং মাঝে মাঝে মাজার-শরীফের

খাদেমগিরি ও মসজিদের এমামতিও করতেন। হাজী পাহ্‌লোয়ান সম্বন্ধে ঐ অঞ্চলে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। কবি একদা আমাকে বলেন যে, তিনি নাকি অনেক দিন স্বপ্নে হাজী পাহ্‌লোয়ানের নিগূঢ় আহ্বান শুনেছেন তাঁর প্রথম বয়সের লেখা 'সালেক' গল্পটিতে এবং 'মুক্তি' কবিতাটিতে আত্মিক সাধনা ও অলৌকিকতার প্রতি গভীর প্রত্যয়ের পরিচয় আছে তার শেষের দিকের রচনায় এই আধ্যাত্মিকতা এক বিচিত্র ও জটিল রূপ লাভ করেছিল। সে-সময়ে কবির মানস-বিহঙ্গ দুর্জ্ঞেয়তার কুযাশা-লোকে অবাধ বিহার শুরু করেছিল,—তাঁর স্বপ্নের পাখায় লেগেছিল আধ্যা-ত্মিকতার বর্ণ-বিভ্রমময় রহস্য-কণা। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, জগতের অতিপ্রাকৃত রহস্যের প্রতি তাঁর পরিণত বয়সের অদম্য আকর্ষণের মূলে রয়েছে তাঁর বংশের ঐতিহ্য ও বাল্যের সংস্কার প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন; অজানিতের সন্ধানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি তাঁর মনে অনুদিন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল; অথচ তাঁর উপচেতন মনের গিঁঠে বাল্যাবধি জট পাকিয়েছিল যে আদিম সংস্কার, তা যৌবনের অত্যুগ্র আধুনিকতার ছুরিতেও উৎখাত হয়নি তাঁর জীবন-দর্শন ও কবি-ধর্মের বিচারে এ-সব ব্যাপার উপেক্ষণীয় নয়।

নজরুলের পিতৃব্য কাজী বজলে করিম ফারসীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং কবিতার চর্চা করতেন এই পিতৃব্যের প্রভাবেই নজরুল বাল্য বয়সেই উর্দু ফারাসী মিশ্রিত 'মুসলমানী বাঙ্গালা'য় পদ্য রচনা শুরু করেন। তৎকালে সেই অঞ্চলে 'লেটো-নাচ' নামক এক ধরনের যাত্রাভিনয় প্রচলিত ছিল; পল্লী কবিরা পদ্যে নাটক রচনা করতেন, আর গ্রাম্য অভিনেতারা নৃত্য গীত সহকারে সেই যাত্রানাট্যের রূপ দিতেন। নজরুল এগারো বারো বৎসর বয়সেই 'লেটো'র দলের জন্য বহু গান নাটক ও প্রহসন লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। নজরুলের

কবি-প্রতিভা জীবন-প্রভাতেই এমনভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেছিল যে, পার্শ্ববর্তী কয়েকটি পল্লীর 'লেটো'র দল তাঁর কাছে পালা লেখাতে আসত। তাতে দু'পয়সা রোজগারও হ'ত। তাঁর সে-বয়সের রচিত একটি গানের নমুনা দেখুন—

"মেরা দিল্ বেতাব কিয়া তেরী আব্রু-য়ে-কামান্;
জ্বলা যাতা হোয় ইশ্‌ক-মে জান্ পেরেশান।
হেরে তোমায় ধনি
চন্দ্র কলঙ্কিনী
মরি কী যে বদনের শোভা, মাতোয়ারা প্রাণ।
বুলবুল করতে এসেছে তাই মধু পান।"

এরূপ উর্দু-ফারসী-মিশ্রিত বাঙলায় গান লেখবার খেয়াল পরিণত বয়সেও তাঁর মন থেকে মিলিয়ে যায়নি। তাঁর একটি বিখ্যাত গান—

আল্‌গা করো গো খোঁপার বাঁধন,
দীল্ ওঁহি মেরা ফস্ গয়ি।
বিনোদ বেণীর জরীন ফিতায়
আন্ধা এশ্‌ক্ মেরা কস্ গয়ি॥
তোমার কেশের গন্ধে কখন
লুকায়ে আসিল লোভী মোর মন,
বেহুঁশ হো কর্ গির্ পড়ি হাথ্-মে—
বাজুবন্দ্-মে বস্ গয়ি॥
কানের দুলে প্রাণ রাখিলে বিঁধিয়া,
আঁখ ফেরা দিয়া চোর কর নিঁদিয়া,
দেহের দেউড়িতে বেড়াতে আসিয়া
আউর নহি উয়ো ওয়াপস্ গয়ি॥

একদিকে ঔদাসীন্য ও অন্যদিকে চাঞ্চল্য নজরুলের প্রকৃতিতে বাল্য বয়সেই দেখা গিয়েছিল। তাঁর পদ্য-রচনার বাতিক দেখে পড়শীরা তাঁকে ডাকত 'তারা-ক্ষ্যাপা'। আর পরিজনেরা ডাকত 'দুখু মিঞা' ব'লে। কাজী ফকির আহ্‌মদের ঔরসে সাত পুত্র ও দুই কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করেন; (নজরুলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজী সাহেবজান ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাজী আলী হোসেন, বৈমাত্রেয় ভগিণী সাজেদন্নেসা ও সহোদরা ভগ্নী উম্মে কুলসুম বেঁচে আছেন।) তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সাহেবজানের পর চা'র পুত্র অকালে লোকান্তরিত হয়। অতঃপর নজরুলের জন্ম হ'লে তাঁর ডাক-নাম রাখা হয় 'দুখু মিঞা'। অপরিসীম দুঃখের মধ্যেই নজরুলের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়েছে; তাঁর অন্তিম জীবনেও দেখছি অবিচ্ছিন্ন দুঃখের ভ্রূকুটী। তাঁর 'দুখু মিঞা' নাম এমনভাবে সার্থক হবে, কে জানত?

১৩১৭ সালে নজরুল আসানসোলে পালিয়ে গিয়ে এক রুটির দোকানে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন। 'লেটো'র দলের সঙ্গীত-শিক্ষক রূপে তিনি ইতিপূর্বেই যন্ত্রসঙ্গীতে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন,—গীতালাপ-সূত্রে আসানসোলের তৎকালীন পুলিশ সাব-ইন্‌স্পেক্টর কাজী রফিজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। তীক্ষ্নধী নজরুল সহজেই দারোগা সাহেবের স্নেহ আকর্ষণ করলেন। দারোগা সাহেবের স্বগ্রাম ময়মনসিংহ জেলার কাজীর-সিমলা; নজরুলের পড়াশোনার সুব্যবস্থা করবার উদ্দেশ্যে তিনি তাকে সেখানে নিয়ে এলেন। দারোগা সাহেবের সাহায্যে নজরুল ১৩২০ সালে ময়মনসিংহের দরিরামপুর হাই স্কুলে ভর্তি হ'লেন। নজরুলের 'অগ্নিগিরি' নামক সুবিখ্যাত গল্পে 'বীররামপুর' গ্রামের উল্লেখ আছে; বোধহয় 'দরিরামপুর' নামটিই গল্পে 'বীররামপুর' হয়েছে। নজরুল সে-স্কুলে 'ফ্রি-ষ্টুডেণ্টশিপ' পেয়েছিলেন; কিন্তু এক বৎসর পর স্কুলের হেডমাস্টার অন্যত্র বদলী হয়ে গেলে নজরুলের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটে তিনি ১৩২১ সালে দেশে

ফিরে এসে রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল-রাজ হাই স্কুলে ভর্তি হন। "বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী" নজরুলের প্রকাশিত সর্বপ্রথম রচনা ; তাতে "রাণীগঞ্জ সিয়ারসোল-রাজ স্কুল"-এর উল্লেখ আছে। তিনি সে-স্কুলে তিন বৎসর অধ্যয়ন করেছিলেন। স্বনামখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সে-সময়ে তাঁর সহপাঠী। ১৩২৪ সালে (১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে) নজরুল ৪৯ নং 'বাঙালী পল্টনে' যোগ দিয়ে নৌশেরা হয়ে করাচী গমন করেন। যুদ্ধ যাত্রার সময়ে তিনি দশম শ্রেণীর (Clas X-এর) ছাত্র। তাঁর বন্ধু শৈলজানন্দ তাঁর সৈনিক-জীবনের সঙ্গী হ'তে সংকল্প করেছিলেন ; কিন্তু ঘটনাক্রমে তা সম্ভব হয়নি। পল্টনে গিয়ে নজরুল যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে স্বল্পকাল-মধ্যে 'হাবিলদার' পদে উন্নীত হয়েছিলেন এবং 'কোয়ার্টারমাষ্টার হাবিলদার'-রূপে সৈন্যদলের রসদ-ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধান-ভার পেয়েছিলেন।

যুদ্ধে গিয়েও নজরুল কাব্যচর্চা ও জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। করাচী সেনানিবাসে একজন পাঞ্জাবী মৌলভী সাহেব থাকতেন, তার কাছে নজরুল ক্রমে ফারসী কবিদের প্রায় বিখ্যাত কাব্যই পড়ে' ফেলেন। তিনি সে-সময় "দীওয়ান-ই-হাফিজ" যে ভালোভাবেই পড়েছিলন, তা তাঁর 'সালেক' গল্পটি পড়লেও বুঝা যায়। 'সালেক' তাঁর 'রিক্তের বেদন' নামক গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। 'রিক্তের বেদন' করাচীতে "আরব সাগরের বিজন বেলায" বসে' লেখা গল্পসমষ্টি।

নজরুলের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৩২৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় ; কবিতাটির নাম 'মুক্তি',— রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা'র মুক্তক-স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা। "সওগাতে" নজরুলের প্রথম কবিতা 'কবিতা-সমাধি' প্রকাশিত হয় ১৩২৬ সালের আশ্বিন মাসে। তাঁর প্রথম রচনা 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' "সওগাতে" প্রকাশিত হয়েছিল তারও কিছু আগে—জ্যৈষ্ঠ মাসে। ১৩২৬ সালের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'র কার্তিক সংখ্যায় নজরুলের 'হেনা'

গল্প এবং মাঘ সংখ্যায় 'ব্যথার দান' গল্প প্রকাশিত হয়। মিঃ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তখন 'বঙ্গীয় মুসমান সাহিত্য-পত্রিকা'র প্রকাশক। তিনি তখন নজরুলকে আন্তরিক উৎসাহ দিয়ে যে-সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন, তাতেই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে' ওঠে। শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তখন 'সবুজপত্রে' কাজ করতেন; হাবিলদার কাজী নজরুল ইস্‌লাম করাচী "বঙ্গবাহিনী" থেকে 'সবুজপত্রে' একটি কবিতা পাঠান; পবিত্রবাবু কবিতাটি 'প্রবাসী'তে ছাপিয়ে দেন

কিন্তু নজরুলের কবিতা অপেক্ষা গল্পই তখন পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বেশী। তাঁর গল্পগুলি পড়ে' সে-সময়ের পাঠকেরা এক অসাধারণ শক্তিধর প্রতিভার আবির্ভাব বুঝতে পেরেছিলেন। অবশ্য এ-কথা সত্য যে, তাঁর গল্পরচনা সর্বত্র সুসংহত নয়; তাতে ভাবের অপক্বতা কবিত্বময় ভাষাতেও ঢাকা পড়ে নি তিনি পরিণত বয়সে কয়েকটি ভালো গল্প লিখেছেন বটে; কিন্তু সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার পক্ষে সেগুলিই যথেষ্ট নয় অথচ মজার খবর এই যে, নজরুল তাঁর লেখক-জীবন শুরু করেছিলেন প্রধানতঃ গল্পলেখক হিসেবেই

নজরুল যে-বাহিনীতে ছিলেন, তা যুদ্ধান্তে ভেঙে দেওয়া হলে ১৩২৬ সালে ' ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি করাচী থেকে দেশে ফিরে আসেন। সৈনিকের পোষাকেই তিনি স্বগ্রাম চুরুলিয়ায় যান,— অতঃপর আজ পর্যন্ত চুরুলিয়ায় যায়নি। গ্রাম ঘুরে' তিনি তখন বর্ধমানে 'সাব-রেজিষ্ট্রার, পদের জন্য দরখাস্ত দিয়ে কলকাতায় আসেন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি'র আফিস ছিল তখন ৩২নং কলেজ ষ্ট্রীটে,—মিঃ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সেখানে থাকতেন। নজরুল কলকাতায় এসে মিঃ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ঘরে উঠলেন। সেখানে গুণগ্রাহী মিঃ আফজাল-উল হকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল। ১৩২৭ সালের বৈশাখে আফজাল-উল হকের পিতা কবি মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় 'মোসলেম ভারত' বের হয়; তার প্রথম সংখ্যা থেকে নজরুলের

'বাঁধন-হারা' নামক পত্রোপন্যাস ধারবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'তে থাকে। 'বাঁধন-হারা'র মূলে ছিল প্রেমের ব্যর্থতা, সেই ব্যর্থতা শেষে রূপান্তরিত হয়েছিল বিদ্রোহে। পরিণত বয়সেও তিনি যে বন্ধন-মুক্তির কথা বলেছেন, তারও আভাস এই উপন্যাসখানিতে পাওয়া যায়। এই পত্রোপন্যাসে 'সাহসিকা'র এক সুদীর্ঘ পত্রে যে বিদ্রোহের বর্ণনা আছে, তারই পুর্ণ প্রকাশ পরবর্তীকালে 'বিদ্রোহী' কবিতায় দেখা যায়। ১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে' নজরুলের 'বিদ্রোহী' ও 'কামাল পাশা' প্রকাশিত হয়। মাত্র দু'বছর আগে যিনি লেখক মহলে দেখা দিয়েছেন, সেই বাইশ বৎসর বয়স্ক তরুণ কবির হাতে 'বিদ্রোহী'র মতো অপুর্ব প্রাণবন্ত কবিতা বের হওয়া এক বিস্ময়কর ব্যাপার। নজরুল ছিলেন দৈবী প্রতিভার অধিকারী, তাই এত অল্প সময়ের মধ্যে আপনাকে দেশের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

'বিদ্রোহী' প্রকাশের পর থেকে নজরুলের খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। সে-সময় নজরুল তালতলায় ৮।এ, টার্নার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে মুজফ্‌ফর সাহেবের সঙ্গে থাকতেন।

'ভিশতি বাদশাহ্', 'বাবর' প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা আলী আকবর খানের বাড়া ত্রিপুরা জেলার দৌলতপুরে, ১৩২৭ সালের চৈত্র মাসে নজরুল হঠাৎ একদিন কাউকে না ব'লে ক'য়ে তাঁর সঙ্গে দৌলতপুরে চলে গিয়েছিলেন। 'ছায়ানট' ও 'পুবের হাওয়া'র অনেকগুলি গান এবং 'ঝিঙে ফুল'-এর কয়েকটি কবিতা দৌলতপুরে থাকতে লেখা। দৌলতপুর থেকে তিনি কমিল্লায় শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবীর বাড়ীতে যান; সেই গোমতী-তীরের আনন্দময় সম্মৃতি তাঁর বহু কবিতায় মধুর রূপ লাভ করেছে—

> উদাস দুপুর কখন গেছে, এখন বিকাল যায়;
> ঘুম জড়াল ঘুমন্তী নদীর ঘুমুর-পরা পায়।
>
> —('চৈতী হাওয়া', ছায়ানট)

সেই পুণ্য গোমতীর কূলে
প্রথম উঠিল কাঁদি' অপরূপ ব্যথা-গন্ধ নাভিপদ্মমূলে
—('পূজারিণী', দোলন-চাঁপা)

কুমিল্লা থেকে ফিরে এসে নজরুল ১৩২৯ সালে (১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে) ৭নং প্রতাপ চাটুজ্জে লেন থেকে অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ করেন। 'ধূমকেতু' প্রকৃতপক্ষে হ'য়ে ওঠে বাঙলার নির্যাতিত সন্ত্রাসবাদী দলের অগ্নিবাণীর বাহন। তিনি তাতে যে-সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার কতকগুলি সংকলন ক'রে "দুর্দিনের যাত্রী", "রুদ্রমঙ্গল" ও "প্রলয়ঙ্কর" নামক তিনটি বই বের করা হয়। সেই লেখার একটু নমুনা দেখুন—

"যে ভৃগু নিদ্রিত ভগবানের বুকে লাথি মেরে জাগায়, সে ভৃগুকে আমি প্রণাম করি।....ভৃগুর মতো বিদ্রোহী হও, ভগবানও তোমার পায়ের ধূলো নেবে।...বলো, আমিই নূতন ক'রে জগৎ সৃষ্টি করব।"
—(দুর্দিনের যাত্রী, ১১-১২ পৃঃ)

"হে আমার অজানা প্রলয়ঙ্কর মহা-সেনানী, তোমায় আমি দেখি নাই, কিন্তু তোমার আদেশ আমি শুনেছি, আমায় যুদ্ধ-ঘোষণার যে তূর্য-বাদকের ভার দিয়েছ, সে ভার আমি মাথা পেতে নিয়েছি। এ যে তোমার হুকুম। সাধ্য কি আমি তার অমান্য করি ?
—(দুর্দিনের যাত্রী, ৫০-৫১ পৃঃ)

"জাগো জনশক্তি! হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে-মজুর ভাইরা!....যারা তোমাদের পায়ের তলায় এনেছে, তাদের তোমরা পায়ের তলায় আন।"
—(রুদ্রমঙ্গল, ৪ পৃঃ)

"আজ নিখিল মুসলিম-অঙ্গন তোমার কারবালা-প্রান্তর, হে মুসলিম!.... আল্লার পানে তাকাও, রসুলের দিকে চেয়ে' দেখ —আর তোমার কর্তব্য নির্ধারণ করো, হে মুসলিম!"
—(রুদ্রমঙ্গল, ১৯-২০ পৃঃ)

এই অগ্নিক্ষরা ভাষা যে দেশবাসীর মনে অভূতপূর্ব উন্মাদনা জাগিয়ে দেবে, তাতে আর আশ্চর্য কি।

১৩২৯ সালে নজরুলের "অগ্নিবীণা" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'বিদ্রোহী', 'প্রলয়োল্লাস', 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার', 'কোরবানী', 'খেয়া-পারের তরণী', 'শাত্-ইল আরব', 'মোহর্‌রম' প্রভৃতি কবিতার জন্য তার প্রথম সংস্করণ অল্পদিনেই নিঃশেষিত হ'য়ে যায়। বাংলা দেশে আর কোনো কাব্য বাজারে বের হ'তে-না-হ'তে এত সমাদর লাভ করেনি।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের বিশেষ কলকাতা অধিবেশনে গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। নজরুলের 'অগ্নিবীণা'র কবিতাগুলি অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের আবহাওয়ায় লেখা,—সারা দেশে তখন জনজাগরণের হাওয়া জোর বইছে। সেই ভারত-ব্যাপী গণ-বিক্ষোভের দিনে নজরুল হয়ে উঠলেন বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ চারণ-কবি সর্বপ্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে তিনি গাইলেন মুক্ত-জীবনের গান। বীর্যের ক্ষেত্রে, সত্যের সংগ্রামে, মহা-মৃত্যুর অভিসারে দেশবাসীকে উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিয়ে বললেন—

> এবার মহা-নিশার শেষে
> আসবে ঊষা অরুণ হেসে'
> করুণ বেশে
> দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু-চাঁদের কর।
> তোরা সব জয়ধ্বনি কর্।
> —('প্রলয়োল্লাস', অগ্নিবীণা)

সেদিন তাঁর "অগ্নবীণা" ও "বিষের বাঁশী'র প্রভাব রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' ও 'বলাকা'র প্রভাবকেও বোধহয় ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর রচনার অমিত তেজ, উদ্দাম, স্বতঃস্ফূর্ততা ও সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য সহজেই

ভাবপ্রবণ বাঙালীর মন জয় ক'রে নিয়েছিল। তাঁর রচনায় তাঁর অশান্ত মনের ছাপ সুপরিস্ফুট ; তাতে কোথাও কাব্য-সৌন্দর্যের হানি হয়ত হয়েছে। তাঁর আবেগ ও উন্মাদনা সেই প্রবল স্বাদেশিকতার দিনে প্রচুর হাততালি পেয়েছে, কিন্তু চিরকালের দরবারে তা না পেলেও অশ্রদ্ধেয় হবে না।

'অগ্নিবীণা'র অন্তর্ভুক্ত 'ধূমকেতু' কবিতাটি 'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বরের 'ধূমকেতু'তে 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামক কবিতা প্রকাশের দরুণ পত্রিকাখানি রাজরোষে পতিত হয়,—রাজদ্রোহের অভিযোগে নজরুল এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। নজরুল যখন হুগলী জেলে, তখন জেল-কর্তৃপক্ষের আচরণের প্রতিবাদ ক'রে উনচল্লিশ দিন অনশন-ধর্মঘট করেছিলেন। তাঁর অনশন ভাঙাবার জন্যে তাঁর মা জাহেদা খাতুন জেলে তাঁর সাথে দেখা করতে যান। কিন্তু মা'কে নিরাশ হ'য়ে ফিরতে হয়। তাঁর মা এ-দুঃখ আমৃত্যু ভুলতে পারেন নি। ১৩২৬ সালের পর মাতা-পুত্রে আর সাক্ষাৎ হয়নি,—১৩৩৫ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তাঁর মা লোকান্তর গমন করেছেন। আপন জন্মদাত্রীর প্রতি সন্তানের এই ঔদাসীন্য কবির খেয়াল ছাড়া আর কী হ'তে পারে ?

১৩৩০সালের শ্রাবণ মাসে বহরমপুর জেলে তিনি 'ইন্দ্র-প্রয়াণ'' শীর্ষক কবিতাটি লেখেন। তিনি যখন জেলে, তখন তাঁর "দোলন-চাঁপা" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর কবি কারামুক্ত হন। জেল থেকে ফিরে সোজা চলে আসেন কুমিল্লায়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল শুক্রবার নজরুল বিয়ে করেন। বিবাহ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা ৬নং হাজী লেনে। তাঁর স্ত্রীর নাম কাজী প্রমীলা নজরুল (ওরফে আশালতা সেনগুপ্ত।), শাশুড়ীর নাম শ্রযুক্তা গিরিবালা সেনগুপ্ত। "মা ও মেয়ে" নামক সুবিখ্যাত

উপন্যাসের লেখিকা মিসেস এম্. রহমান সাহেবার উদ্যোগেই এই বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হয়। পরবর্তীকালে (১৩৩৩ সালে) নজরুলের "বিষের বাঁশী" উৎসর্গীকৃত হয়েছিল এই মহিয়সী মহিলার নামে।

বিয়ের পর কবি সপরিবারে হুগলীতে গিয়ে বাস করেন। সে-সময়ে (১৩৩১—১৩৩২ সালে) তাঁর 'সুবেহ্-উম্মেদ', 'মুক্তিকাম', 'দ্বীপান্তরের বন্দিনী', 'সব্যসাচী', 'ঝড়', 'চিত্তনামা', 'ফাল্গুনী'. 'বিদায়-স্মরণে'. 'চরকার গান', 'কৃষাণের গান', 'সাম্য' প্রভৃতি কবিতা রচিত হয়। ১৩৩২ সালে ১লা পৌষ (১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর) ৩৭নং হ্যারিসন রোড থেকে 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের' সাপ্তাহিক মুখপত্র-রূপে 'লাঙল' প্রকাশিত হয়। প্রধান পরিচালক নজরুল ইসলাম নামে সম্পাদক ছিলেন তার পল্টনের বন্ধু শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। 'লাঙলে'র সর্বপ্রথম সংখ্যার 'সর্বপ্রধান সম্পদ্' ছিল নজরুলের কবিতা 'সাম্যবাদী। 'সাম্যবাদী'র প্রধান সুর মানবিকতা। অবশ্য কবি তাতে 'সাম্যবাদী-স্থান' কামনা করেছেন—

"—সাম্যবাদী-স্থান,

নাই ক এখানে কালা ও ধলার আলাদা গোরস্থান।
নাই-ক এখানে ধর্মের ভেদ, শাস্ত্রের কোলাহল,
পাদরী-পুরুত-মোল্লা-ভিক্ষু এক গ্লাসে খায় জল।
হেথা স্রস্টার ভজন-আলয় এই দেহ এই মন,
হেথা মানুষের বেদনায় তাঁর দুখের সিংহাসন।"

নজরুলের 'সাম্যবাদী'তে অর্থনৈতিক বৈষম্যের অপেক্ষা ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের কথা বেশী ফুটে উঠেছে। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে আত্মার মহিমা ও মনুষত্বের জয় ঘোষনা করেছেন, এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই মানুষে মানুষে অভেদ ভেবেছেন।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল (১৩৩২ সালের ১৯শে চৈত্র) শুক্রবার থেকে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। নজরুল তখন কৃষ্ণনগরে চাঁদ-সড়কের পাশে থাকতেন; তৎকালীন হিন্দু-মুসলমান-দাঙ্গার আবহাওয়ায় তিনি তাঁর সুবিখ্যাত গান "কাণ্ডারী হুঁশিয়ার" লেখন,—কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী-সঙ্গীত হিসাবে গানটি প্রথম গাওয়া হয়। কৃষ্ণনগরে থাকতে (১৩৩৩-৩৪ সালে) তিনি "প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়", "যা শত্রু পরে, পরে" "হিন্দু-মুসলিম-যুদ্ধ", "খালেদ", "চিরঞ্জীব জগলুল", "ভীরু", "এ মোর অহঙ্কার", নওরোজ" প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা রচনা করেন। এই কৃষ্ণনগরকে পটভূমি ক'রেই তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস "মৃত্যুক্ষুধা" রচিত হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের "পাঁক" আর নজরুলের "মৃত্যুক্ষুধা' প্রায় একই পটভূমিকায় লেখা। তবে নজরুলের ভাষা বলিষ্ঠ, চরিত্রগুলি অধিকতর প্রাণবন্ত।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট (১৩৩৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ) 'লাঙল' পত্রিকার নাম বদ্‌লে রাখা হয় 'গণবাণী',—সম্পাদক হন মিঃ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। 'গণবাণী'র ১১শ সংখ্যায় নজরুল 'ইন্টার-ন্যাশনাল সঙ্গীতে'র অনুবাদ করেন। 'লাঙল' ও 'গণবাণী'র যুগে নজরুলের রাজনৈতিক মতবাদ কিছুটা রূপ পরিগ্রহ করে। নিরন্ন ও নিগৃহীতের দুঃখ তিনি অনেকটা নূতন ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর 'ফণি-মনসা', 'সর্বহারা', 'প্রলয়-শিখা', 'ভাঙার গান', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি কাব্যে এর সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে। তিনি ১৩৩৫ সালে শীতের সময় একবার চট্টগ্রামের পথে সন্দ্বীপে মিঃ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বাড়ী গিয়েছিলেন; সেই সমুদ্র-বিহার আর গুবাক সারির সৌন্দর্য উপভোগের কথা আছে তাঁর "শীতের সিন্ধু" কবিতায় ও 'চক্রবাক' কাব্যে।

বাল্য থেকেই নজরুলের ছন্দঃ ও সুরের কান প্রখর ছিল। তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথের নবাবিষ্কৃত মুক্তক-স্বরবৃত্ত ছন্দে কবিতা লেখেন; এই ছন্দ যে ওজস্ সৃষ্টি চলে তা 'কামাল পাশা' লিখে প্রমাণ করলেন।

তাঁর 'বিদ্রোহী' সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত—বাঙলা ভাষায় তিনি এই নব-ছন্দের প্রবর্তক। প্রস্বরমাত্রিক ছন্দ বাঙলায় সর্বাপেক্ষা নিপুণ ও চটুল ছন্দ,—নজরুল আরবীর অনুকরণে সে ছন্দের কয়েকটি নূতন ধরণ-ধারণ উদ্ভাবন করেন। একটি নমুনা দেখুন—

— | — — — | —

হায় এ কান্নার নাই ক শেষ,
কই মা শান্তির কোন্ সে দেশ ?
কোন্ সে দূরপথ অন্তে হায়
পান্থ বাস যায়, নাই মা ক্লেশ ॥

—('আরবী ছন্দের কবিতা', নির্ঝর)

উপরোক্ত ছন্দঃস্তবকটিতে (metrical stanza-য়) মোট চারিটি চরণ, প্রতি চরণে দুইটি পর্ব (measure) ; প্রথম পর্বে চারিটি স্বরব্যষ্টি (syllable), তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি ছাড়া বাকীগুলি অমুক্ত স্বরব্যষ্টি (closed syllable) ; দ্বিতীয় পর্বে প্রথম ও তৃতীয় স্বরব্যষ্টি অমুক্ত কিন্তু দ্বিতীয়টি মুক্ত (open syllable)। এ ধরণের ছন্দের ধ্বনিসাম্য স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত এই উভয় প্রকার ছন্দোবিধানেই নির্ণয় করা চলে, উপরন্তু তাতে যথানিয়মে নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্বর (accent) দেওয়া হয়ে থাকে ; তাই তার নামকরণ করা হয়েছে 'প্রাস্বরিক' বা 'প্রস্বরমাত্রিক' ছন্দ। নজরুল শুধু সংস্কৃত-ভাঙা দীর্ঘহ্রস্বমাত্রিক ছন্দেই নয়, প্রাস্বরিক ছন্দেও প্রভূত দক্ষতা দেখিয়েছেন।

ছন্দের সূক্ষ্ম কারুকার্য শেষে তাঁকে অনুপ্রাণিত করে সুরের রাগ-রহস্য সন্ধানের দিকে। ত্রিপুরার দৌলতপুরে থাকতে—

কোন্ মরমীর মরম-ব্যথা আমার বুকে বেদ্না হানে,
জানি গো, সেও জানেই জানে।
—(ছায়ানট)

এ-সব গান লিখে' তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৩২৭ সালে ফাল্গুন সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে' নজরুলের "ওরে এ কোন্ স্নেহ-সুরধুনী নামলো আমার সাহারায়" গানটির স্বরলিপি করেন শ্রমতী মোহিনী সেনগুপ্তা। প্রধানতঃ মোহিনী সেনগুপ্তার অনুরোধেই নজরুল তখন গান লিখতে শুরু করেন। অবশ্য তাঁর তখনকার গানে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল সমধিক। ১৩৩৩ সাল থেকে নজরুল 'গজল গান' রচনায় মেতে উঠলেন—সেই থেকে সুরস্থষ্টিতে স্বকীয়তা ফুটে উঠল। ১৩৩৩ সালের মাঘ মাসে (১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী) তিনি ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় যাবার পথে তিনি জাহাজে বসে "আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালী" এবং "বসিয়া নদীকূলে এলোচুলে কে গো উদাসিনী" গান দু'টি লিখেছিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার ঢাকায় এলে "চল্ চল্ চল্ ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল", "আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়লো তরী", "এ বাসি বাসরে কে গো এলে ছলিতে", "নিশি ভোর হলো জাগিয়া পরাণ-পিয়া" প্রভৃতি বহু বিখ্যাত গান রচনা করেছিলেন। শুধু ঠুমরী-গজল নয়, কীর্তন, ভাটিয়ালী বাউল, রামপ্রসাদী, এমন কি খেয়াল, ধ্রুপদ রচনায়ও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বহু লুপ্ত রাগ-রাগিণীর উদ্ধার করে হিন্দুস্থানী ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি বিভিন্ন রাগ রাগিণীতে আড়াই হাজারের অধিক গান লিখেছেন। তাঁর 'বুলবুল', 'চোখের চাতক', 'চন্দ্রবিন্দু, 'সুর-সাকী, 'গীতি-শতদল, 'বনগীতি, 'গুল-বাগিচা, 'জুলফিকার, 'গানের মালা, 'নজরুল-গীতি', প্রভৃতি পরম সমাদৃত গীতিগ্রন্থ। তাঁর সকল গান সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে বোঝা যাবে বাঙলার সঙ্গীত শিল্পে তাঁর অবদান কত অসামান্য।

নজরুল যখন ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর দিকে ঢাকায় আসেন, তখন অধ্যক্ষ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে

তাঁর ঘনিষ্টতা ঘটে। সেই সৌহার্দ্যের স্মৃতি তাঁর সুবিখ্যাত 'শিউলি-মালা, গল্পের কিছু ছায়া ফেলেছে।....তাঁর 'পদ্ম-গোখরো', 'জিনের বাদশা' ও 'অগ্নিগিরি' নিটোল গল্প হিসাবে কালজয়ী হবে। তাঁর 'আলেয়া', 'সেতুবন্ধ' ও 'ঝিলিমিলি' রূপক-নাট্য! তাঁর 'আলেয়া' রবীন্দ্রনাথের 'তপতী'র, 'ঝিলিমিলি' 'ডাকঘর'-এর এবং 'সেতুবন্ধ' 'মুক্তধারা'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে এ সব রচনায় নজরুলের জীবন-তত্ত্ব ও প্রকাশের স্বকীয়তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাঁর 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের 'আনসার' এবং 'কুহেলিকা' উপন্যাসের 'জাহাঙ্গীর' তাঁরই বন্ধন-মুক্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি। আনসারের কামনা—

"সে মানুষের জন্য সর্বত্যাগী হবে, সকল দুঃখ মাথা পেতে সহ্য করবে, তা'রা দুঃখী তা'রা পীড়িত বলে' নয়, তা'রা সুন্দর বলে'।"

—(মৃত্যুক্ষুধা, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

রহস্যময় সৌন্দর্যের প্রতি এই আবেগপ্রবণ পক্ষপাতিত্ব তাঁর সকল কথাগ্রন্থের বিশেষত্ব। 'মৃত্যুক্ষুধা'র মেজ-বৌ তার খোকার মৃত্যুর পর ভাবলে—"আজ পাড়ার সকল ছেলে আমার খোকা।" এই উক্তি শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিত মশাই' উপন্যাসের বৃন্দাবনের কথা মনে করিয়ে দেয়। নজরুলের অনেক কবিতা, বিশেষতঃ উপন্যাস, পড়লে মনে হয় যে, আত্মস্থ হওয়ার দুরূহ সাধনা তাঁর ছিল না, অধৈর্য ও অস্থিরতা তাঁর অনেক রচনাকে অনবদ্য হতে দেয়নি। উন্মাদনা ছিল তাঁর বড় সম্বল; তাই ধ্যানের প্রসন্ন ঔদাসীন্য তাঁর রচনায় বেশী আশা করা বৃথা।

তাঁর বহু কবিতার বাঁধন যথেষ্ট আঁটসাট ও সুঠাম নয়, ভাব আশানুরূপ গভীর ও রসঘন নয়, কবি-কল্পনা তেমন ব্যাপক ও তূর্ণগতি নয়, কাব্যরুচি খুব সূক্ষ্ম ও সমুন্নত নয়,—এ সব অভিযোগ ওঠেছে। কিন্তু এ-সব অভিযোগ সত্ত্বেও নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথের পরে নজরুলই বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা। নজরুলের কবিতায় খুঁত থাকতে পারে, কিন্তু কৃত্রিমতা নেই, কারসাজি (charlatanism)

নেই, —প্রাণের অদম্য আনন্দ-রসে তা বেগবান ও দীপ্যমান। তাঁর সকল কবিতা যথেষ্ট মার্জিত না হ'তে পারে, কিন্তু তাতে স্বতঃস্ফূর্ততা আছে, সচ্ছলতা আছে, সাবলীল গতি আছে। কবিতায় এতখানি পাওয়াই একালে দুষ্কর।

এই অতি-আধুনিক ম্যানারিজমের যুগে নজরুলের কবিতায় ভাব ও ভঙ্গীর কুশলী কসরৎ না দেখে' কেউ কেউ কঠিন মন্তব্য উচ্চারণ করতে পারেন। কিন্তু তাঁর কিছু গান সম্বন্ধে কোনো আপত্তিই উঠতে পারে না। নজরুলের শিল্প-শক্তির সর্বোত্তম বিকাশ গীতি-সৃষ্টিতে। অনেকের মতে, তিনি বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা (Composer)। তাঁর কবিতায় নব্য প্রতিকবাদ, প্যান-ইসলামবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি পাঁচমিশেলীর সাক্ষাৎ মিললেও তিনি নিঃসন্দেহে বাঙলার প্রথম জাতীয় গণতান্ত্রিক কবি। তাঁর গানে তিনি নিজেকে আরও নিবিড় ও ব্যাপকভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি গানে যেমন শ্যাম ও শ্যামার আরতি করেছেন, তেমনই হজরত মোহাম্মদের প্রশস্তিতে গদ্‌গদ্‌ হয়েছেন। একই সময়ে কীর্তন ও গজল গেয়েছেন। কখনও সাম্পান মাঝির ভাটিয়াল রাগে, কখনও সাঁওতালী ঝুমুরের সুরে গান ধরেছেন, কখনও রামপ্রাসাদের ভক্তি-ভাবে, কখনও হাফিজের প্রেম-প্রভাবে মাতোয়ারা হয়েছেন। মোদ্দা কথা, বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের ঐতিহ্যকে তিনি অজস্র গানে সঞ্জীবিত করেছেন,—একনিষ্ঠ আদর্শবাদিতার (ideologyর) প্রেরণা অপেক্ষা বিচিত্র সুরের প্ররোচনাতেই তিনি সমধিক প্রবুদ্ধ হয়েছেন। গানে তিনি পূর্ণনিবেদিত-চিত্ত শিল্প-সাধক; তাই তাঁর প্রেমের গান, সাধনার গান, হাসির গান, বাঙালীর মনকে বহুদিন সরস ক'রে রাখবে। জাতীয় দুর্দিনে বাঙালী বারবার স্মরণ করবে তাঁর স্বদেশী সঙ্গীত—

> অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ ;
> কাণ্ডারী ! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি-পণ !

'হিন্দু না ওরা মুসলিম' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী ! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।
দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার ॥

গত ১৩৪৮ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কবির অনুরাগী ও ভক্তরা তাঁর ৪৩তম জন্মোৎসব সসমারোহে প্রতিপালন করেছিলেন। তার পরের বৎসর (১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাস) থেকে কবি দুরারোগ্য রোগে ভুগছেন। সেই কঠিন ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে তিনি আবার বাঙলা ও সাহিত্য সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে শক্তি নিয়োগ করুন, এই অশ্রুপ্লুত প্রার্থনা অতঃপর প্রতি বৎসর ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে বাঙলার আপামরসাধারণের আকুল অন্তর থেকে উসারিত হচ্ছে।

আগামী ১৩৫৪সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে) নজরুলের ৪৯তম জন্মদিন। জানি, কবির ৪৮ বৎসর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্যে সেদিন সারা দেশ তাঁর কীর্তির তারিফে মুখর হয়ে ওঠবে। কিন্তু সেই সাণুরাগ প্রশংসা ও তাঁর রোগক্লান্ত কানে পৌঁছুবে কি ?

তিনি প্রায় পাঁচ বৎসর আগে দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর বলিষ্ঠ দেহশ্রী বিনষ্ট হয়েছে, সেই আয়ত চক্ষুতে আর অতলস্পর্শী দৃষ্টি নেই, মুখে উচ্ছল হাসির ফোয়ারা স্তব্ধ হয়ে গেছে, কণ্ঠের অনর্গল বাণী মূর্ছাহত, স্মৃতিশক্তি লুপ্তপ্রায়। তাঁর স্ত্রী গত দশ বৎসর থেকে পক্ষঘাত রোগে শয্যাগতা ; ছেলে দুটি আই-এ পড়ছে অথচ আয়ের সকল পথ বহুদিন থেকে বন্ধ, সংসারের সকল দিকে অভাব-রাক্ষসী মুখ ব্যাদান করে আছে। তাঁর দুরারোগ্য রোগও দুরবস্থার সংবাদ মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অন্তিম জীবনের দুঃখ স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রার্থনা করি : নজরুল নিরাময় হউন।

'সওগাত'
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪।

নজরুল-জীবনের এক অধ্যায়

পাকিস্তানের রাজধানী করাচী। কাজী নজরুল ইসলামের কবি-প্রতিভার প্রথম বিকাশ হয়েছিল করাচীতে। তাঁর কিশোর বয়সের 'লেটো'-গান ও যাত্রা-নাট্যে তাঁর কবিত্ব-শক্তির একটা স্ফুরণ দেখা যায় বটে, কিন্তু যে-অসামান্য লোকোত্তর প্রতিভার জন্য তিনি আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী তার প্রকৃত বিকাশ ঘটে করাচীর সেনা-নিবাসে।

১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে) মঙ্গলবার তিনি বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁর বয়স যখন ৮ বৎসর, তখন তাঁর পিতা কাজী ফকীর আহমদ ইন্‌তিকাল করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হওয়ার পর পিতৃহীন নজরুল স্থানীয় 'লেটো'-গানের দলে যোগ দেন। তাঁর সে-সময়কার রচিত কোনো কোনো গানে ইংরেজী বা উর্দু-ফরাসী-মিশ্রিত পদের প্রয়োগ দেখে' কেউ কেউ কৌতূহল বোধ করেছেন। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গের পাঁচালীকার, কবিয়াল ও যাত্রাওয়ালাদের রচনায় এই ধরণটি অপ্রচলিত ছিল না। রূপচাঁদ পক্ষীর—

আমারে ফ্রড ক'রে কালিয়া ড্যাম তুই
কোথায় গেলি ?
আই এম্ ফর্ ইউ ভেরি সরী,
গোল্ডেন বডি হলো কালি।

অথবা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের—

বিবিজান চলে যান লবেজান ক'রে।

নজরুলের কিশোর বয়সের রচনায় এই ধরণের পদ-বিন্যাস কিছু কিছু দেখা যায়। আমার ধারণা যে, নজরুলের কবিত্বশক্তি যদি পল্লীর

কবিওয়ালা বা লেটোওয়ালাদের বিচরণ-ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকতো, তা হ'লে এই 'ক্ষ্যাপা'-কবির স্থান বড়জোর লাভ হতো দাশরথি রায়, ভোলা ময়রা, ফিরিঙ্গি এণ্টনী, গোবিন্দ অধিকারী, পাগ্‌লা কানাই প্রভৃতির পংক্তিতে।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি '৪৯ নং বাঙ্গালী পল্টনে' যোগ দিয়ে করাচী যান,—তাঁর কল্পনার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয় বিশ্বের বিরাট দিগন্ত। করাচীতে একজন পাঞ্জাবী মৌলভী সাহেবের কাছে 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' প্রভৃতি ফরাসী কাব্য পাঠ ক'রে তিনি এক মহৎ সাহিত্য ও মহাজীবনের সন্ধান পান,—তাঁর রচনায় প্রাণলাভ করে সৌকর্য ও শালীনতা। করাচীতে "আরব সাগরের বিজন-বেলায়" বসে তিনি 'মুক্তি', 'কবিতা-সমাধি' প্রভৃতি যে-সমস্ত কবিতা এবং 'রিক্তের বেদন', 'ব্যথার দান', 'হেনা' প্রভৃতি যে-সমস্ত গল্প রচনা করেন, তা যেমন অভাবনীয় তেমনি বিস্ময়কর। এ সকলের প্রকাশ-রীতি ও রচনা-শৈলী তাঁর কৈশোরের পল্লীগীতি থেকে আলাদা,—প'ড়ে সমঝদার পাঠকেরা বুঝতে পারেন যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অসাধারণ শক্তিধর প্রতিভার আবির্ভাব আসন্ন।

'বাঙ্গালী পল্টন' ভেঙে দেওয়ার মাস ছয় আগে নজরুল করাচী থেকে একবার স্বগ্রাম চুরুলিয়ায় এসেছিলেন। সে-সময় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির কার্যালয় ছিল ৩২ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতায়। তিনি সেই কার্যালয়ে এলে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'র প্রকাশক মিঃ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ আলাপ হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে (১৩২৬ সালে) 'বাঙ্গালী পল্টন' ভেঙে দেওয়া হ'লে, তিনি বর্ধমানের তৎকালীন জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের সাব্‌-রেজিষ্ট্রার পদের প্রার্থী হয়ে এক দরখাস্ত করেন,—কলকাতায় এসে প্রথমে ওঠেন তাঁর সতীর্থ শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'মেসে', অতঃপর উপরোক্ত কার্যালয়ে।

এর "পাঁচ-ছ মাস" পরের একটি ঘটনা তাঁর অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু সুগায়ক শ্রীনলিনীকান্ত সরকার বর্ণনা করেছেন এভাবে—

"নজরুল ইসলাম এই সময়ে থাকতেন মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে ৩২ নং কলেজ ষ্ট্রীটে ......মুজফ্‌ফর আহমদ সাহেব ছিলেন তাঁর সহকক্ষ-বাসীদের অন্যতম।

নজরুলের প্রাত্যহিক গতিবিধি ও কার্যসূচীর সন্ধান আগে থেকেই আমার জানা থাকতো। একদিন সারা বিকেলটা নজরুলের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ঠিক তার পরদিন সকাল বেলায় গিয়ে দেখি, নজরুল ঘরে নেই। তাঁর একজন সহকক্ষবাসী বন্ধু হাসতে হাসতে বললেন: 'সে তো কাল রাত্তিরে কুমিল্লার চলে গেছে।'

আমি বললাম: 'কই, কাল তো কিছুই বললে না!'

'বলবে কি ক'রে? কাল সন্ধ্যার পরে একজন ভদ্রলোক এসে কী সব কথাবার্তা ক'য়ে কুমিল্লা যাবার প্রস্তাব করলেন; প্রস্তাব, অনুমোদন, সমর্থন, সব মুহূর্তের মধ্যে—সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাত্রা।'........

নজরুলের এই সহকক্ষবাসী বন্ধুটি 'মোসলেম ভারত'-এর কর্ণধার আফজাল-উল্ হক্।........

কুমিল্লায় তো তিনি গেলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যায়—না চিঠি-পত্তর, না খোঁজ-খবর। লোক-মুখে ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা নানা গুজব রটতে লাগলো তাঁর সম্বন্ধে। সে-সবের সার সংকলন ক'রে দাঁড়ালো এই যে, তিনি প্রথমতঃ গিয়েছিলেন কুমিল্লার একটি পল্লী-গ্রামে। সেখান থেকে ফিরে এসে কুমিল্লা শহরে অবস্থান করছেন এবং * * প্রমুখ সেখানকার নেতৃবৃন্দের সহযোগে কুমিল্লা শহরটিকে বেশ তাতিয়ে তুলেছেন।"

—(কবিতা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫১ ।

ত্রিপুরা জেলার সেই 'পল্লীগ্রাম' থেকে কুমিল্লা শহরে আসা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নজরুলের সঙ্গে তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর যে-সকল চিঠি-পত্র আদান-প্রদান হয়, তা থেকে আংশিক উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করা যাক।

উক্ত 'পল্লীগ্রাম' থেকে লিখিত নজরুলের একখানি চিঠি পেয়ে সুসাহিত্যিক শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ১৯২১ সালের ৫ই জুন তারিখে তার জওয়াবে লেখেন :—

"ভাই নুরু, এইমাত্র তোর চিঠিখানা পেয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েচি। কারণ এই সুদীর্ঘ দিনগুলো কী ব্যাকুল প্রতীক্ষা নিয়েই না তোর চিঠির প্রতীক্ষা ক'রে আসছিলুম।........

"যখন আজ তোর চিঠিতে জানলুম যে, তুই স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তা'কে বরণ ক'রে নিয়েছিস, তখন অবশ্য আমার কোনো দুঃখ নেই। তবে একটা কথা, তোর বয়েস আমাদের চাইতে ঢের কম, অভিজ্ঞতাও তদনুরূপ ; feeling-এর দিকটা অসম্ভব রকম বেশী। কাজেই ভয় হয় যে, হয়ত বা দু'টা জীবনই ব্যর্থ হয় ! এ-বিষয়ে তুই যদি conscious, তা হলে অবশ্য কোনো কথা নেই। যৌবনের চাঞ্চল্যে আপাতঃমধুর মনে হলেও ভবিষ্যতে না পস্তাতে হয়। তুই নিজে যদি সব দিক ভেবে' চিন্তে' বরণ করাই ঠিক ক'রে থাকিস, তা হলে আমি সর্বন্তঃকরণে তোদের মিলন কামনা করছি।........

"বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে ? কবে ? সত্বর পত্র দিস্।"

এই জওয়াবের জের টেনে' পবিত্র বাবু ১৩২৮ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে নজরুলকে আবার লেখেন :—

"ভাই নুরু,... ...

যাঁকে পেয়েছিস্ তিনিই যে তোর "চির-জনমের হারানো গৃহলক্ষ্মী" এ-কথা সত্যি যদি এতটুকু সত্য হয়, তা হলে তোর সৌভাগ্যে আমার সত্যিই ঈর্ষা হচ্ছে। অবশ্য ইংরেজী ফরাসী উপন্যাসে এরূপ নায়ক-নায়িকার সঙ্গে ঢের পরিচয় হয়েছে, কাজেই তোর এ-কথা আমি সত্যি ব'লে মেনে নিতে গররাজী নই।....তোর বিয়েটা আমাদের একটা গল্পের প্লট হবে, এতে আর আশ্চর্য কি ! লিখেছিস্ : "এক অচেনা পল্লী-বালিকার কাছে এত বিব্রত আর অসাবধান হয়ে পড়েছি, যা কোন

নারীর কাছে কখনও হইনি।'....জেনে খুশীই হ'লাম যে "তাঁর বাইরের ঐশ্বর্যও যথেষ্টই" আছে।....

তোর বিয়েতে উপস্থিত থাকার ইচ্ছে যে আমার কত প্রবল, তা জানিয়ে কোন লাভ নেই।........তুই যে এরূপ একটা আজগুবি কাণ্ড বাধিয়ে বসবি, তা সকলে আমরা জানতুম।... ....

স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক জনাব মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী "মোহাম্মদী অফিস, ২৯, আপার সারকুলার রোড, কলকাতা" থেকে '১৩ই জুন ১৯২১' তারিখে এক পত্রে নজরুলকে লিখেন :

"অভিন্নহৃদয়েষু,

ভাই নজরুল, আপনার ৭ই তারিখের স্নেহমাখা চিঠিখানি আজ বিকালে পেয়ে কয়েকবার পড়েছি, আর অশান্তির মধ্যেও খুব হেসেছি।....

নিভৃত পল্লীর যে কুটির-বাসিনীর (দৌলৎপুরের দৌলৎখানার শাহজাদী বলাই বোধ হয় ঠিক, না?) সাথে আপনার মনের মিল ও জীবনের যোগ হয়ে গেছে, তাঁকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ আদাব জানাবেন।....আমার বোধ হয় আপনার বন্ধুরা অসন্তুষ্ট হয়েছেন একটা কারণে। আপনি 'নারায়ণে' 'দহন-মালা' লিখে নারীর কাছে ক্ষমা চাইলেন; তারপরেই এত সত্বর প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়লেন! 'যৌবনের জোয়ার' বড় সাংঘাতিক; তাকে ঠেলে রাখা বড় দায়—এ আমি স্বীকার করছি ...."

মিঃ মুজফ্ফর আহমদ ৫১ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা থেকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ই জুন তারিখে নজরুলকে এক পত্রে লেখেন :

"ভাই কাজী সাহেব,

ইতিমধ্যে আপনার কোনো পত্রাদি পাইনি। ওয়াজেদ মিয়ার চিঠিতে জনলুম যে, ৩রা আষাঢ় তারিখেই আপনাদের বিয়ে হচ্ছে।.... সময় খুব সংকীর্ণ....কাজেই আমার আর যাওয়া হচ্ছে না। তবে ভালয়

ভালয় সব মিটে যাক্, এ প্রার্থনা খোদার দরগাহে।........আমার আগের লেখা দু'খানা চিঠি বোধ হয় পেয়েছেন এতদিনে।........"

জনাব মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী "মোহাম্মদী অফিস" থেকে ১৬ই জুন তারিখে নজরুলকে লেখেন :

"ভাই নজরুল,

আপনার আগের চিঠিটার জওয়াব আগেই দিয়েছি।........আজ, এই কতক্ষণ হ'ল, রবিবারের চিঠিটাও পেলাম।........আপনার বিয়ের খবরটা তাড়াতাড়ি এই সপ্তাহের কাগজে বের ক'রে দিয়েছি। কিন্তু ভয় নেই, আপনার শ্রীমতীর কোনো নামই কাগজে ছাপা হয়নি।....মোহাম্মদী একখানা আপনাকে আজ পাঠিয়েছি....আপনি শিগ্‌গীর কলকাতায় আসছেন শুনে' সত্যি বড় খুশী হয়েছি।........

মিঃ মুজফ্‌ফর আহমদ ২১শে জুন তারিখে নজরুলের মামা-শ্বশুরকে এক পত্রে লেখেন :

"খান সাহেব,

বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছি, অবশ্য বিবাহ হইয়া যাওয়ার পরে। আগে পাওয়া গেলেও বোধ হয় ষ্ট্রাইকের জন্য যাওয়া তেমন সুসাধ্য হইত না।....যাহা হোক. আশা করি ভালয় ভালয় শুভ কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে।...."

মিঃ আহমদ ২৬শে জুন তারিখে নজরুলকে এক "অত্যন্ত গোপনীয়" পত্রে লেখেন :

"পরম প্রীতিভাজনেষু,

কাজী সাহেব, আপনার পত্রাদি যে আর মোটেই পাওয়া যাইতেছে না, তার কারণ কি ?....খান সাহেবের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছিলাম। পত্রখানা আপনারই মুসাবিদা-করা দেখিলাম। পত্রের ভাষা দু'এক জায়গায় বড় অসংযত হইয়াছে। একটু যেন কেমন দাম্ভিকতা প্রকাশ পাইয়াছে। আপনার হাত দিয়া অমন লেখা বাহির হওয়া কিছুতেই

ঠিক হয় নাই। আমার বড় ভয় হইতেছে যে, খান সাহেবের সংশ্রবে থাকিয়া আপনিও না শেষে দাম্ভিক হইয়া পড়েন। অন্যে বড় বলিলে গৌরবের কথা হয়, আর নিজেকে নিজে বড় বলিলে অগৌরবের মাত্রাই বাড়িয়া যায়। 'মোহাম্মদী'কে বিবাহের কথা ছাপিতে অনুরোধ করাটা ঠিক হইয়াছে কি ? তাঁরা ত নিজ হইতেই ও খবর ছাপিতে পারিতেন। ....বাস্তবিক আমার প্রাণেবড় লাগিয়াছে বলিয়া আমি এত কথা বলিলাম। এই নিমন্ত্রণ পত্র আবার 'অপূর্ব নিমন্ত্রণ-পত্র' শিরোনামে 'বাঙালী'তে মুদ্রিত হইয়াছে, দেখিলাম। 'বাঙালী'কে এই নিমন্ত্রণ-পত্র কে পাঠাইল ? ....আপনার অঙ্কলক্ষীকে এই অপরিচিতের বিনয়-সম্ভাষণ জানাইবেন।"

মুদ্রিত নিমন্ত্রণ-পত্রটিতে নজরুলের পিতা মরহুম কাজী ফকির আহমদ সাহেবের পরিচয় দেওয়া হয় চুরুলিয়ার 'আয়মাদার' বলে', আর নজরুলকে বলা হয় 'মুসলিম রবীন্দ্রনাথ'। মনে হয়, এ দু'টি কথাই ছিল মিঃ মুজফ্‌ফর আহমদের ব্যথিত হওয়ার কারণ।

উক্ত 'পল্লীগ্রাম' থেকে নজরুল কবে ও কিরূপে কুমিল্লার কান্দির-পাড়ে আসেন তা সঠিক বলা যায় না। কুমিল্লা এসে তিনি প্রাগুক্ত মামা-শ্বশুরকে 'বাবা শ্বশুর' সম্বোধন ক'রে এই চিঠিখানি লেখেন :—

কান্দিরপাড়, কুমিল্লা
23 July, 1921
(বিকেল বেলা।

বাবা শ্বশুর !

আপনাদের এই অসুর জামাই পশুর মতন ব্যবহার ক'রে এসে' যা কিছু কসুর করেছে, তা ক্ষমা করো সকলে, অবশ্য যদি আমার ক্ষমা চাওয়ার অধিকার থাকে। এইটুকু মনে রাখবেন, আমার অন্তর-দেবতা নেহায়েৎ অসহ্য না হয়ে পড়লে আমি কখনো কাউকে ব্যথা দিই না। যদিও ঘা খেয়ে খেয়ে আমার হৃদয়টাতে ঘাঁটা বুজে' গেছে, তবু সেটার অন্তরতম প্রদেশটা এখনো শিরীষ ফুলের পরাগের মতই কোমল আছে।

সেখানে খোঁচা লাগলে আর আমি থাকতে পারিনে। তা ছাড়া, আমিও আপনাদের পাঁচজনের মতন মানুষ, আমার গণ্ডারের চামড়া নয়, কেবল সহ্যগুণটা কিছু বেশী। আমার মান-অপমান সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞান ছিল না বা "কেয়ার" করিনি ব'লে, আমি কখনো এত বড় অপমান সহ্য করিনি, যাতে আমার 'ম্যানলিনেসে' বা পৌরুষে গিয়ে বাজে—যাতে আমাকে কেউ কাপুরুষ হীন ভাবতে পারে। আমি সাধ ক'রে পথের ভিখারী সেজেছি বলে' লোকের পদাঘাত সইবার মতন 'ক্ষুদ্র-আত্মা' অমানুষ হয়ে যাই নি। আপন জনের কাছ হতে পাওয়া অপ্রত্যাশিত এত হীন ঘৃণা, অবহেলা আমার বুক ভেঙে দিয়েছে। বাবা! আমি মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। দোওয়া করবেন, আমার এ ভুল যেন দু'দিনেই ভেঙে যায়—এ অভিমান যেন চোখের জলে ভেসে যায়!

বাকী উৎসবের জন্য যত শীগ্‌গীর পারি বন্দোবস্ত করবো। বাড়ীর সকলকে দস্তুর-মতো সালাম-দোয়া জানাবেন। অন্যান্য যাদের কথা রাখতে পারিনি, তাদের ক্ষমা করতে বলবেন। তাকেও ক্ষমা করতে বলবেন, যদি এ ক্ষমা চাওয়া ধৃষ্টতা না হয়। আরজ—ইতি।

চির-সত্য স্নেহ-সিক্ত—

নুরু

নজরুল কান্দিরপাড়ে যাঁর বাসায় অতিথি হয়েছিলেন তিনি (শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত) তৎকালে কুমিল্লায় কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডসের ইন্‌সপেক্টর ছিলেন। তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্রী হচ্ছেন নজরুলের বর্তমান পত্নী মিসেস্‌ প্রমীলা নজরুল ওরফে আশালতা সেনগুপ্তা। শ্রদ্ধেয়া প্রমীলার পিতা ত্রিপুরা রাজ্যে নায়েবের পদে কাজ করতেন; তাঁর পরলোক-গমনের পর বিধবা গিরিবালা দেবীর কন্যা প্রমীলাকে নিয়ে কুমিল্লায় চলে আসেন। অবশ্য শ্রদ্ধেয়া প্রমীলার সঙ্গে নজরুলের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় প্রায় তিন

বছর পরে, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল শুক্রবারে, কলকাতার ৬নং হাজী লেনে। ত্রিপুরার সেই 'পল্লীগ্রামে' অনুষ্ঠিত বিবাহ-অনুষ্ঠানে উক্ত সেনগুপ্ত-পরিবারের নারী-পুরুষ-ছেলে-মেয়ে মিলে মোট এগার জন যোগ দিয়েছিলেন। সে যা হোক, কান্দিরপাড় থেকে নজরুল কলকাতায় যে-পত্র লেখেন, তা পেয়ে মিঃ মুজফ্‌ফর আহমদ অতি কষ্টে (তখন রেলওয়েতে ধর্মঘট চলছিল) কুমিল্লায় আসেন এবং নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা ফিরে যান।

জনাব মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী তাঁর "নজরুলের আগে ও পরে" শীর্ষক প্রবন্ধে নজরুলের "পত্নী গ্রহণের কথা" বলতে গিয়ে লিখেছেন : "কুমিল্লার এক মুসলিম পরিবারে তাঁর প্রথম বিবাহ। কিন্তু কোনো কারণে অল্পদিন পরে এই পত্নীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে।" (মাহে নও, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১)। নজরুল যখন ৩।১সি নং তালতলা লেনে মিঃ আহমদের সঙ্গে বাস করছেন, সে-সময় এই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে।

কিন্তু বিচ্ছেদ ঘটলেও নজরুল তাঁর প্রথমা পত্নীকে বিস্মৃত হতে পারেননি। উক্ত ঘটনার প্রায় ষোল বছর পরে সেই পরিত্যক্ত পত্নীকে সম্বোধন ক'রে তিনি এই অবিস্মরণীয় পত্রখানি লিখেছিলেন :—

106 Upper Chitpur Road
"Gramophone-Rehearsal Room"
Calcutta.
1—7—37

কল্যাণীয়াসু !

"তোমার পত্র পেয়েছি—সেদিন নববর্ষার নবঘন-সিক্ত প্রভাতে। মেঘ-মেদুর গগনে সেদিন অশান্ত ধারায় বারি ঝরছিল। পনর বছর আগে এমনি এক আষাঢ়ে এমনি বারিধারার প্লাবন নেমেছিল—তা তুমিও হয়তো স্মরণ করতে পারো। আষাঢ়ের নব মেঘপুঞ্জকে আমার নমস্কার। এই মেঘদূত বিরহী যক্ষের বাণী বহন করে' নিয়ে গিয়েছিল

কালিদাসের যুগে, রেবা নদীর তীরে, মালবিকার দেশে, তাঁর প্রিয়ার কাছে। এই মেঘপুঞ্জের আশীর্বাণী আমার জীবনে এনে দেয় চরম বেদনার সঞ্চয়। এই আষাঢ় আমায় কল্পনার স্বর্গলোক থেকে টেনে ভাসিয়ে দিয়েছে বেদনার অনন্ত স্রোতে। যাক, তোমার অনুযোগের অভিযোগের উত্তর দিই।

তুমি বিশ্বাস করো, আমি যা লিখছি তা সত্য। লোকের মুখের শোনা কথা দিয়ে যদি আমার মূর্তির কল্পনা ক'রে থাকো, তা হলে আমায় ভুল বুঝবে—আর তা মিথ্যা।

তোমার উপর আমি কোন 'জিঘাংসা' পোষণ করি না—এ আমি সকল অন্তর দিয়ে বলছি। আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কি গভীর ক্ষত, কি অসীম বেদনা! কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি—তা দিয়ে তোমায় কোনদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তুমি এই আগুনের পরশ-মাণিক না দিলে আমি অগ্নিবীণা বাজাতে পারতাম না—আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না। তোমার যে কল্যাণ-রূপ আমি আমার কিশোর বয়সে প্রথমে দেখে-ছিলাম, যে রূপকে আমার জীবনের সর্বপ্রথম ভালবাসার অঞ্জলি দিয়েছিলাম, সে রূপ আজও স্বর্গের পারিজাত-মন্দারের মত চির-অম্লান হয়েই আছে আমার বক্ষে। অন্তরের আগুন বাইরের সে ফুলহারকে স্পর্শ করতে পারেনি।

তুমি ভুলে যেও না, আমি কবি—আমি আঘাত করলেও ফুল দিয়ে আঘাত করি। অসুন্দর, কুৎসিতের সাধনা আমার নয়। আমার আঘাত বর্বরের কাপুরুষের আঘাতের মত নিষ্ঠুর নয়। আমার অন্তর্যামী জানেন (তুমি কি জান বা শুনেছ, জানি না) তোমার বিরুদ্ধে আজ আমার কোন অনুযোগ নেই, অভিযোগ নেই, দাবীও নেই।

আমি কখনো কোনো 'দূত' প্রেরণ করিনি তোমার কাছে। আমাদের মাঝে যে অসীম ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে, তার 'সেতু' কোন লোক ত নয়ই—স্বয়ং বিধাতাও হতে পারেন কিনা সন্দেহ। আমায় বিশ্বাস করো, আমি সেই 'ক্ষুদ্র'দের কথা বিশ্বাস করিনি। করলে পত্রোত্তর দিতাম না। তোমার উপর আমার কোন অশ্রদ্ধাও নেই, কোন অধিকারও নেই—আবার বলছি। আমি যদিও গ্রামোফোনের ট্রেড মার্ক 'কুকুরের' সেবা করছি, তবুও কোন কুকুর লেলিয়ে দিই নাই। তোমাদেরই ঢাকার কুকুর একবার আমায় কামড়েছিল আমার অসাবধানতায়, কিন্তু শক্তি থাকতেও আমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করিনি—তাদের প্রতি আঘাত করিনি।

সেই কুকুরদের ভয়ে ঢাকায় যেতে আমার সাহসের অভাবের উল্লেখ করেছ, এতে হাসি পেল। তুমি জান, ছেলেরা (যুবকেরা) আমায় কত ভালবাসে। আমারই অনুরোধে আমার ভক্তরা তাদের ক্ষমা করেছিল। নৈলে তাদের চিহ্ন-ও থাকত না এ পৃথিবীতে। তুমি আমায় জানবার যথেষ্ট সুযোগ পাওনি, তাই এ কথা লিখেছ।....যাক, তুমি রূপবতী, বিত্তশালিনী, গুণবতী, কাজেই তোমার উমেদার অনেক জুটবে—তুমি যদি স্বেচ্ছায় স্বয়ম্বরা হও, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। আমি কোন্ অধিকারে তোমায় বারণ করব—বা আদেশ দিব? নিষ্ঠুরা নিয়তি সমস্ত অধিকার থেকে আমায় মুক্তি দিয়েছেন।

তোমার আজিকার রূপ কি, জানি না। আমি জানি তোমার সেই কিশোরী মূর্তিকে, যাকে দেবীমূর্তির মত আমার হৃদয়-বেদীতে অনন্ত প্রেম অনন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। সেদিনের তুমি সে বেদী গ্রহণ করলে না। পাষাণ-দেবীর মতই তুমি বেছে নিলে বেদনার বেদী-পীঠ।....জীবন ভ'রে সেইখানেই চলেছে আমার পূজা-আরতি। আজকার তুমি আমার কাছে মিথ্যা, ব্যর্থ; তাই তাকে

পেতে চাইনে। জানিনে হয়ত সে রূপ দেখে বঞ্চিত হব, অধিকতর বেদনা পাব,—তাই তাকে অস্বীকার ক'রেই চলেছি।

দেখা ? না-ই হ'ল এ ধূলির ধারায়! প্রেমের ফুল এ ধূলিতলে হয়ে যায় ম্লান, দগ্ধ, হতশ্রী। তুমি যদি সত্যই আমায় ভালবাস' আমাকে চাও, ওখানে থেকেই আমাকে পাবে। লায়লী মজনুঁকে পায়নি, শিরিঁ ফরহাদকে পায়নি, তবু তাদের মত ক'রে কেউ কারো প্রিয়তমকে পায়নি। আত্মহত্যা মহাপাপ, এ অতি পুরাতন কথা হলেও পরম সত্য। আত্মা অবিনশ্বর, আত্মাকে কেউ হত্যা করতে পারে না। প্রেমের সোনার-কাঠির স্পর্শ যদি পেয়ে থাক, তা হলে তোমার মত ভাগ্যবতী কে আছে ? তারি মায়া-স্পর্শে তোমার সকল কিছু আলোয় আলোময় হয়ে ওঠবে। দুঃখ নিয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে গেলেই সেই দুঃখের অবসান হয় না। মানুষ ইচ্ছা করলে সাধনা দিয়ে, তপস্যা দিয়ে ভুলকে ফুল-রূপে ফুটিয়ে তুলতে পারে। যদি কোন ভুল ক'রে থাক জীবনে, এই জীবনেই তার সংশোধন ক'রে যেতে হবে; তবেই পাবে আনন্দ, মুক্তি; তবেই হবে সর্ব দুঃখের অবসান। নিজেকে উন্নত করতে চেষ্টা কর, স্বয়ং বিধাতা তোমার সহায় হবেন। আমি সংসার করছি, তবু চলে গেছি এই সংসারের বাধাকে অতিক্রম করে' উর্ধ্বলোকে —সেখানে গেলে পৃথিবীর সকল অসম্পূর্ণতা, সকল অপরাধ ক্ষমা-সুন্দর চোখে পরম মনোহর মূর্তিতে দেখা দেয়।....

হঠাৎ মনে পড়ে গেল পনর বছর আগেকার কথা। তোমার জ্বর হয়েছিল, বহু সাধনার পর আমার তৃষিত দু'টি কর তোমার শুভ্র-সুন্দর ললাট স্পর্শ করতে পেরেছিল; তোমার সেই তপ্ত ললাটের স্পর্শ যেন আজও অনুভব করতে পারি। তুমি কি চেয়ে' দেখেছিলে ? আমার চোখে ছিল জল, হাতে সেবা করার আকুল স্পৃহা, অন্তরে শ্রীবিধাতার চরণে তোমার আরোগ্য লাভের জন্য করুণ মিনতি। মনে হয় যেন কাল্‌কার কথা। মহাকাল সে স্মৃতি মুছে' ফেলতে পারলেন না। কী

উদগ্র অতৃপ্তি, কী দুর্দমনীয় প্রেমের জোয়ারই সেদিন এসেছিল! সারা দিনরাত আমার চোখে ঘুম ছিল না।

যাক—আজ চলেছি জীবনের অস্তমান দিনের শেষ রশ্মি ধরে' ভাটার স্রোতে। তোমার ক্ষমতা নেই সে পথ থেকে ফেরানোর। আর তার চেষ্টা করো না।

তোমাকে লেখা এই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি হোক। যেখানেই থাকি. বিশ্বাস করো, আমার অক্ষয় আশীর্বাদী কবচ তোমায় ঘিরে থাকবে। তুমি সুখী হও, শান্তি পাও—এই প্রার্থনা। আমায় যত মন্দ বলে বিশ্বাস কর, আমি তত মন্দ নই—এই আমার শেষ কৈফিয়ৎ। ইতি—

নিত্য শুভার্থী—
নজরুল ইসলাম

P. S.

আমার 'চক্রবাক' নামক কবিতা-পুস্তকের কবিতাগুলো পড়েছ? তোমার বহু অভিযোগের উত্তর পাবে তাতে। তোমার কোনো পুস্তকে আমার সম্বন্ধে কটূক্তি ছিল। ইতি—

"Gentleman."

নজরুলের সুবিখ্যাত 'চক্রবাক' কাব্যের 'হিংসাতুর' কবিতাটির কয়েকটি চরণ এই—

"হিংসাই শুধু দেখেছ এ চোখে? দেখ নাই আর কিছু?
সম্মুখে শুধু রহিলে তাকায়ে, চেয়ে' দেখিলে না পিছু?
ব্যথা যে দিয়েছে, সম্মুখে ভাসে নিষ্ঠুর তার কায়া,
দেখিলে না তব পশ্চাতে তারি অশ্রু-কাতর ছায়া।
অপরাধ শুধু মনে আছে তার, মনে নাই কিছু আর?
মনে নাই, তুমি দলেছ দু'পায়ে কবে কার ফুলহার?

কাঁদায়ে কাঁদিয়া সে রচেছে তাঁর অশ্রুর গড়খাই,
পার হতে তুমি পারিলে না তাহা, সে-ই অপরাধী তাই ?
সেই ভালো, তুমি চিরসুখী হও, একা সে-ই অপরাধী।
কি হবে জানিয়া, কেন পথে পথে মরুচারী ফেরে কাঁদি' ?"

উক্ত মহিলার রচিত 'কোনো পুস্তকে' নজরুল সম্বন্ধে বক্রোক্তি ছিল, সেদিকে আমি একদিন কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কবি ২৯।৩।২৮ইং তারিখে 'সওগাত'-অফিসে বসে 'হিংসাতুর' কবিতাটি রচনা করেন। 'হিংসাতুর' ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়। উপরোদ্ধৃত দীর্ঘ পত্রটিতে যে-সকল কথা বলা হয়েছে, 'হিংসাতুর'-এ আছে তারই অনবদ্য কাব্য-রূপ।

'মাহে নও'

আগষ্ট ১৯৫৪, ভাদ্র ১৩৬১।

নজরুল-কাব্যলোক

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে রহিয়াছে প্রধানতঃ অদ্ভুত তত্ত্ব আর বাক্‌কৌশল। নজরুলের রচনাতেই আমরা প্রথম পাইলাম জীবনের পরম আস্বাদ। ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'সওগাতে' প্রকাশিত 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'র মধ্যে তাঁহার শক্তির প্রথম স্ফুরণ দেখা যায়। ১৩২৬ সালে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার কয়েকটি ছোট গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হয়, করাচীর সেনানিবাসে সেগুলির জন্ম। সহজ সৌন্দর্যসৃষ্টি ও প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গী সেই গল্পগুলির বিশেষত্ব। সে-সমস্ত রচনায় বাক্‌চাতুরী নাই, তত্ত্বান্বেষী মানস-কণ্ডুয়ন নাই,—আছে জীবনের সহজ অনুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। সাহিত্য যে জীবন-বিটপির পুষ্প, নজরুল-সাহিত্যের সুরভি আস্বাদন করিয়া বাঙ্গলার শিক্ষিত মুসলমান তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছে।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের আসানে নজরুল যখন কলিকাতায় আসেন, তখন খেলাফত আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া তাঁহার মনে পুর্ণভাবেই কার্যকরী হইয়াছিল। সেকালের বহু চিন্তাশীল মুসলমানের মতন নজরুলও তাই প্যান-ইস্‌লামের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার বহু রচনায় সুস্পষ্ট হইয়া আছে। সুবিখ্যাত সুবেহ্-উম্মেদ কবিতায় আছে :

> জাগিল আবার ইরান তুরান
> মরক্কো অফগান মেসের—
> সর্বনাশের পরে পৌষ মাস
> এলো কি আবার ইসলামের।

কিন্তু এই জাগরণের মূলে রহিয়াছে কোন্ জীবন-মন্ত্র, তাহা দেখা দরকার। মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমিকত্ব রক্ষার জন্য উদ্দীপনা দেখিয়াই কবি আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছেন। অবশ্য এ-কথা সত্য

যে, খেলাফৎ-যুগের বিশিষ্ট আবহাওয়ায় নজরুলের আবির্ভাব হইলেও খেলাফৎ-পরবর্তী যুগের চিন্তাসম্পদই তাঁহার রচিত সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। কামাল পাশার স্মার্ণা উদ্ধারের সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া আমাদের কবি আনন্দের আবেগে যে-স্মরণীয় কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আছে :

ও কে আসে ? আনোয়ার ভাই ?
আনোয়ার ভাই, হর্দম দাও লাফ,
আজ জানোয়ার সব সাফ্ !

প্যান-ইসলাম-মন্ত্রের সাধক আনোয়ার পাশার সঙ্গে সাধারণতন্ত্রের সমর্থক কামাল পাশার বিরোধ ইতিহাস-পাঠকের অজানা নাই। কিন্তু আমদের কবি এই দুই মহাবীরকেই অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন। কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শবাদের জন্য নয়, যৌবনের উদ্দামতা দেখিয়াই তাঁহার কণ্ঠে জাগিয়াছে আনন্দ-গীতি। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :

বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তূর্য,
হুঁশিয়ার ইসলাম ডোবে তব সূর্য !

মুসলিম রাষ্ট্রগুলির বিলোপে হইবে ইস্‌লামের মতন এক চিরন্তনী আদর্শের পতন, এই চিন্তার মধ্যে দুর্বলতা আছে কিনা বিবেচ্য। শক্তিমন্ত ও বিচারশীল মানুষ হিসাবে মুসলমানের প্রতিষ্ঠাতেই হইবে ইসলামের সার্থকতা, এই কথা কামাল-ভক্ত কবি নিশ্চয়ই জানেন। খেলাফৎ-পরবর্তী বাঙ্গলা-সাহিত্যে কামাল-পন্থীদের প্রভাব সামান্য হইলেও লক্ষ্যযোগ্য। ধর্মসঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা ও ধর্মাচারের অনুশাসন অস্বীকার, বিচার-বুদ্ধির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, আধুনিক জীবন ও জগতের প্রতি কৌতূহলী দৃষ্টি, এ-সমস্তকে সমর্থন করিয়া বঙ্গদেশে যে-আন্দোলন প্রবর্তিত হয়, নজরুল তাহার অন্যতম প্রধান অধিনায়ক। অবশ্য এ-সম্পর্কে তাঁহার বাণীতে যথেষ্ট তীক্ষ্ণতা নাই। তবে প্রশংসার

বিষয় যে, নিগৃহীত মুসলমানের মুক্তির জন্যে ধর্মনেতা অপেক্ষা তিনি রাষ্ট্রবীরের আবির্ভাবই অধিকতর কাম্য মনে করিয়াছেন :

খালেদ ! খালেদ ! জাজিরাতুল্ সে আরবের পাক মাটী
পলিদ হইল, খুলেছে সেথায় য়ুরোপ পাপের ভাটী।
মওতের দারু পিইলে ভাঙে না হাজার বছরী ঘুম ?
খালেদ ! খালেদ ! মাজার আঁকড়ি' কাঁদিতেছে মজলুম।
খোদার হাবিব বলিয়া গেছেন, আসিবেন ঈসা ফের,
চাহি না মেহ্‌দি, তুমি এস বীর হাতে নিয়ে শমসের !

কিন্তু তাঁহার এ-ধরণের কবিতায় বীর্যবত্তার প্রকাশ অপেক্ষা বেশী রহিয়াছে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বের মানুষের দুরবস্থার জন্য বেদনাবোধ। সেই দুর্গতির ছবি ফুটাইতে গিয়া স্থানে স্থানে তাঁহার নভোবিহারী কবি-কল্পনা মর্তের ধূলি-কর্দমে ম্লান না হইয়া পারে নাই।

রীশ-ই-বুলন্দ্, শেরওয়ানী চোগা, তস্‌বী ও টুপী ছাড়া
পড়ে না ক কিছু, মুসলিম-গাছ ধরে' যত দাও নাড়া।

—('খালেদ', জিঞ্জির)

শুনে হাসি পায়, ইহাদের নাকি আছে গো ধর্ম জাতি,
রামছগল আর ব্রহ্মছাগল আরেক ছাগল পাঁতি।

—('চিরঞ্জীব জগলুল', জিঞ্জীর)

আমাদের পঙ্গতার জন্য অতিরিক্ত উদ্বাস্ততার ফলেই হয়ত তাঁহার বহু কবিতার গঠন যথেষ্ট আঁটসাট ও সুঠাম হইতে পারে নাই। কাব্যের গঠনরূপে এই শৈথিল্যের জন্য তাঁহার বহু রচনাই দূরকালের পাঠকদের রসতৃষ্ণা হয়ত পুরোপুরি মিটাইতে সমর্থ হইবে না। তিনি কিন্তু যুগ-প্রয়োজন মিটাইতে কার্পণ্য করেন নাই। তিনি নিজেকে বলিয়াছেন 'বর্তমানের কবি', Posterity-এর জন্য পরোয়া করেন নাই,—সর্বান্তঃকরণে কামনা করিয়াছেন আমাদের অধঃপতিত জীবনের শ্রীবৃদ্ধি।

পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি, যুগের হুজুগ কেটে' গেলে ;
মাথার উপরে রয়েছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।

এই বাণীতে সুস্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথ ও সাম্প্রতিক সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তিনি কতখানি শ্রদ্ধাশীল। সুষ্ঠু কাব্যরূপের সাধনা না করিলেও তিনি জীবন-সাধক ; এই জীবনানুভূতি তাঁহার রচনায় স্বতঃস্ফূর্ত। রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' :

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছে, তুমি কি বেসেছ ভালো ?

আর নজরুল 'ফরিয়াদ' করিয়াছেন :

এই ধরণীর ধূলি-কাদা-মাখা অসহায় সন্তান
মাগে প্রতিকার, উত্তর দাও আদি-পিতা ভগবান !

পৃথিবীর অন্যায়-অবিচার দেখিয়া বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কবি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন :

জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য
তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ পাতাল মর্ত্য !....
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদচিহ্ন।
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।

ভগবানের সৃষ্টির অসম্পূর্ণতা দেখিয়া জাগ্রতশক্তি ভক্তের মনে জাগিয়াছে দুর্জয় অভিমান। তাই 'আমিত্ব' সম্বন্ধে সচেতন কবি করিতে চাহিয়াছেন বিদ্রোহ-লীলা। তিনি 'দুর্দিনের যাত্রী'তে বলিয়াছেন :

"আপনাকে চেন। বিদ্রোহের মত বিদ্রোহ যদি করতে পার, তবে নিদ্রিত শিব জাগবেই, কল্যাণ আসবেই। লাথির মত যদি মারতে পার, তবে ভগবানও তা বুকে ক'রে রাখে। ভৃগুর মতো বিদ্রোহী হও, ভগবানও তোমার পায়ের ধুলো নেবে। কাউকে মেনো না, কোনো ভয়ে ভীত হয়ো না বিদ্রোহী।........বলো আমিই নূতন ক'রে জগৎ সৃষ্টি

করব।........জাগো অচেতন, জাগো! আত্মাকে চেন! যে-মিথ্যুক তোমার পথে এসে দাঁড়ায়, পিষে' দিয়ে যাও তাকে ; দেখবে তোমারই পতাকা-তলে বিশ্ব শির লুটাচ্ছে। তোমারই আদর্শে জগৎ অধীনতার বাঁধন কেটে আকাশ-তলে এক পংক্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে।"

মানুষের আত্মবোধ জাগ্রত হোক্, পরম সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হোক, সর্বপ্রকার ভ্রুকুটীকে অগ্রাহ্য করিয়া সমাজ-সাম্যের প্রতিষ্ঠা করুক,—ইহাই কবির কাম্য। যে দুরন্তের দল সকল বন্ধন অস্বীকার করিয়া মহাজীবনের আকর্ষণে ছুটিয়া চলিয়াছে, তিনি প্রাণ ভরিয়া তাঁহাদেরই জয়গান গাহিয়াছেন :

সেদিন নিশীথ-বেলা
দুস্তর পারাবারে যে-যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা,
প্রভাতে সে আর ফিরিল না কূলে। সেই দুরন্ত লাগি'
আঁখি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশীথে জাগি'।

এই জরা-মরার দেশে কবি গাহিয়াছেন উদ্দাম যৌবনের গান, পথের সঠিক সন্ধান দিতে না পারিলেও পথে বাহির হইবার জন্য আমাদের জানাইয়াছেন উদাত্ত আহ্বান। অপূর্ব উন্মাদনা লইয়া অহোরাত্র করিয়াছেন যৌবনের বন্দনা-গীতি রচনা :

গাহি তাহাদেরই গান
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি' ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিণাঙ্ক কঠিন যাদের নির্দয় মুঠিতলে
ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভ'রে ফুল-ফলে।

অনেকের মতে নজরুল বিপ্লবী-কবি। তিনি বাঙলা ভাষায় সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক বৈপ্লবিক কবিতা রচনা করিয়াছেন। এই জীবনবাদী কবির রচনায় বিপ্লব সৃষ্টির আকাঙ্খাও প্রকাশ পাইয়াছে :

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব-হেতু,
স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।

তিনি কবি-কল্পনায় বিপ্লব-লীলা দেখিয়াছেন ; তাহাতে উন্মাদনা আছে, কিন্তু সুস্পষ্ট পথনির্দেশ নাই। তবে দেশের জন্য আনন্দের সংবাদ এই যে, বাঙালী মুসলমানদিগের মধ্যে তাঁহারই কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হইয়াছে উদার স্বাজাত্যবোধের উদাত্ত সুর। দেশের মাটি ও মানুষের দিকে তিনিই প্রথম চাহিয়াছেন সচেতন প্রেমের দৃষ্টিতে, পারিপার্শ্বিক মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্খা তাঁহার বাণীতে করিয়াছে রসমূর্তি-লাভ। তাঁহার দেশবাসীর বীর্য ও ভীরুতার বিষয় তিনি সম্যক্ অবগত আছেন বলিয়াই বিপ্লব-মহিমা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন :

ধ্বংস দেখে' ভয় কেন তোর ?
প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন !
আস্‌ছে নবীন জীবন-হারা
অসুন্দরে করতে ছেদন।

অন্যত্র বলিয়াছেন :

ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব-পূর্ণিমা।

এই অসুন্দর জীবন-ব্যবস্থার বিলোপ করিয়া তিনি চাহিয়াছেন নব-সমাজ প্রতিষ্ঠা। তাঁহার কবি-কল্পনায় ধরা দিয়াছে নব-জীবনের ছবি :

শুনিতেছি আমি, শোন্ ঐ দূরে তূর্যনাদ
ঘোষিছে নবীন উষার উদয়-সুসংবাদ।

কবির আকাঙ্খিত নব্য-সমাজ হইতেছে অক্ষয় যৌবনের দেশ, অবাধ মুক্তির ক্ষেত্র।

যুবা-যুবতীর সে দেশে ভিড়,
সেথা যেতে নারে বুঢ়া পীর,

শাস্ত্র-শকুন জ্ঞান-মজুর
যেতে নারে সেই হুর-পরীর
শরাব-সাকীর গুলিস্তাঁয়।
আয় বেহেস্তে কে যাবি আয়!

নজরুলের এ-ধরনের কবিতায় উদ্দীপনার প্রকাশ অপেক্ষা সৌন্দর্য-বর্ণনা প্রবলতর। তাঁহার বীররসের কবিতা 'বিদ্রোহী'তে আছে :

আমি দেবশিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্বমায়ের অঞ্চল।
আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী,
মহা- সিন্ধু উতলা ঘুম্ ঘুম্
ঘুম্ চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝ্‌ঝুম্
মম বাঁশরীব তানে পাশরি'।
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।

এই 'বিদ্রোহ' শ্রীকৃষ্ণের লীলাচাঞ্চল্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনি একদিকে যেমন বলিয়াছেন, "মানি না কো কোনো আইন", অন্যদিকে তেমনই "গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি"র মায়ায় ধরা দিয়াছেন। তাঁহার 'আলেয়া' নাটকের সুন্দরীরা গাহিতেছে :

যৌবন-তটিনী ছুটে' চলে ছলছল।
ধরণীর তরণী টলমল টলমল॥

এই যৌবন-বেগে কিন্তু সৌন্দর্যই চতুর্দিকে উচ্ছ্রিত হইয়া পড়িতেছে। তাঁহার 'বাঁধনহারা' উপন্যাসে 'সাহসিকা'র এক পত্রে যে-বিদ্রোহিতার আভাস আছে, পরবর্তী-কালে 'বিদ্রোহী' কবিতায় তাহারই পূর্ণবিকাশ দেখা যায়। কিন্তু এই 'বাঁধনহারা' উপন্যাসের মূলে রহিয়াছে তরুণ প্রেমের ব্যর্থতা। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের দিকে একটি প্রেমের কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন :

তোমার অধরে আঁখি পড়ে যবে, অধীর তৃষ্ণা জাগে,
মোর কবিতায় রস হয়ে সেই তৃষ্ণার রঙ্ লাগে।
জাগে মদালস-অনুরাগ-ঘন নব-যৌবন-নেশা
এই পৃথিবীরে মনে হয় যেন শিরাজী আঙুর-পোষা!
সুর হয়ে ওঠে সুরা যেন, আমি মদিরা-মত্ত হয়ে
যৌবন-বেগে তরুণেরে ডাকি খর তরবারি লয়ে।
জরাগ্রস্ত জাতিরে শুনাই নব-জীবনের গান,
সেই যৌবন-উন্মাদ বেগ, হে প্রিয়া, তোমারি দান।

—('আমার কবিতা তুমি', সওগাত, চৈত্র, ১৩৪৭)

নারী-প্রেমের আকর্ষণেই জাগিয়াছে তাঁহার যৌবনোচ্ছ্বাস; সেই উদ্বেলিত হৃদয়-তরঙ্গ সুপ্ত বিশ্ব-প্রান্তে গিয়া আঘাত হানিয়াছে। তিনি 'সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' দেখিয়াছেন একদিকে:

ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে

অন্যদিকে:

কপট কোপের তূণ ধরি'
ঐ আসে যত সুন্দরী।

প্রধানতঃ নারীরপ্রেমের প্রেরণা হইতেই তাঁহার বিদ্রোহ-ভাবের জন্ম; তাই পরিণামে সেই দৈবী-প্রতিভার প্রকাশ হইয়াছে প্রেমের কবিতায়, বিশেষতঃ সঙ্গীত রচনায়।

অশান্ত সমুদ্র দেখিয়া বিরাট জীবন-স্পন্দন তিনি অনুভব করেন নাই; তিনি সেই উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গের মধ্যে দেখিয়াছেন বিরহোচ্ছ্বাস। সমুদ্রকে ভাবিয়াছেন সমব্যথী.

নমস্কার লহ,
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া অহরহ।

এই বিরাট বিরহ-বোধ শেষ পর্যন্ত আনিয়াছে জীবনে কেমন এক মধুর ক্লান্তি,—ছন্দোদোলায়ও লাগিয়াছে কেমন অবসন্ন মন্থরতা :

নিশীথিনী যায় দূর বনছায় তন্দ্রায় ঢুলঢুল,
ফিরে ফিরে চায়, দু'হাতে জড়ায় আঁধারের এলোচুল।
জেগে' দেখি মোর বাতায়ন-পাশে জাগিছে স্বপনচারী
নিশীথ-রাতের বন্ধু আমার গুবাক-তরুর সারি।

যে-প্রেম চিত্তকে রাখে চির-সজীব, সেই সুগভীর প্রেম যেন এ নয়। অর্থাৎ, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ যেন তাঁহার প্রেমের স্বভাব নয়। মিলন বা বিরহের রসে নিঃশেষে আত্মনিমজ্জন তাঁহার দ্বারা তেমন সম্ভব হয় না।

নজরুল ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা 'বিদ্রোহী'তে একালের মানুষের বিদ্রোহের বাণী রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে, বলা হইয়া থাকে। কিন্তু লক্ষ্যের বিষয় যে, এ-কবিতা সমিল-মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। অক্ষরবৃত্ত ছন্দই বিপুল ভাবের ভার বহন করিয়া চলিতে পারে; সে-ছন্দের গতি মন্থর হইলেও তাহা বীররস প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী। হৃদয়-তন্ত্রীর সূক্ষ্ম সুরগুলি উত্তমরূপে প্রকাশ করা চলে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে। এই ধ্বনিমাত্রিক গীতচ্ছন্দে 'বিদ্রোহী' বিরচিত; তাই বীররসের অবসরে তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে চটুলতা :

গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি,
ছল ক'রে দেখা অনুখন,—
চপল মেয়ের ভালবাসা, তার
কাঁকন চুঁড়ির কনকন।

'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে দেখা গিয়াছিল যে 'লিরিক্' উপাদান, তাহাই তাঁহার পরবর্তীকালের রচনায় প্রবলতর হইয়া ওঠে।

'সওগাত'
আশ্বিন, ১৩৫০।

নজরুলের গীতি-কবিতা

বাঙলা দেশ গীতি-কবিতার দেশ। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব বাঙলা সাহিত্যে আজও কম অনুভূত হয় না। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে নূতন করিয়া এই গীতি-কাব্যের মাধুরী বাঙলা সাহিত্যে সিঞ্চিত হইতে থাকে। নজরুল ইসলাম জীবনের প্রারম্ভ হইতেই সে-ধারাকে অস্বীকার করেন নাই। তাঁর প্রথম জীবনের কবিতা-পুস্তক 'ছায়ানটে'ই আমরা তাঁর কবি-মানসের এই প্রবণতা লক্ষ্য করিযা থাকি—

ঐ রাঙা পায়ে রাঙা আলতা প্রথম যেদিন প'রেছিলে,
সেদিন তুমি আমায় কি গো ভুলেও মনে ক'রেছিলে—
আল্‌তা যেদিন প'রেছিলে ?

সুরের বলিষ্ঠতা সত্বেও এ-কবিতায় পদাবলীর ললিত মাধুর্য আস্বাদন করা যায়। নজরুল চিব-বাউল; ঘরের বন্ধন তাঁকে কোনোদিন বাঁধিতে পারে নাই—

সে যে পথের চির-পথিক, তার কি সহে ঘরের মায়া ?
দূর হতে ঐ দূরান্তরে ডাকে তারে পথের ছায়া ॥
মাঠের পারে বনের মাঝে
চপল তাহার নূপুব বাজে—
ফুলের সাথে ফুটে বেড়ায়. মেঘের সাথে যায় পাহাড়ে—
ধরা দিয়েও দেয় না ধরা, জানি না সে চায় কাহারে ॥

—(দোলন-চাঁপা)

এই বাঁধন-হারা চির-পথিক কখনও কখনও পৃথিবীর প্রেমে ধরা দিতে প্রলুব্ধ হইয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁকে কোনা মর্ত্য-রমণী বেশীদিন স্নেহাঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন নাই। অভিমানে কবি বলিয়াছেন—

যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে!
অস্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে!
ছবি আমার বুকে বেঁধে
পাগল হয়ে কেঁদে কেঁদে
ফিরবে মরু কানন গিরি
আকাশ সাগর বাতাস চিরি'
যেদিন আমায় খুঁজবে,
বুঝবে সেদিন বুঝবে॥

এই পৃথিবীর কোনো মানব-প্রিয়ার নিকট অবহেলা পাইয়া কবির এই যে অভিশাপ, তাতে তীব্রতা তেমন নাই—আছে মধুর অভিমান। কিন্তু এই অভিমানও দীর্ঘস্থায়ী নয়। এই অনাদরে তিনি ভাঙিয়া পড়েন নাই। কবি বলিয়াছেন—

দূর বাউলের গানে ব্যথা হানে বুঝি শুধু ধূ ধূ মাঠে পথিকে?
এ যে মিছে অভিমান, পরবাসী! দেখে ঘরবাসীদের ক্ষতি কে!
তবে জান কি তোমার বিদায়-কথায়
কত বুক-ভাঙা গোপন ব্যথায়
আজ কতগুলি প্রাণ কাঁদিছে কোথায়—
পথিক! ওগো অভিমানী দূর পথিক!
কেহ ভালোবাসিল না ভেবে যেন আজো মিছে ব্যথা পেয়ে যেয়ো না।
ওগো যাবে যাও তুমি বুকে ব্যথা নিয়ে যেয়ো না॥

সমস্ত ব্যর্থতার বেদনা হইতে কবিকে বারবার উদ্ধার করিয়াছে তাঁর অশান্ত জীবন বেগ, অনন্ত জীবনের জন্য উন্মাদ আগ্রহ। তিনি বলিয়াছেন—

খণ্ড ক'রে দেখ্‌বে যারা অসীম জীবনটাই,
দুঃখ তা'রাই করুক ব'সে, দুঃখ মোদের নাই।
আমরা জানি, অস্ত-খেয়ায় আস্‌ছে রে উদয়।
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়।
বিশ্বাসী! বল্‌ আসবে আবার প্রভাত-রবির জয়॥
—(ফণি-মনসা)

যৌবনের আনন্দ-আবেগে তিনি অন্ধকারের মধ্যেও গাহিয়াছেন প্রভাতের আগমনী গান। এই যৌবনের উন্মাদনাই তাঁকে এক স্থানে স্থির হইতে দেয় নাই। যদিও কবি একদা বলিয়াছেন—

হে মোর রাণী! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।
আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে॥
আমার সমর-জয়ী অমর তরবারী
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হয়ে ওঠে ভারী,
এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি,
এই হা'র-মানা-হার পরাই তোমার কেশে॥
ওগো জীবন-দেবি!
আমায় দেখে কখন তুমি ফেল্‌লে চোখের জল,
আজ বিশ্বজয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টলমল!
আজ বিদ্রোহীর এই রক্তরথের চূড়ে
বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে।
যত তূণ আমার আজ তোমার মালায় পুরে'
আমি বিজয়ী আজ নয়ন-জলে ভেসে'॥

কিন্তু আমরা জানি, কোনো বিজয়িনীর চরণ-প্রান্তেই তিনি বেশী দিন তাঁর তরবারি সমর্পণ করিয়া ভক্তের মতো স্তিমিত-নেত্র হইতে পারেন নাই। পৃথিবীর প্রেয়সী এবং প্রকৃতি তাঁকে বারবার উন্মনা

করিয়াছে সত্য, কিছুদিনের জন্য তিনি বাণও তূণবদ্ধ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু আবার আসিয়াছেন ঝড়ের মতন। আবার তিনি জীবনোল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছেন :

ঐ ঘাসের ফুলে মটর-শুঁটীর ক্ষেতে
আমায় এ মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে আজ মেতে'।।
এই রোদ-সোহাগী পউষ-প্রাতে
অথির প্রজাপতির সাথে
বেড়াই কুঁড়ির পাতে পাতে
পুষ্পল মৌ খেতে'।
আমি আমন ধানের বিদায় কাঁদন শুনি মাঠে রেতে।।

তাঁর মন-মৌমাছি বিশ্ব-প্রকৃতির প্রস্ফুটিত পুষ্পে পুষ্পে গুঞ্জরণ করিয়াছে সত্য, হয়ত পুষ্পে-পরাগে কিছুদিনের জন্য পক্ষ গুটাইয়া বাঁধাও পড়িয়াছে। কিন্তু সেই প্রকৃতি-প্রেমের মধ্যে হইয়াছে তাঁর নূতন অভিজ্ঞতা। তিনি গাহিয়াছেন—

নিম্ ফুলের মউ পিয়ে
ঝিম হয়েছে ভোমরা।
মিঠে হাসির নূপুর বাজাও,
ঝুমুর নাচো তোমরা।

অন্যত্র গাহিয়াছেন—

নাচের নেশায় ঘোর লেগেছে,
নয়ন পড়ে ঢুলে'
বুনো ফুল পড়লো ঝ'রে
দোলন-খোঁপা খুলে'।

কিন্তু এই আনন্দের নেশার ঘোর তাঁকে গভীরভাবে আবিষ্ট করিতে পারে নাই। এই মধুর রসাবেশের মধ্যেও তিনি শুনিয়াছেন কাহার প্রিয় আহ্বান—

আজি নিশি-ভোরে কাহার
পাহাড়ী বাঁশী বাজে।

সেই সুদূরের বংশীধ্বনিতে তাঁর চরণে জাগিয়াছে দুর্বার গতি-বেগ, মনে জাগিয়াছে উদ্দামতা। দুরন্ত প্রেমের আহ্বানে নূতন জীবনের সন্ধান তিনি আবার অজানিতের দেশে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সোল্লাসে গাহিয়াছেন—

বঁধু, ভেঙেছে দুয়ার, জেগেছে জোয়ার
তোমার প্রেমের টানে হে।

নজরুলের কবি-চিত্ত নিত্য-জাগ্রত : তাঁহার সাময়িক স্তব্ধতা হইতেছে তপস্বীর ধ্যান-প্রতীক্ষা,—বৃহতের জন্য নূতন আয়োজন। এই অবন্ধন-প্রিয় কবি বারবার তাই নব নব রূপে জীবন-মুক্তির গানই গাহিয়াছেন—সেই গানের তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে নবীন সৌন্দর্য নূতন অনুভূতির মাধুর্য।

দৈনিক 'কৃষক'
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮।

নজরুলের গানে কথা ও সুর

১.

রোমঁ্যা রোলঁ্যার ‘জঁা ক্রিসতফ্’ পড়িতে গিয়া বারবার মনে পড়ে বিঠোফেনের কথা। রোলঁ্যা নিজেও সঙ্গীতজ্ঞ; সঙ্গীতজ্ঞদের সম্বন্ধেও তাঁর কৌতূহল যে যথেষ্ট তার প্রমাণ তাঁর বিঠোফেন-চরিত। ‘জঁা ক্রিসতফে’র চরিত্র-পরিকল্পনায় বিঠোফেনের জীবন যে কিছু ছায়া ফেলিয়াছে তাহা ‘জঁা ক্রিসতফ্’ তৃতীয় খণ্ড পাঠের পর মোটেই অস্পষ্ট থাকে না।

জঁা ক্রিসতফের পিতা ও পিতামহের চরিত্রের সঙ্গে বিঠোফেনের পিতা ও পিতামহের চরিত্রের খুবই সামঞ্জস্য আছে। বিঠোফেনের পিতামহ একজন দেশখ্যাত গানেওয়ালা, পিতা সাংসারিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও ঘোর মদ্যপায়ী। পাঁচ বৎসর বয়সেই বিঠোফেনকে তাই পিতার কঠোর শিক্ষাধীনে বেহালা-বাদ্যে উস্তাদ হইয়া উঠিতে হয়। অল্প বয়সেই তিনি বধির হইয়া যান; শেষ বয়সে পরিজনদের দুর্ব্যবহারে তাঁর স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে। শেষে ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে মার্চ এক ভীষণ ঝড়-বৃষ্টির দিনে তাঁর অশান্ত আত্মা মহাপ্রস্থান করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মানী অত্যন্ত ভাগ্যবান দেশ। কাব্যে-দর্শনে-সঙ্গীতে সে শতাব্দীর য়ুরোপে জার্মানী বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। সঙ্গীতে মোৎসার্ট ও বিঠোফেণ দুই আলোকসামান্য প্রতিভা। মোৎসার্টের গানে আছে শিল্পসম্পূর্ণতার আনন্দ ও উদার সৌন্দর্য; বিঠোফেনে আছে ক্ষতবিক্ষত আত্মার দাহ ও বিভূতি। মোৎসার্টে আছে আলোক আর নীল সমুদ্রের ক্লাসিকেল পবিত্রতা; বিঠোফেনে আছে বায়ু আর সাগর-বাত্যার রোমাণ্টিক ঐশ্বর্য। মোৎসার্ট সুরের ঊর্ধ্ব-স্বর্গে ধ্যান-স্তিমিত; আর বিঠোফেনের আত্মা অনন্তের আকাঙ্খা ও ভয়-বিক্ষোভ নিয়া স্বর্গ হইতে নরকে আন্দোলিত হইয়া ফিরিতেছে। ইঁহাদের একজন অধিকতর আত্মসম্পূর্ণ, অন্যজন অপেক্ষাকৃত বিশাল।

২.

একালের বাংলা গানের ক্ষেত্রে এমনই দুই অনন্যসাধারণ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রনাথের গান অনেকখানি তাল-রহিত মীড়-মণ্ডিত গীতি-কবিতা—কাব্যসৃষ্টি হিসাবেও তাহা অনবদ্য। মানুষের মনের যে-একটি ভাষা বড় জোর সুরঝঙ্কারে পরিস্ফুট হইতে পারে, তাহা যেন সহজ সৌন্দর্য ও ললিত মাধুর্যে সেই গানে প্রকাশ লাভ করিয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের গানের যে আকৃতি, রাগরূপের বিস্তার বা আলাপ ছাড়াও শুধুমাত্র খোঁচের সাহায্যেই তাহার পরিপূর্ণ মূর্চ্ছনা আমাদের কাছে অভিব্যক্ত হইতে পারে।

আমার ব্যথা যখন বাজায় আমায়
বাজি সুরে,
সেই গানের টানে পারো না আর
রইতে দূরে।
লুটিয়ে পড়ে সে গান মম
ঝড়ের রাতের পাখী সম
বাহির হয়ে এস তুমি
অন্ধকারে।
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাকো তারে॥

রবীন্দ্রনাথের এই গানের আবেদন রসালু চিত্তের কাছে পৌঁছিতে উস্তাদী কসরতের অপেক্ষা রাখে না। এই গান নিঃসঙ্গ জগতের গান, এক প্রশান্ত আত্মবিরহের রসে ইহা উদাস হইয়া আছে।

কিন্তু নজরুলের গান রক্তাক্ত আত্মার গান। কবি মাটির উপর দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু সে-দাঁড়ানো গ্রীক-দেবতা Mercury-র মতো, —গুল্‌ফ মূলে তার পাখা, ঊর্ধ্বে আকাশের কিরণামৃতের জন্য তাঁর

দু'নয়ন তৃষ্ণার্ত। মর্ত্যের দলালার জন্য তাঁর হৃদয়ের যে পরিবেদনা, তাহাই তাঁহার আত্মার রক্তপাতে গানে গানে অপূর্ব দাহের সৃষ্টি করিয়াছে। স্বপ্ন-নীল আকাশের কল্প-মায়াপাশ কাটাইয়া অশ্রু-শ্যামল পৃথিবীর আকর্ষণে তিনি ধূলার আসনে অবতরণ করিয়াছেন; এই ধরণীর ধূলিলাঞ্ছিতার জন্য তাঁর যে গভীর প্রেম তাহা তাঁর গানে কি তীব্র জ্বালাই না সঞ্চার করিয়াছে—

গানগুলি মোর আহত পাখীর সম
লুটাইয়া পড়ে তব পায়ে, প্রিয়তম!
বাণ-বেঁধা মোর গানের পাখীরে
তুলে নিও প্রিয় তব বুকে ধীরে,
তোমার চরণে লভিবে মরণ
সুন্দর অনুপম ॥
তা'রা সুরের পাখায় উড়িতেছিল গো নভে,
হায়, তোমার নয়ন-শায়কে বিঁধিলে কবে!
মৃত্যু-কাতর কণ্ঠে তাহার
এ কি গানের জাগিল জোয়ার,
মরণ-বিষাদে অমৃতের স্বাদ
আনিলে নিষাদ মম ॥

৩.

রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দিলীপকুমার ও নজরুল ইসলাম—একালের বাঙলায় এই চারিজন কবি সুরশিল্পী হিসাবেও খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সঙ্গীত-সাধনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি, আর অতুলপ্রসাদ প্রধানতঃ কম্পোজার বা সুরস্রষ্টা। সেইজন্য অতুলপ্রসাদের অনেক গানের কথার প্রকাশ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মতো এতখানি নিটোল নয়। সুরলীলার মধ্যে ভাবের চমৎকার বিকাশই অতুলপ্রসাদের লক্ষ্য, তাই

রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা তাঁর গানে রাগ-রাগিণীর মীড় অধিকতর যত্নে বিন্যস্ত ও বিচিত্র। ইঁহারা উভয়েই হিন্দুস্তানী সঙ্গীতে পারদর্শী; তবে রবীন্দ্রনাথে রাগ-রাগিণীর সুনিপুণ মিশ্রণ অনায়াস রূপ লাভ করিয়া আছে, আর অতুলপ্রসাদ উস্তাদী অলঙ্কার সম্বন্ধে যত্নবান। উভয়েই আত্মস্থ অবস্থায় মগ্ন-চেতনার রসে সঙ্গীত রচনা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের গানের কথা ও সুর একই সঙ্গে গোমুখী-ধারার মতো অচ্ছেদ্য-ভাবে নামিয়া আসে, তাই সে-গান কথা ও সুরের ঐক্য-রসে এমন অনবদ্য ও অপূর্ব।

হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের অভিজ্ঞতা দিলীপকুমারের জাগ্রত চেতনায় যেভাবে স্থান পাইয়া আছে, তাহা হইতে সমাহিত হইয়া তিনি গান রচনা করেন না। তিনি প্রথমে পদ সাজান, তারপর তাহাকে সুরে ফেলিয়া গানে বাঁধিয়া দেন। তাই তাঁর গানে কথার তত্ত্বই মুখ্য, সুর গৌণ বিষয়,—সেজন্য অনেক স্থলে কথার সঙ্গে সুরের সামঞ্জস্য আশানুরূপ সুঠাম নয়।

অন্যপক্ষে নজরুল ইসলাম সুর ঝঙ্কারে প্রথম মস্‌গুল হইয়া ওঠেন, কী সুরে গানটি বাঁধিবেন সেইটি তাঁর আসে প্রথম; তারপর সেই সুরে ফেলিয়া শব্দ সংযোজন করিয়া দেন। এজন্য তাঁর গানে রাগের রূপাবলী অপেক্ষাকৃত অধিক, কিন্তু অতুলপ্রসাদের গানের মতো তাহা সহজ ও সুনিপুণ বিন্যাসলাভ করিয়া নাই—অর্থকে সুপ্রকট করার জন্য তাহা তানের বিস্তার বা গলার কস্‌রতের অপেক্ষা রাখে, আলাপে যথেষ্ট হয় না।

নজরুল ইসলাম এ পর্যন্ত ঠুংরি, গজল প্রভৃতি গানই রচনা করিয়াছেন বেশী,—সে গানের সূক্ষ্ম সুরের কারুকার্য কতখানি তাহা সঙ্গীতজ্ঞরা জানেন। ঠুমরি ও গজলের যাহা বৈশিষ্ট্য—প্রাত্যহিক জীবনের সুখ দুঃখের মাঝে কিছু সৌন্দর্যচ্ছটা বিকীরণ, মানুষের বিচিত্র ভাব-মুহূর্তের মধুর প্রকাশ, ক্ষণিকের অশ্রু-হাসির সুনিবিড় নিবেদন—এ

সমস্ত নজরুলের গানে মনোজ্ঞ কারুকলায় মূর্তিমান হইয়া আছে। চিরন্তন কালের যে অন্তরবাণী আনন্দ-ঘন অমৃতলোকের রসালুতা নিয়া একটা বিশিষ্ট ভঙ্গীতে মর্ত্য মানবকে ভাব স্বর্গের দিকে উন্মার্গ করিয়া তোলে—ধ্রুপদ ও ধ্রুপদাঙ্গ আলোপে যার কিছু প্রকাশ আমরা পাই—তাহা নজরুলের গানের সাধনার বিষয় নয়। মর্ত্যলোকের মিলন-বিরহ অনুরাগ-বিধুরতার লীলাই নজরুল-সঙ্গীতে সাময়িক ভাব-স্পর্শালুতা নিয়া গভীর ও জীবন্ত হইয়া আছে : সেই গানের সৃষ্টি-উৎস ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের চির-পরিচিত পটভূমি। রবীন্দ্র সঙ্গীতে আমাদের আত্মা শুনিতে পায় তার ঊর্ধ্বমুখীন কামনার পাখা-ঝাপটানি, আর নজরুল-সঙ্গীতে আমাদের হৃদয়াবেগ তার প্রতিদিনের হাসি-কান্নার লীলায়িত প্রকাশ অনুভব করিতে পায়।

৪.

সম্প্রতি মনে হয়, নজরুল ইসলাম হয়ত কবি ততখানি নহেন, যতখানি তিনি সুর-সাধক। অধুনা তিনি এক অশ্রুতপূর্ব গীতলোকে অবস্থান করিতেছেন, সেখানে শুধু সুরের আলাপ। তাঁর আজন্ম-সাধনার ভাবলোক হইতে তিনি যেন চুপিসারে বিদায় লইয়া আসিয়াছেন। অবশ্য তাঁর 'বুলবুল'-এর পরের রচিত অনেক গানে কাব্যের ঝলক অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়, এবং সে সবও অভিনব ভাবের প্রেরণায় কোনো নবসৃষ্টি নয়। বস্তুতঃ, সুরের বৈচিত্র্যের জন্যই এখন তাঁর দরদ, কথার জন্য খুব নয়। উচ্চতর ভাবতন্ত্রের মধ্যে যদি তাঁর গানের কথার জন্ম হইত, তবে তাহা আমাদের চিত্তকেও উচ্চগ্রামের রস-পরিবেশনের ক্ষেত্রে আমন্ত্রিত করিয়া নিতে পারিত। কিন্তু তাঁর গানের আবেদন সেদিক দিয়া ততখানি সার্থক কোথায়! বস্তুর গভীরতম সত্তায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তার নিগূঢ়তম রহস্য, অন্য কথায়, তার ঐক্য-রাগ (melody) প্রথিত হইয়া মন যে-কথা বলে তাহাকে বলা যাইতে পারে musical

thought ; সমস্ত অন্তরতম কথাই হইতেছে melodious, স্বভাবতঃ গানে তার অভিব্যক্তি ; গান হইতেছে সেই অস্পষ্ট অতল কথা যাহা আমাদিগকে অনির্বচনীয়ের মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া দেয়, মুহূর্তের জন্য তাঁর স্পর্শলাভের অধিকার দেয়। নজরুলের সদ্য-প্রকাশিত 'জুলফিকার' ও 'বনগীতি'তে সেই musical thought, সেই passionate language—যেখানে mere accent অপেক্ষা finer chant অধিক —আশানুরূপ কিনা, সন্দেহ হয়। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে গীতিকবিতার যাহা বৈশিষ্ট্য—rythmical melody-তে একটি ইমোশন্ বা আইডিয়ার সম্পূর্ণতা, Lilt এবং abandonment—তাহাও কতখানি আছে বিচার্য। গীতিকবিতা যেন পথিপার্শ্বিক পুষ্পের একটু সুরভি,—সুরের জটিল আলাপের মধ্যে যদি তাহাকে উপভোগ করিতে হয়, তবে সেরূপ রসচর্চ্চা অনেকখানি বিড়ম্বনা বৈ কি।

এদেশের সাংসারিক ও আত্মিক দুর্গতির ফলে এদেশের কবিদের ভাগ্যে এই দুর্গতি ঘটিয়াছে যে, ধ্যানীর ঔদাসীন্য তাঁহাদের সকল রচনায় সব সময় দেখা যায় না,—পারিপার্শ্বিক ঘটনার আবর্তে উচ্ছ্রিত বিক্ষোভ ও উত্তেজনা কোথাও প্রেরণা জোগাইয়াছে প্রচারণার। হেমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা কাব্যে জাতীয় জাগরণের জন্য প্রচারণা নিরঙ্কুশ রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়াছে বৈ কি। প্রচারধর্মী কাব্যের ত্রুটি এই যে, বিশেষ দেশ ও কালের বুকেই তাহা আবদ্ধ, নির্বিশেষ তাহাতে অস্বচ্ছ দৃষ্টি ও অসহিষ্ণুতার ধোঁয়ায় অনেকখানি আচ্ছন্ন। নজরুলের 'জুলফিকার'-এ ও 'গুল-বাগিচা'র 'ইসলামী গান'-এ ইসলাম ও প্যান্-ইসলামবাদের জন্য যে অন্তর্দাহ, তাহাতে একালের প্রতিষ্ঠাহীন মুসলমানের অন্তরে কিছু অভিমান ও আশার সঞ্চার হইলেও শাশ্বত কালের কাব্যরাসক তাহাতে ক্ষুণ্ন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। তবে এখানে ভাবিবার কথা এই যে, প্যান-ইসলামত্ব বা লৌকিক হিন্দুত্বের জন্য আসলে নজরুলের কিছুমাত্র

সহানুভূতি নাই। সেই লোকপ্রিয় ভাবসমূহের আশ্রয়ে তিনি নব নব সুরের সাধনা করিয়াছেন মাত্র! পূর্বেই বলিয়াছি, গানের কথাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার কোনো গভীর স্বপ্ন বা সহৃদয়তা নাই; গানকে সহজে জনপ্রিয় করার উপচেতন আগ্রহেই তিনি প্রচলিত মতাদর্শকে আমল দিয়া থাকেন। এই দুর্বলতা স্রষ্টার পক্ষে অশোভন নিশ্চয়, তবু উপায় নাই,—সেক্সপীয়রকেও লিখিতে হইয়াছিল Globe Play-house-এর জন্যই। সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ক্লাসিকেল সুর-সাধনার সনাতন ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া নজরুল যে নানা মূল সুরকে ভাঙিয়া অথবা নব-নিপুণতায় তাহাদের মিশ্রিত করিয়া বাঙলা সঙ্গীতে এক নব যুগের সূচনা করিতেছেন সেজন্য তিনি আমাদের প্রশংসার্হ।

'নবারুণ'
ভাদ্র, ১৩৪০।

নজরুলের ছোট গল্প

নজরুলের রচিত 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সওগাতে'। ছাপার হরফে প্রকাশিত এই তাঁর প্রথম রচনা। ঐ বছরই ত্রৈমাসিক 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'র কার্তিক সংখ্যায় তাঁর 'হেনা' গল্প এবং মাঘ সংখ্যায় 'ব্যথার দান' গল্প প্রকাশিত হয়। সেই প্রথম বয়সে নজরুল গল্পলেখক হিসেবেই পাঠকদের দৃষ্টি অধিকতর আকর্ষণ করেছিলেন।

'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'তে যে আবেগ-প্রাচুর্য ও বর্ণনা-মাধুর্য রয়েছে, তাঁর তৎকালীন রচনায় তার ক্রমঃবিকাশই দেখা যায়। এইটি "বাঙ্গালী পল্টনের এক বওয়াটে যুবকের আত্মকাহিনী" হিসেবে রচিত। এই কাহিনীর নায়ক 'উনিশের কাছাকাছি' বয়সে যখন বর্ধমান নিউ স্কুলে থার্ড ক্লাসের ছাত্র, তখন তার বাপ-মা 'তেরো বছরের' কিশোরী রাবেয়ার সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। পরীক্ষা নিকট দেখে নায়ক গেছে বর্ধমান; তার দু'মাস পরেই রাবেয়া গেল মারা। এই শোক নায়ক সারা জীবনে ভুলতে পারল না। সে ক্রমে হলো ছন্নছাড়া। শেষে সে 'রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল-রাজ স্কুলের' বিদ্যার্থী হলো; আবার বিয়ে করলো সখিনাকে। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত বয়াটেপনার দরুণ সে ম্যাট্রিক টেষ্টে এলাউ হতে পা'রল না,—খবর পেয়ে বাপ-মা দিলেন তার খরচ বন্ধ ক'রে। সে সময় সখিনা গেল মারা। ছ'মাস পরে তার মা-ও হলেন গত। তখন সে বে-পরোয়া হয়ে পল্টনে দিল যোগ।—এই-ই গল্পের আখ্যান-ভাগ। নজরুল রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল-রাজ স্কুলে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ে' ৪৯নং বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন, এ-সব কথা স্মরণ করলে গল্পটি বিশেষ অর্থে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আখ্যায়িকা হিসেবে নিশ্চয়ই এটি খুব উত্তীর্ণ হয়নি; কিন্তু সেই প্রথম রচনাতেই নজরুলের প্রতিশ্রুতি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

তাঁর 'রিক্তের বেদন' গ্রন্থে এ গল্পটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'রিক্তের বেদন' গল্পটিও এরূপ আর এক খামখেয়ালীর রোজনামচা। সেই খেয়ালী কৈশোরে ভালোবেসেছিল শহীদাকে: কিন্তু যুদ্ধের রোমান্স্ তাকে অধিকতর আকর্ষণ করে—পল্টনে যোগ দেয়। যাত্রার প্রাক্কালে তার মা তাকে বলে: "বাপ, একবার শহীদাকে দেখা দিয়ে আয়! সে মেয়ে তো কেঁদে কেঁদে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে!" কিন্তু যুবক অহেতুক অভিমান-বশে সেই উপরোধ অগ্রাহ্য করে। যুদ্ধে যোগ দিয়ে কুতল্-আমারায় এসে সে শোনে: শহীদার বিয়ে হয়ে গেছে; সে সুখী হয়েছে। সে সময় 'গুল' নাম্নী এক সুন্দরী বেদুইন যুবতী তাকে বিয়ে করতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কিন্তু হাসিন নায়ক হয় নারাজ। অবশেষে ঘটনাচক্রে নায়কের গুলীতে গুল যায় মারা। গুলের প্রৌঢ় মা কাঁদতে থাকে: "ফরজন্দ্, এয্ ফরজন্দ্!"—এ গল্পটিও নজরুলের যুদ্ধ-গমনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যে উন্মাদনা নজরুলের দেশপ্রেমমূলক রচনাগুলোতে দেখা যায়, এ গল্পটিতে আছে তারই আনন্দময় প্রাথমিক সূচনা।

করাচীর সেনা-নিবাসে থাকতে নজরুল এক পাঞ্জাবী মৌলভী সাহেবের কাছে হাফিজের 'দীওয়ান' পড়েছিলেন। তাঁর 'সালেক' নামক রূপক গল্পটিতে আছে হাফিজের এই বিখ্যাত বাণীটির রূপায়ণ—

"জায়নামাজ শরাব রঙিন কর, মুর্শিদ বলেন যদি,
পথ দেখায় যে, জানে সে যে পথের খবর অন্ত আদি।"

এ গল্পগ্রন্থের 'রাক্ষসী' গল্পটি অদ্ভুত। পাঁচুর বাপ পড়েছিল পরকীয়া প্রেমে: তাই পাঁচুর মা 'বিন্দি' তার স্বামীকে নরকের পথ থেকে বাঁচাবার জন্যে করলে হত্যা। তার নিশ্চিত ধারণা, সে ন্যায় ছাড়া অন্যায় কিছু করেনি—নিজের স্বামীকে নরকে যাবার আগেই ও-পথ

থেকে সরিয়ে দিয়েছে। একটি টাইপ সৃষ্টির দিক দিয়ে এ গল্পটি উল্লেখযোগ্য।

'স্বামীহারা' গল্পের নায়িকা 'বেগম' গরীব ঘরের মেয়ে, অথচ অসামান্য রূপের গুণে অভিজাত ঘরের ছেলে সুশিক্ষিত আজীজের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু কলেরা রোগীর সেবা ক'রে সংক্রামক রোগে আজীজ যায় মারা। তখন প্রতিবেশীরা বলে, আশরাফ ঘরে আত্‌রাফ-খান্দানের মেয়ে আসাতেই আজীজের অকালে অপমৃত্যু ঘটেছে। এই সমাজ-মানসের পরিবেশে আজীজ ও আজীজ-মাতার চরিত্র যেরূপ বলিষ্ঠ ও মহিমাময় ক'রে অঙ্কন করা হয়েছে, তা দক্ষতার পরিচায়ক। এ গল্পটিতে মানবিকতা ও প্রেমের একাগ্রতা মর্মস্পর্শী রূপ লাভ করেছে।

'মেহের নেগার' গল্পের নায়ক ওয়াজিরিস্তানের য়ুসোফ খাঁ। তার স্বপ্নপ্রিয়া 'মেহের নেগার'; তাকে খুঁজতে এসে ঝিলাম নদীর তীরে সে দেখা পেল গুলশনের। খুরশেদজান বাঈজীর কন্যা গুলশন। ভালোবাসা পরস্পরকে পরস্পর থেকে দিলে দূরে সরিয়ে। যুদ্ধে যাওয়ার আগে শেষ বিদায় নিতে এসে য়ুসোফ দেখলে গুলশনের কবর! কবরের মর্মর-ফলকে লেখা: "ওগো পথিক, অপবিত্র জঠরে জন্ম নিলেও আমায় ঘৃণা করো না; পবিত্র ভালবাসা আমার এই বুকে তার পরশ দিয়েছিল।" প্রেম মানুষকে করে পবিত্র, করে অমৃতের অধিকারী, এই প্রত্যয় নজরুলকে দিয়েছে প্রথম থেকেই বিকাশের প্রেরণা।

প্রেমের মূল্য ও মর্যাদা 'ব্যথার দান' গল্পটিতে তিনি আরও গভীর-ভাবে স্বীকার করেছেন। নায়িকা বেদৌরা মুহূর্তের ভুলে দেহের পবিত্রতা নষ্ট করে; নায়ক দারা এ-অপরাধ অন্তর থেকে ক্ষমা করতে পারেনি, তাই যুদ্ধে গিয়ে সে হয় অন্ধ ও বধির। শেষে দারা বলছে: "আমার অন্ধত্ব ও বধিরতা! ওর জন্যে কেঁদো না বেদৌরা। ওগুলো

থাকলে ত আমি তোমাকে আর পেতাম না।" এর কবিত্বময় ভাষা ও বর্ণনা-মাধুরী পাঠকের মনে সৃষ্টি করে মাদকতা।

এই 'ব্যথার দানে' গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'হেনা'। গল্পের ঘটনাস্থল বেলুচিস্তান ও আফগানিস্থান। নায়ক 'সোহ্‌রাব' আফগান হয়েও পরদেশীর জীবন যাপন ক'রে বেড়াচ্ছিল, তাই নায়িকা 'হেনা' তাকে ভালবেসেও তার কাছে এতকাল ধরা দেয়নি। সোহ্‌রাব যখন স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যুদ্ধে গেল, তখনই হেনা দিলে তার মরণ-পণ পরিচয়। এই গল্পটিতে যুদ্ধের পটভূমিতে অন্তরের অনুভূতিগুলো অনুরণিত হয়েছে হৃদয়গ্রাহী ভাষায়। একটু শুনুন—

> আগুন, তুমি ঝর-ঝম্-ঝম্ ঝম্! খোদার অভিশাপ, তুমি নেমে এসো ঐ নদীর বুকের জমাট বরফের মতো হয়ে—ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্। ইস্রাফিলের শিঙ্গা, তুমি বাজো সবকে নিঃসাড় ক'রে দিয়ে—গুম্ গুম্ গুম্ প্রলয়ের বজ্র, তুমি কামানের গোলা আর বোমার মধ্য দিয়ে ফাটো—ঠিক মানুষের মগজের উপরে—দ্রুম্ দ্রুম্ দ্রুম্। আর সমস্ত দুনিয়াটা—সমস্ত আকাশ উল্টে ভেঙ্গে পড় তাদের মাথায় যারা ভালবাসায় কলঙ্ক আনে।"

'ঘুমের ঘোরে' গল্পটিতেও আছে যুদ্ধযাত্রা। গল্পের নায়ক আজহার, নায়িকা পরী। আজহারের মনে হয়েছিল যে, "যে ভালোবাসা দু'জনের দেহকে আকর্ষণ ক'রে মিলিয়ে দেয়, সে ত ভালোবাসা নয়, সেটা অন্য কিছু বা মোহ আর কামনা।" ফলে, আজহারের উপরোধে তার এক বন্ধু করলে পরীকে বিয়ে। আজহার গেল যুদ্ধে। কিন্তু হায়! পরী তবু ভাবতে পারে না যে, যা ঘটে গেছে তা শুধু 'ঘুমের ঘোরে'।

'অতৃপ্ত কামনা' গল্পটিতে অঙ্কিত হয়েছে এমনই এক করুণ চিত্র। বাল্যের সঙ্গিনী মোতির ভালবাসা সুগভীর; সে করেছে সর্বস্ব সমর্পণ,

কিন্তু নায়ক নিজের দারিদ্র্যের কথা ভেবে হয় পেছপাও; পরে 'হায় হায়' ক'রে কাটাচ্ছে জীবন। ভেবে দুঃখ লাগে, এ-সব নায়ক কেন হলো না আরো দুঃসাহসী, মধ্যযুগের নাইটদের মতো দুর্দম?

নজরুলের প্রথম জীবনের 'রিক্তের বদন' ও 'ব্যথার দান'-এর গল্পগুলোতে চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনা-সংস্থান বড় কথা নয়, আবেগের প্রগাঢ়তা ও কল্পনার ঐশ্চর্যে এগুলো মনে আনে স্বপ্নাবেশ। তরুণ প্রেমের উদ্ভ্রান্ত উচ্ছ্বাস ও বিরহী চিত্তের ব্যাকুল ক্রন্দন এগুলোকে করেছে রসমধুর ও হৃদয়গ্রাহী। তাঁর 'বাদল' বরিষণে', 'সাঁঝের তারা', 'দুরন্ত পথিক' প্রভৃতি যেন ভাষা ও বর্ণনার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে। পরবর্তীকালে তিনি সুরশিল্পী হিসেবে খ্যাতিমান হবেন, তার আভাষ এ দু'টি গল্পগ্রন্থের অনেক ছত্র থেকেই অনুমান করা গিয়েছিল।

তাঁর পরিণত বয়সের রচনা 'শিউলি-মালা'র গল্পগুলো আঙ্গিক এবং বর্ণনাভঙ্গীর বিচারে অপেক্ষাকৃত অনবদ্য।

'শিউলি-মালা'র প্রথম গল্প 'পদ্ম-গোখরো'। পল্লীগ্রামে এ ধরণের উপকথা সুপ্রচলিত। কিন্তু নজরুল যেভাবে নায়িকা জোহরার চরিত্রটি সৃজন করেছেন, তাতে মৌলিকতা যথেষ্ট। গল্পটিতে অতিপ্রাকৃত পরিবেশ ছাড়িয়ে উঠেছে মানবিকতার মাধুরী।

দ্বিতীয় গল্প 'জ্বিনের বাদশাহ্' আরম্ভ থেকেই ব্যঙ্গরসে করছে ঝলমল। পড়তে পড়তে হাসি চেপে রাখা দায়। কিন্তু উপসংহারে এই ব্যঙ্গরস অকস্মাৎ এমন করুণ রসে রূপান্তরিত হয়েছে যে, ভেবে বিস্ময় লাগে। নায়ক আল্লারাখা, নায়িকা চানভানু, নায়কের বাপ চুন্নু ব্যাপারী, নায়িকার বাপ নারদ আলী শেখ প্রভৃতির চরিত্র দক্ষ হাতের নিপুণ তুলিতে হয়েছে অপরূপ।

তৃতীয় গল্প 'অগ্নিগিরি'। ঘটনা-স্থল—বীররামপুর গ্রাম। নায়ক সবুর আখন্দ—শান্ত গোবেচারী এক ছাত্র। পাড়ার রুস্তমের দল প্রত্যহ তাকে অন্যায়ভাবে অনর্থক জ্বালাতন করে। একদা নায়িকা নূরজাহানের

র্ভৎসনায় শান্ত সবুর হয়ে উঠলো অশান্ত—মৌনী পাহাড় হয়ে উঠলো অগ্নিগিরি। প্রেমের বিদ্যুৎ-স্পর্শে সবুরের মধ্যে জেগে উঠল দৃপ্ত পৌরুষ। এই গল্পটির আরম্ভ হাসির দীপ্তিতে, আর সমাপ্তি অশ্রুর কুয়াশায়। মনে হয়, এইটিই নজরুলের শ্রেষ্ঠ গল্প। নজরুল কৈশোরে ময়মনসিংহের দরিরামপুর গ্রামে কিছুদিন পড়াশুনা করেছিলেন ; তাঁর তৎকালীন জীবনের যৎকিঞ্চিৎ ছায়া এ-গল্পে আছে—এ তথ্য তাঁরই মুখে একদা শুনেছিলাম।

এ-গ্রন্থের শেষ গল্প 'শিউলি-মালা'। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে নজরুল কিছুকাল ঢাকায় অবস্থান করেছিলেন ; তাঁর তখনকার জীবনের কিছু ছায়া আছে এ-গল্পে। প্রফেসার চৌধুরী, তাঁর কন্যা নোটন-খোঁপার শিউলি ; তাঁদের বাংলোয় দাবা খেলার আড্ডা। একদিন সন্ধ্যায় দাবা খেলার শেষে নায়ক বললেন : "আচ্ছা শিউলি ; আবার যখন এমনি আশ্বিন মাস, এমনি সন্ধ্যা আসবে, তখন কি করবো বলতে পার ?" তিনি গল্পটির উপসংহার করেছেন এই ব'লে : "শিউলি ফুল—বড় মৃদু, বড় ভীরু ; গলায় পরলে দু'দণ্ডে আউরে যায়। তাই শিউলি ফুলের আশ্বিন যখন আসে, তখন নীরবে মালা গাঁথি আর জলে ভাসিয়ে দিই।"

'মাহে নও'

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২।

নজরুলের নাটক

বাঙলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামের প্রথম আবির্ভাব গ্রাম্য যাত্রাদলের কবিয়াল রূপে। যাত্রানাট্য কথকতা ও হাফ-আখড়াইর ঢঙে আসানসোল অঞ্চলে লেটো-গানের প্রচলন ছিল। নৃত্যগীত-সহকারে সেই গীতিনাট্যের অভিনয় হতো। তর্জা-খেউড়-কবিগানের মতো কখনো কখনো আসরে দুই দলে প্রতিযোগিতাও চলত। কিশোর বয়সে নজরুল ছিলেন আশে-পাশের পল্লীর লেটো-দলের পালা-রচয়িতা। গানে সুর যোজনা করতে এবং প্রতিপক্ষের পাল্টা-জবাব দিতেও তিনি ছিলেন উস্তাদ। তাঁর সে সময়ের রচনা: 'চাষার সঙ্', 'ঠগপুরের সঙ্', মেঘনাদবধ', 'শকুনিবধ', 'দাতাকর্ণ', 'রাজপুত্র', 'কবি কালিদাস', আকবর বাদশা' প্রভৃতি নাটক ও প্রহসনে তাঁর কবি চরিত্রের আদিম রূপ লক্ষ্য করা যেতে পারে। মজলিশের হৈচৈ এবং কোলাহলের মধ্যেও চিত্তাকর্ষক কবিতা ও গান রচনা করার দুর্লভ ক্ষমতা তিনি সেই কৈশোরের সাধনা থেকেই আয়ত্ত করে ছিলেন। তৎকালে পাঁচালী কীর্তন কবিগান সারিগানের মতো লেটো-গানেও অশ্লীলতা ছিল গ্রাম্য লোকদের বড় আকর্ষণ। কিন্তু নজরুলের প্রতিভার যাদুস্পর্শে লেটো-গানের পরিকল্পনা ও পরিবেশনায় এমনই অভিনবত্ব ঘটলো যে তারই চমৎকারিত্বে শ্রোতৃমণ্ডলী সমধিক মুগ্ধ হলো। নজরুলের গানে ছিল মধুর সুরের আবেদন, সংলাপে ছিল বিচিত্র ভাবের ব্যঞ্জনা; তাই এক অপরাজেয় গীতিনাট্যকার রূপে অচিরেই তাঁর খ্যাতি গ্রাম হতে গ্রামান্তরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

পালা-গানের পদ্ধতিতে নজরুল তাঁর লেটো-গান শুরু করতেন বিভু-স্তোত্র দিয়ে। তাঁর রচিত একটি বন্দনা-গীতি—

সর্বপ্রথম বন্দনা গাই তোমারই ওগো বারী'তালা।
তারপরে দরুদ পড়ি মোহাম্মদ সাল্লে'আলা॥
সকল পীর আর দরবেশ কুলে
সকল গুরুর চরণ-মূলে
জানাই সালাম হস্ত তুলে'
দোওয়া করো তোমরা সবে,
হয় যেন গো মুখ উজালা।
সর্বপ্রথম বন্দনা গাই'
তোমারই ওগো বারী'তালা॥
তোমারই ওগো খোদা'তালা॥

তৎকালে তর্জা-পাঁচালীতে আরবী-ফারসী-উর্দু-ইংরেজীর মিশেল দেওয়া বাহাদুরির পরিচায়ক ছিল। বিশেষতঃ সেই মিশ্র ভাষার ব্যবহারে প্রতিপক্ষের পাল্টা-জবাব হতো সূচীমুখ ও উপভোগ্য। প্রতিদ্বন্দ্বী ছড়াদার ও পাল্লাদারকে লক্ষ্য করে নজরুলের একটি ব্যঙ্গগীতি—

ওরে ছড়াদার that পাল্লাদার
মস্ত বড় mad;
চেহারাটাও Monkey like
দেখতে ভারী Cad.
Monkey লড়বে বাবর-কা সাথ্
ইয়ে বড় তাজ্জব বাত্,
জানে না ও ছোট্ট হলেও
হাম্ ভি Lion lad.
শোনো ও ভাই Brother দোহারগণ!
মচ্ছর-ছানা সব করেছে পণ
গান গাহিবে আসর মাঝে,

খবর বড় Sad,
ও ভাই খবর বড় Sad.

বয়োপ্রাচীন প্রতিযোগীকে কিছুমাত্র পরোয়া না ক'রে নজরুল নিজেকে বলেছেন "ছোট্ট হলেও Lion lad"—সিংহশিশু। সেই ১০/১২ বছর বয়সেই তাঁর এই আশ্চর্য আত্মপ্রত্যয় তাঁকে করেছে অস্থির ও উদাস।

জন্মভূমির সৌন্দর্যে তাঁর অন্তর যেমন হয়েছে অভিভূত, মানবিক অনুভূতিতেও তাঁর চিত্ত দিয়েছে সেরূপ সাড়া। 'রাজপুত্র' নাটকে বলেছেন—

অসংখ্য নগর গ্রাম
দুর্গা গুহা পর্বতাদি
কত নদ নদী
দেখিলাম, কিন্তু নিরবধি
স্বদেশ জাগিছে এ অন্তরে।

তাঁর 'শকুনিবধ' নাটকে পুত্রশোকাতুর পিতার অনুশোচনা হয়েছে অন্তরস্পর্শী—

কোথা গেলি প্রিয় উলুক পুত্রধন!
কি দোষে অসময়ে আমারে
করিলি রে বর্জন?

কবির কাঁচা লেখনীতেই তরুণ প্রেমের ছলনা রূপায়িত হয়েছে চটুল ভঙ্গীতে—

বুঝলাম নাথ এতদিনে
যুবকের ছলনা হে।
কোথা শিখিলে এ প্রণয়
আমারে বল না হে॥

তোমার হিয়া কঠিন অতি
জাননা শ্যাম প্রেমের রীতি
তাই নিভালে প্রেমের বাতি
আর বাতি জ্বেল না হে ॥
এইরূপে কত কামিনী
মজাযেছেন গুণমণি
কপাল দোষে বিরহিনী
তোমার আর হ'ল না হে ॥
বিরহ-জ্বালায় মরিলাম
আর জ্বালায়ো না বাঁকা শ্যাম,
ভেবে, বলে নজরুল ইসলাম
মের না ললনা হে ॥

আশ্চর্য যে, দেহতত্ত্বমূলক মাল-মশলা নিয়ে তিনি সেই বাল্যবয়সেই প্রণয়ন করেন 'চাষার সঙ' নামে এক গীতিবহুল প্রতীকী নাটিকা। অষ্টাদশ শতকের সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেনের সুপ্রসিদ্ধ গান—

মন তুমি কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা ॥

রামপ্রসাদের কীর্তনে আছে কালীমহাত্ম্যের বর্ণনা; কিন্তু নজরুল নাটিকাটির পরিকল্পনা করেছেন ইসলামের ভাবাদর্শ ও অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি ক'রে। 'চাষীর গীত' দুইটিতে বিধৃত রয়েছে তার মূল সুর। দুনিয়ার জমি যথাবিধি আবাদ করে লাভ হবে ঐহিক জীবন ধারণের বিবিধ ফসল, আর দেহের জমি শরামতে চাষ ক'রে লাভ হবে আধ্যাত্মিক জীবন বিকাশের বিচিত্র সম্পদ। শেষোক্ত তত্ত্বটি সুব্যক্ত হয়েছে এই গানটিতে—

চাষ ক'রো দেহ-জমিতে।
হবে নানা ফসল এতে ॥
নামাজে জমি 'উগালে',
রোজাতে জমি 'সমালে',
কলেমায় জমিতে মই দিলে
চিন্তা কি হে এই ভবেতে ॥
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাতে
বীজ ফেলা তুই বিধি মতে,
পাবি 'ঈমান' ফসল তাতে
আর রইবি সুখেতে ॥
নয়টা নালা আছে তাহার
ওজুর পানি সিয়াত যাহার
ফল পাবি নানা প্রকার
ফসল জন্মিবে তাহাতে ॥
যদি ভালো হয় হে জমি
হজ্ব জাকাত লাগাও তুমি
আরো সুখে থাকবে তুমি—
কয় নজরুল ইসলামেতে ॥

নজরুলের এ-সকল বাল্য-রচনাতেই দেখা যায়, এদেশের পৌরাণিক কাহিনী, পালা-গান, কবি-গান, কীর্তন, পাঁচালী প্রভৃতির বিষয়বস্তু ও রচনা-রীতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় প্রচুর। প্রাচীন গ্রীকেরা Dionysus এর লীলাকাহিনী প্রচার করতে গিয়ে নাট্যকলার সূত্রপাত করেন; এদেশেও ধর্মকাহিনী অবলম্বন ক'রেই রামলীলা, কৃষ্ণযাত্রা ও ইমাম-যাত্রার প্রচলন হয়। প্রথম যুগের নাট্যকারেরা ধর্মভীতু দর্শকদের মনোরঞ্জন-উদ্দেশ্যেই পৌরাণিক কাহিনী আশ্রয় করেন; এই একই কারণে নজরুলের বাল্য-রচনাতেও দেখি পৌরাণিকীর প্রভাব।

২০

কিন্তু করাচীতে পল্টনে যোগ দিয়ে নজরুল উপলব্ধি করেন যে, 'বিপুলা পৃথ্বী' এবং 'কাল নিরবধি'। তাঁর কল্পদৃষ্টিতে ভাবের বিরাট দিগন্ত যায় খুলে'। তিনি কথার সূত্রে গ্রথিত করেন কল্পনার বিচিত্র কুসুম। অজস্র কবিতা ও গানে, গল্প ও উপন্যাসে বাণীর কণ্ঠহার খচিত করেন। কিন্তু দৈনিক 'নবযুগ', অর্ধ-সপ্তাহিক 'ধূমকেতু' ও সাপ্তাহিক 'লাঙল' পরিচালনের পর তাঁর উদ্দামতা যখন মন্দাভূত, নয়নে লেগেছে শান্ত সৌন্দর্যের ঘোর, তখন তিনি কান পেতে শোনেন নটরাজের নৃত্যনিক্কণ,—তারই ছন্দ-তালে জন্ম নেয় তাঁর 'ঝিলিমিলি'-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গীতিবহুল নাটিকাগুলি। ১৩৩৪ আষাঢ়ের 'নওরোজ' পত্রিকায় 'ঝিলিমিলি' প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সেতুবন্ধ' নাটিকাটির প্রথম দু'টি দৃশ্য ১৩৩৪ শ্রাবণের 'নওরোজ'-এ বেরিয়েছিল 'সারা ব্রীজ' শিরোনামে। 'শিল্পী' ছাপা হয়েছিল সাপ্তাহিক 'সওগাতে'।

নজরুলের 'ঝিলিমিলি' রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটিকাটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, 'ডাকঘর' প্রতীকী (Symbolic) নাটক; তাতে মেটারলিঙ্কের ধরনে বিশ্বানুভূতির রূপায়ণ লক্ষণীয়। রূপক-কবিতার মতোই প্রতীকী-নাটক মনে জাগায় অসীমের জন্য পিপাসা, সংসারের প্রতি বীতরাগ। পুরাতন ধর্মের ভগ্নাবশেষের উপর নূতন অধ্যাত্মবোধের প্রলেপ চড়িয়ে আধুনিক চিত্তকে বিশ্বানুপ্রবিষ্ট করবার মহৎ প্রেরণা এ-ধরনের রচনার মূলে প্রবল। 'ডাকঘরে' রয়েছে বিশ্বের আনন্দের মাঝে নিজেকে নিমজ্জিত করবার প্রয়াস, অপরূপের জন্য অন্তরের আকুলতা। কিন্তু নজরুল যৌবনের কবি; পৃথিবী ও প্রকৃতির স্তন্যে লালিতা মানব-দুলালীর জন্যে তাঁর কামনা তৃপ্তিহীন; তাই রবীন্দ্রনাথের 'অমল' ও 'সুধা' নজরুলের হাতে হয়েছে 'হাবিব' ও 'ফিরোজা'; 'মাধব দত্ত' হয়েছেন 'মীর্জা সাহেব'। অমল চায় চিত্তকে পৃথিবীর দিকে প্রসারিত করতে; সে বাতায়ন দিয়ে নিজের কল্পনাকে দেয় বিশ্বের পথে

মুক্ত ক'রে। মাধব দত্ত জানায় জানালা খোলায় আপত্তি। আর ফিরোজার পূব-জানালা খুলতে দেন না তার বাপ মীর্জা সাহেব—সেই জানালার পথে হাবিবের সাথে তার মনের মালা-বদল যাতে না হতে পারে সেজন্যই তিনি বাদ সাধছেন।

'ঝিলিমিলি'র দ্বিতীয় দৃশ্য স্বপ্নপুরী। সেই পুরীতে সপ্তমী চাঁদের তরীতে হাবিব ও ফিরোজার কল্প-মিলন। হাবিব বলছে: "এখানে আসতে হয় শুধু 'প্রিয়' আর 'প্রিয়া' হয়ে। এখানে নর-নারী অনামিক। এ-লোকে নর-নারীর পরিচয়-সংকেত শুধু 'প্রিয়' আর 'প্রিয়া'। এখানে ডাকতে হয় শুধু 'প্রিয়তম' ব'লে।"—সেই স্বপ্নলোকে ফিরোজার মনে হচ্ছে হাবিব "যেন নিখিল পুরুষ "যেন অনন্তকাল ধ'রে কাঁদছে"। আর হাবিব দেখছে ফিরোজার "মুখে আজ নিখিল-বিরহিনী ভিড় করেছে। 'ঝিলিমিলি' রচনার প্রায় এক বছর আগে (১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই) নজরুল তাঁর বিখ্যাত 'অনামিকা' কবিতায় লীলাবাদী দর্শনের প্রশ্রয় দিয়েছিলেন; কিন্তু এখানে আভাস দিয়েছেন যে, এরূপ লীলা-কল্পনা শুধু স্বপ্নঘোরেই সম্ভব।

তৃতীয় দৃশ্যে, বাস্তব পৃথিবী থেকে ফিরোজা চির-বিদায় নিয়ে গেল তার 'পুব-জানালা দিয়ে'—হাবিবের "জান্‌লার ঝিলিমিলি খুলতে।" মৃত্যুর পথে হলো তার অন্তিম অভিসার। আর 'ডাকঘরে'র তৃতীয় দৃশ্যে দেখি, অমল যখন 'রাজদূতের' মারফৎ পেলো 'মহারাজের' আসবার খবর, তখন অপরূপের স্বপ্নে হলো সে বিভোর। তখন সুধা এলো "ওর জন্য ফুল" নিয়ে, বললো রাজ-কবিরাজকে: অমল জাগলে "ওকে একটি কথা কানে কানে বলো যে সুধা তোমাকে ভোলেনি।" সুধার এ-কথা আমাদের হৃদয়ে বুলিয়ে দেয় কর্পূরের মৃদু সুরভি, আনন্দের একটু ছোঁওয়া। কিন্তু ফিরেজা যখন 'অস্ত-চাঁদের' তরীতে দিয়েছে পাড়ি, তখন হাবিবের মধ্যে দেখি ঝড়ের উদ্দামতা। এই উদ্দামতা পৃথিবীর প্রেমোন্মাদ তরুণের।

৩.

নজরুলের 'সেতুবন্ধ' রূপক-নাট্য। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'র সঙ্গে এইটি মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। 'মুক্তধারা'র ভৈরবপন্থীর গানটির প্রভাব 'সেতুবন্ধে'র শেষ গানটিতে সুস্পষ্ট ; তবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

জয় বন্ধন-ছেদন
তিমির হৃদ্-বিদারণ ;

আর নজরুল বলেছেন :

এস উৎপীড়িতের রোদনের বোধনে
বজ্রাগ্নির দাহ ল'য়ে রোষ-নয়নে।

এ দুইট নাটকের theme বিচার করলেও নজরুলের স্বকীয়ত্ব সহজেই চোখে পড়ে। নজরুলের বর্ণিত যন্ত্ররাজের কৃষ্ণধ্বজায় লেখা : "বিদ্বেষ শোষণ পেষণ।" এখানে বরীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য নেই। পার্থক্য মূল পরিকল্পনায়! 'সেতুবন্ধ' নাটকে যে সংঘাত সৃষ্টি করা হয়েছে, সে হচ্ছে প্রকৃতির জড়শক্তির সঙ্গে মানুষের তৈরী যন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জড়শক্তির সংঘাত! মানুষ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবলে কাঠ, ইট, সুরকি, পাথর, লোহা, বিদ্যুৎ প্রভৃতির সাহায্যে পদ্মার উপর দিয়ে তৈরী করেছে 'সারা ব্রীজ', সেই সেতু একদা ধ্বসে গিয়েছিল মেঘ বায়ু ঝড় বৃষ্টি বন্যা নদী তরঙ্গ বালুকণা প্রভৃতির সম্মিলিত আক্রমণে। নজরুল ধারণা করেছেন যে, প্রকৃতির শক্তিকে যন্ত্রশক্তির দ্বারা পরাভূত করতে গিয়ে মানুষের আবিষ্কার-বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটবে বারবার। কিন্তু তাঁর এ অভিমত মেনে নেওয়া মুশকিল। কেনন', বাস্তবিক পক্ষে সারা ব্রীজ স্থায়ী বন্ধন স্বীকার করেছে,—পদ্মার আক্রোশ হয়েছে ব্যর্থ।

রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'য় রূপায়িত হয়েছে দুই বিরুদ্ধ শক্তির পরস্পর সংঘাত,—অভিজাত শোষক শক্তির বিরুদ্ধে জাগ্রত শোষিত শক্তির সংঘাত। উত্তরকূটের আধিপত্য বজায় রাখবার জন্যে শিবতরাইয়ের

ঝরণার পানি বন্ধ ক'রে যন্ত্রশক্তির প্রতিষ্ঠা; উত্তরকূটের যুবরাজ অভিজিতের জন্ম শিবতরাইয়েরই ঝর্ণাতলে, তাই সে-ই পারল আত্মবিসর্জনের দ্বারা যন্ত্ররাজের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে শিবতরাইয়ের অধিবাসীদের মুক্তি দিতে। এখানে চিত্রিত হয়েছে আত্মার বলে বলীয়ান শোষিত শক্তির সহিত সংগ্রামে যন্ত্রবলে বলীয়ান শোষকশক্তির পরাজয়। যন্ত্রের গঠনে যেখানে রয়েছে ত্রুটী, সেই দুর্বল স্থানটিতে আঘাত ক'রেই অভিজিৎ করলে যন্ত্ররাজের ষড়যন্ত্র বিফল। কিন্তু যন্ত্র যে দিন দিন ত্রুটী হীন হচ্ছে! কাজেই এপথে অভি-জিতের দল যন্ত্ররাজকে কাবু করতে না-ও পারেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনার এ দুর্বলতা ভেবে দেখেননি, যেমন দেখেননি নজরুল প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতার অসীম সম্ভাবনা।

৪.

নজরুলের 'শিল্পী' নাটিকাটি রূপক! চিত্রকর 'শিরাজ', চির-সুন্দরের জন্য তার নিত্য নব-তৃষা। তার সহধর্মিনী 'লায়লী' তাকে চায় মানুষ রূপে ও স্বামী-রূপেও পেতে; না পেয়ে তার মনে জাগে অভিমান। শিরাজ চায় লায়লী হোক তার ধ্যানলোকের মানসী,—তার শিল্পের প্রেরণা। লায়লী চায় শিরাজের কাছে বধূ হওয়ার আনন্দ, পুত্র-কন্যার জননী হওয়ার গৌরব। এই দুই বিরুদ্ধ-ভাবের দ্বন্দ্ব দিয়ে নাটিকাটির সূচনা। প্রথম দৃশ্যের শেষে 'চিত্রা'র আবির্ভাব, এবং চিত্রাকে নিয়ে শিরাজের অন্তর্ধান। 'চিত্রা' শিরাজের শিল্পী-মানসের আনন্দ-লক্ষ্মী, প্রেরণা-লক্ষ্মী।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, লায়লী পিত্রালয়ে গিয়ে দীর্ঘ বিরহকে অমৃতময় ক'রে তুলেছে শিরাজের ছবি এঁকে, শিল্পের সাধনা ক'রে, নিজে শিল্পী হয়ে। তাতে কল্পনা-সুন্দরের শুভাশীষ সে লাভ করলো; কিন্তু স্বামী-সান্নিধ্যে আসতেই তার মন উঠল হাহাকার ক'রে।

তৃতীয় দৃশ্যে, চিত্রা-ও চাইছে বধূ হতে। শিরাজ বলছে :

'শিল্পী চাঁদ পাখী—এরা আর সব বোঝে,
শুধু বোঝে না বেদনা।"
"আমি হৃদয়হীন নির্বেদ উদাসীন শিল্পী।"

জবাবে চিত্রা বল্‌ছে : "তুমি পাষাণ প্যাপোলো।"

চিত্রা নিলে বিদায়। কিন্তু সেই বিদায়ের ক্ষণে শিল্পীর চোখে এল অশ্রু, প্রথম অশ্রু। তাকে উপহার দিলে তার ছবি আঁকবার তুলি; বলল : "এই তুলি আর না :" এবার তার যাত্রা নূতন পথে—"যে-পথে পৃথিবীর কোটি কোটি ধূলিলিপ্ত সন্তান নিত্যকাল ধ'রে চলেছে সেই দুঃখের, সেই চির-বেদনার পথে।" বলা বাহুল্য যে, সার্থক শিল্পী হওয়ার পথেই তার সেই যাত্রা।

৫.

'ঝিলিমিলি'-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত চতুর্থ নাটিকা 'ভূতের ভয়'। ভূত-দল স্বর্গরাজ্য অধিকার করেছে, দেবকুল তাদের রাজ্য থেকে ভূত ভাগাবার অমেয় মন্ত্র উদ্ভাবন করেছ 'মাভৈঃ'—ভয়কে জয় করবার 'মাভৈঃ' বাণী। কিন্তু বিপ্লব-কুমার এসে প্রচার করল অগ্নিমন্ত্র। গান্ধীজীর নিষ্ক্রীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মুকাবিলায় বিপ্লববাদীর সক্রিয় আন্দোলনের মূল্যমান এই নাটিকাটিতে রূপকের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে! "ধ্বংসের পূজারী-দল নব-সৃষ্টির ধেয়ানী হয়ে," প্রেম প্রীতি নিয়ে যখন আবির্ভূত হবে, তখনই আসবে মুক্তি. বিপ্লবের সাধনা হবে সার্থক—এ পরম তত্ত্বটির পরিবেশনা নাটিকাটির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। নজরুলের দেশ-প্রেমমূলক কবিতাগুলিরও অন্তর্নিহিত কথা এই—বিপ্লবের জন্য বিপ্লব নয়, নব সৃষ্টির জন্য মহৎ মানব-কল্যাণের জন্য চাই আমূল পরিবর্তন।

উপরোক্ত চারটি রূপক-নাটিকারই পরিসর স্বল্পপরিমিত; এগুলি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী ক'রে লিখিত নয়, বেতারে ও মজলিশে অভিনীত হওয়ারই উপযোগী।

৬.

১৩৩৫ সালে নজরুল মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে যোগ দেন সঙ্গীতাচার্য রূপে। অভিনয়ের নাটকগুলির গান রচনা এবং গানে সুর যোজনা ছিল তাঁর কাজ। সে-সময় রেডিয়ো-আসরে ও গ্রামোফোনে অভিনীত শ্রীমনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাহাঙ্গীর' নাটকের জন্য মুঘল-রঙ্‌মহলার রূপ-কুমারীদের এই গানটি লিখে দেন নজরুল—

রঙ্‌মহলে গো রঙ্‌মশাল মোরা
আমরা রূপের দীপালি।
রূপের কাননে আমরা ফুল-দল
কুন্দ মল্লিকা শেফালী।

এই একটি গানেই নাটকটির সাঙ্গীতিক মর্যাদা এতখানি বৃদ্ধি পায় যে, দর্শকদের ভিড় অভাবিত রূপে বেড়ে ওঠে। শ্রীমন্মথ রায়ের 'মহুয়া', ও 'কারাগার', 'সাবিত্রী' ও 'সতী', শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজুদ্দৌলা' প্রভৃতি বহু নাটকের গান নজরুলের রচনা। 'সিরাজুদ্দৌলা' নাটকের এই গানটি সেদিন কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হয়েছে—

পলাশী! হায় পলাশী!
এঁকে দিলি তুই জননীর মুখে
কলঙ্ক কালিমারাশি।
আত্মঘাতী স্বজাতির মাখিয়া রুধির কুঙ্কুম
তোর প্রান্তরে ফুটে' মরে' গেল পলাশ কুসুম
তোর গঙ্গার তীরে পলাশ-সঙ্কাশ
সূর্য ওঠে যেন দিগন্ত উদ্ভাসি'।

৭.

মনোমোহন রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে এসেই নজরুলের নাট্যপ্রতিভার বহুধা বিকাশ ঘটে। ১৩৩৬ আষাঢ়ের 'কল্লোল' এই 'সাহিত্য-সংবাদ'

পরিবেষণ করে যে, নজরুল একখানি 'অপেরা' লিখেছেন ; প্রথমে তার নাম দিয়েছিলেন 'মরুতৃষা', পরে বদলে নামকরণ করেছেন 'আলেয়া', সম্ভবতঃ মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত হবার জন্য। কিন্তু কার্যতঃ 'আলেয়া' অভিনীত হয় নাট্য-নিকেতনে ; প্রথম অভিনয়-রজনী : ৩রা পৌষ ১৩৩৮।

'আলেয়া' প্রতীকী-গীতিনাট্য। ভূমিকা'য় কবি বলেছেন :

"এই ধূলির ধরায় প্রেম-ভালোবাসা—আলেয়ার আলো। সিক্ত হৃদয়ের জলাভূমিতে এর জন্ম। ভ্রান্ত পথিককে পথ হতে পথান্তরে নিয়ে যাওয়াই এর ধর্ম। দুঃখী মানব এরই লেলিহান শিখায় পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

নর-নারীর হৃদয়ের রহস্য অপূর্ব কবিতত্বময় ভাষায় এই নৃত্যনাট্যে রূপায়িত হয়েছে।

মীনকেতু নায়ক, জয়ন্তী নায়িকা। মীনকেতু রূপসুন্দর যৌবনের প্রতীক। জয়ন্তী—যে তেজে যে শক্তিতে নারী রাণী হয়, নারীর সেই তেজ, সেই শক্তি। 'প্রস্তাবনা'তে প্রজাপতিদ্বয় গান গাইছে—

সেই সে পথে চলি
যে পথে আলেয়া-ছল।

* * *

মোরা চাহি না ক প্রেম,
চাহি মোহিনী মায়ায়।

এ-সব গানের ইঙ্গিত থেকে সূচনাতেই মনে জাগে যে, মিলনের সার্থকতা নয়, স্বপ্ন-কুহেলিকা সৃষ্টিই নাটকখানির উদ্দেশ্য। মীনকেতুর রাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম ক'রে জয়ন্তী বিজয়-অভিযান করেছে খবর পেয়ে মীনকেতু বলছে : "ও মরুচারিণী মায়াবিনী, চিরকালের চির-বিজয়িনী! রাজ্যের সকলকে এখনই ব'লে দাও, আজ তাদের রাজ্যকে

পরাজিত ক'রে তাদের রাজ্যলক্ষ্মী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছে।" প্রথম অঙ্কের পরিসমাপ্তিতে দেখি, যৌবনের এই প্রথম পরাজয়ের পরম গুণকে বরণ করতে মেঘ-বাদলের নৃত্যোৎসব," প্রকৃতির রাজ্যে উৎসবের ঘটা।

জয়ন্তীর মনের আদিম প্রবৃত্তিসমূহের প্রতীক 'উগ্রাদিত্য', তার সেনাপতি। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যাচ্ছে, জয়ন্তীর আপন আদিম বৃত্তিগুলির উপর এমন প্রভাব যে ঐ উগ্রাদিত্য তার "কাছে দিব্যি শান্ত হয়ে" থাকে। এই মাহাত্ম্য-গুণেই জয়ন্তীরা রাণী—পৃথিবীর মীনকেতুদের হৃদয়রাজ্যের রাণী হওয়ার যোগ্যা।

কিন্তু তৃতীয় অঙ্কে দেখা যাচ্ছে, জয়ন্তীকে একান্তভাবে পেতে চাইছে দুই বিরোধী শক্তি, নারীর আদিম প্রবৃত্তিগুলির প্রতীক উগ্রাদিত্য, এবং নিখিল পুরুষের প্রতীক মীনকেতু। এই দ্বন্দ্বে মীনকেতুর পৌরুষের আঘাতে উগ্রাদিত্যের পতন হলো। তখন জয়ন্তী বলছে : "এই মুহূর্তের রিক্তাকে নিয়ে তুমি সুখী হতে পারবে না, তাই বন্ধু বিদায়! যদি আমার মনে আবার সেই ক্ষুধা জাগে, যদি ঐ উগ্রাদিত্য প্রাণ পায়, কল্যাণীর সিঁথিতে সিঁদূর ওঠে, তবে আমি আবার আসব।"

অতঃপর পড়েছে 'যবনিকা'।

কিন্তু এই পৃথিবীতে প্রায় সর্বত্রই দেখা গেছে, জয়ন্তীরা যখন সর্বাংশে প্রবৃত্তিরূপীনী হয়ে মত্তদর্পে একাধিপত্য দাবী করে, তখন সেই কুৎসিৎ উগ্রাদিত্যটা রুচি-সুন্দর পুরুষের তীব্র আঘাতে অন্তর্ধান করে। উগ্রাদিত্যটাকে সম্পূর্ণ বশীভূত রাখতে পারে যে জয়ন্তীরা, তারাই হয় মীনকেতুদের হৃদয়-রাণী,—তা'রা যেমন নর্মবধূ, তেমনই মর্মবধূ; যেমন কামনার সহচরী, তেমনই আত্মার আত্মীয়া। মুহূর্তের জন্য প্রবৃত্তির ঐশ্বর্য হতে কোনো নারী যদি হয় রিক্তা, সেই শক্তির পুনরাবির্ভাবে নারী হয় আবার পুরুষের জীবন-লক্ষ্মী। পুরুষের পৌরুষ এবং নারীর প্রবৃত্তি, এ দুইয়ের ভূমিকা নাটিকাটিতে অপূর্ব রসমূর্তি লাভ করেছে।

৮.

নজরুলের 'মধুমালা' গীতিনাট্যর রচনা কাল অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ডিসেম্বর, ১৯৩৭। কিন্তু নাটিকাটি মঞ্চস্থ হয় রচনার প্রায় আট বছর পরে, ১৯৪৫ সালে। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে এর আগে অনেক গীতিনাট্যের অভিনয় হয়েছে ; কিন্তু এমন সর্বাঙ্গসুন্দর গীতিনাট্য দ্বিতীয় হয়নি।

মদনকুমার-মধুমালার কাহিনী সুপরিচিত। কিন্তু নজরুল ইসলাম এখানে কাহিনীটিকে গীতাভিনয়ের প্রয়োজনে কিছুটা নূতন ছাঁচে ঢেলেছেন। 'পুর্ববঙ্গ গীতিকা'য় মদনকুমার-মধুমালার পালা' আছে ; সে-পালার নায়ক—

উজানি নগরে ঘর　　　　নামে রাজা দণ্ডধর
তার পুত্র মদনকুমার।

নায়িকা নিজের পরিচয় দিয়ে বল্ছে—

কাঞ্চন নামেতে ঘর　　　　তার রাজা হীরাধর
আমি তার কন্যা মধুমালা।

নজরুলের নাটকখানিতে পাত্র-পাত্রীর পরিচয় : "প্রাগ্জ্যোতিষপুরের গারো পর্বতের কাছে কাঞ্চননগর, সে-দেশের অধিপতি দণ্ডধর," তার পুত্র মদনকুমার। "চারিদিকে সমুদ্রের জলকল্লোল, মাঝে সন্দ্বীপ," সেই দ্বীপরাজ্যের অধীশ্বর তাম্বুল, তার কন্যা মধুমালা। আরাকানের মগ রাজ চিত্র সেন, তাঁর পুত্র কুব্জপৃষ্ঠ বিচিত্রকুমার। ত্রিপুরার রাজা ইন্দ্রজিত, তার কন্যা কাঞ্চনমালা। মদনকুমার মধুমালার সন্ধানে এসে দৈবদুর্বিপাকে পরিণয়ের 'অভিনয়' করলো কাঞ্চানমালার সাথে। শুভদৃষ্টির পর নবপরিণীতাকে মদনকুমার বলছে—

"আমি মধুমালার সন্ধানে বেরিয়েছিলাম সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে। পথে জাহাজ-ডুবি হয়ে আমার সেনা সামন্ত সকলে মারা যায়। আমার যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখলাম আমি মগ-রাজের রাজপুরীতে বন্দী।

মগ-রাজপুত্র অতি কুৎসিৎ ব'লে রাজা আমাকে দেখিয়ে তোমার সাথে তাঁর পুত্রের সম্বন্ধ ঠিক করেন। তাঁর সঙ্গে আমার এই শর্ত যে, বাসর-ঘরে ঢুকেই আমি বেরিয়ে পড়ব—তিনি তাঁর সেনা দিয়ে আমাকে মধুমালার দেশে পাঠিয়ে দেবেন। আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি, এখন তোমার কর্তব্য তুমি ঠিক ক'রে নিও।........"

কাঞ্চনমালা কিন্তু বেছে' নিল যোগিনীর অভিসার পথ ; স্বামী-সন্ধানে একদিন পৌঁছল গিয়ে সাগর-ঘেরা দ্বীপের কূলে। মধুমালা ঘুমপরীর মুখে শুনেছিল কাঞ্চনমালার সাথে মদনকুমারের "অপরূপ বিবাহের কথা" ; তাই তাদের "অমৃতের সংসারকে লবণাক্ত করতে" চাইল না ; কাঞ্চনমালার হাতে মদনকুমারকে সমর্পণ ক'রে সমুদ্রের জলে করলো আত্মবিসর্জন। আত্মত্যাগের ক্ষণে চির-আরাধ্যকে উদ্দেশ্য ক'রে আর্তকণ্ঠে' বললো : হে আমার চির-জনমের স্বামি—প্রণাম ! প্রণাম !"

এই উপসংহার অতি করুণ। ক্লাসিক্যাল আদর্শের নাট্যকারেরা এরূপ বিষাদান্ত ঘটনাকে ক'রে থাকেন দৈব-নিয়ন্ত্রিত এখানে মধুমালা যদি "সাগর জলে ঝম্প-প্রদান" না ক'রে দৈবক্রমে সৈকতচ্যুত বা তরঙ্গ-তাড়িত হয়ে আত্মদান করতো, তা হলে ঘটনাটি সমগ্র নাটকের সাথে সুসঙ্গত হতো। নাটকের কোনা ঘটনা যাতে "অকস্মাৎ অতিমাত্রায় আঘাত না করে," সেজন্য "অলৌকিক ব্যাপারের দ্বারা আবৃত" ক'রে নাট্যসৌন্দর্য সুগম রাখা ক্লাসিকপন্থী নাট্যকারের রীতি। 'মধুমালা' গীতিনাট্যে এই রীতির সার্থকতা প্রতিপন্ন করছে ঘুমপরীর ভূমিকা।

এই গীতিনাট্যের ভাষা মধুবর্ষী, গাঁথুনিতে সুঠাম শব্দগুলি হীরক-খণ্ডের মতো ঝকমক করছে। দক্ষ শিল্পীর মতো নজরুল চরিত্রগুলি অঙ্কন করেছেন ; তাতে ভাস্কর্যের দীপ্তি আছে, তারও চাইতে বেশী আছে প্রাণের স্পর্শ। তাঁর এ শিল্পসৃষ্টি মহান ও কালজয়ী।

৯.

নজরুল শুধু রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের নাটকেই নয়, 'চৌরঙ্গী', 'দিকশূল,' 'নন্দিনী,' 'চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার লুণ্ঠন', 'পাতালপুরী' প্রভৃতি বহু বাণীচিত্রেও গান রচনা করেছেন। তিনি 'ধ্রুব' ছায়াচিত্রে 'নারদের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁর 'বিদ্যাপতি' ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়। বিদ্যাপতি ও অনুরাধা, রাজা শিবসিংহ ও রাণী লছমী, মৈথিলী পদাবলীর এ-সকল সুপরিচিত চরিত্র আশ্রয় ক'রে তাতে যে বিপুল সৌন্দর্য ও উচ্ছল রসের সৃষ্টি করা হয়েছে, তা অতুলনীয়।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে নজরুলের নাট্যচিত্র-'সাপুড়ে' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। এই চিত্রকাহিনীটির পরিকল্পনায় 'মহুয়া', 'মাঞ্জুর মা' ও 'পীরবাতাসী,' এ তিনটি পালাগীতির প্রভাব প্রচুর। এর নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন শ্রীমতি কানন দেবী; তাঁর সুধাবর্ষী কণ্ঠে গীত হ'য়ে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করে নজরুলের এ দু'টি গান—

১। আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ

২। কথা কইবে না বউ

নজরুলের এ দুইটি চিত্রবাণী গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। যতদূর মনে পড়ে, কলকাতার কোনো মাসিকপত্রে বিদ্যাপতি'র চিত্রকাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল। 'বিদ্যাপতি' হিজ্ মাস্টারস্ ভয়েস্ কোম্পানী 'রেকর্ড' করেছিলেন। নজরুলের 'পুতুলের বিয়ে' ছোট মেয়েদের গীতিনাটিকা, সেইটি গ্রন্থবদ্ধ ও রেকর্ড হয়েছে। তাঁর 'বিয়ে বাড়ী', 'শ্রীমন্ত' ও 'প্রীতি-উপহার' রেকর্ড হয়েছে, কিন্তু গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। 'ঈদলফেতর' বেতার নাটিকা; এই নাটিকার নায়ক মাহতাবের উক্তিতে আছে নজরুলের পরিণত বয়সের অধ্যাত্ম-কথার প্রতিধ্বনি।

নজরুল-সাহিত্যের এক দিক

মুসলিম বাঙার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৬৪-তম জন্মবার্ষিকী-দিবস উপলক্ষে ১১ই জ্যৈষ্ঠ এই উপ-মহাদেশের বহু স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হচ্ছে। কিন্তু করাচীর নজরুল একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের বিশেষ তাৎপর্য। তার কারণ, নজরুলের সাহিত্য-প্রতিভার প্রথম বিকাশ হয়েছিল করাচীতে। তিনি কিশোর বয়সে পল্লীর নট্ট (লেটো)-দলের সংস্পর্শে এসে 'চাষার সঙ্,' 'শকুনিবধ', 'দাতাকর্ণ' প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন প্রণয়ন করেছিলেন বটে; কিন্তু যে অলোকসামান্য শিল্প-প্রতিভার জন্য তিনি আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী, তার প্রকৃত বিকাশ ঘটে করাচীর সেনানিবাসে। বলা বাহুল্য যে, নজরুলের কবিত্বশক্তি যদি গ্রামের কবিওয়ালা বা লেটোওয়ালাদের বিচরণ-ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকতো, তা হলে এই ক্ষ্যাপা কবির আসন বড়জোর লাভ হতো দাশরথি রায়, ভোলা ময়রা, রূপচাঁদ পক্ষী, ফিরিঙ্গি এণ্টনি, গোবিন্দ অধিকারী, পাগলা কানাই প্রভৃতির পংক্তিতে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে ৪৯নং বাঙালী পল্টনে যোগ দিয়ে নৌশেরা, কোয়েটা ও করাচী অবস্থানের ফলে নজরুলের কল্পনার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয় বিশ্বের বিরাট দিগন্ত; ফলে যাত্রা-দলের গ্রাম্য গায়েনের বাউণ্ডুলে বেশ পরিহার ক'রে তিনি রাতারাতি লাভ করলেন ভব্য কবির মর্যাদাবান আসন। তাঁর সেদিনের রচনায় পশ্চিম-পাকিস্তানের আকাশ-বাতাস পাহাড়-প্রান্তর নদী-ঝর্ণা বীথিকা-বনানী বিচিত্র সুরে ও সৌন্দর্যে বাঙময় হয়ে ওঠলো।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নজরুল সিয়ারসোল রাজ-হাইস্কুলে Class X-এর ছাত্র; ষাণ্মাষিক পরীক্ষার পর তিনি বাঙালী পল্টনে নাম লেখালেন

এবং বাৎসরিক পরীক্ষার পরই তাঁকে হাওড়া থেকে ট্রেণে লাহোর হয়ে নৌশেরা যেতে হ'ল। এ-প্রসঙ্গে কবি বলেছেন :

"ক্লাশে ছিলাম আমি ফাষ্ট বয়। হেড্ মাষ্টারের বড় আশা ছিল—আহি স্কুলের গৌরব বাড়াব। কিন্তু এ-সময় এল ইউরোপের মহাযুদ্ধ। একদিন দেখলাম, এদেশ থেকে পল্টন যাচ্ছে যুদ্ধে। আমিও যোগ দিলাম এই পল্টন দলে।"

তাঁর পল্টন-জীবনের রচনা 'রিক্তের বেদন' করাচীতে 'আরব-সাগরের বিজন-বেলায়' বসে লেখা গল্পসমষ্টি। সে-গ্রন্থের প্রথম গল্প 'রিক্তের বেদন' এক সৈনিকের রোজনামচা। তাতে সৈনিকের কর্তব্য সম্বন্ধে নায়ক বলছে :

"আমাদের কাজের উপর আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কষ্টিপাথরের মতো সহ্যগুণ আমাদের থাকা চাই, তবে না জগতের লোকে যাচাই ক'রে নেবে যে, বাঙ্গালীরাও বীরের জাতি।"

নজরুল তাঁর পল্টন-জীবনেই 'বাঁধনহারা' রচনা সমাপ্ত করেছিলেন। 'বাঁধনহারা' বোধ হয় বাঙলা ভাষায় প্রথম পত্রোপন্যাস। তার নায়ক নায়ক 'নুরুল হুদা' 'করাচী সেনানিবাস' থেকে একখানি পত্রে লিখছে :

"আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সাময়িক শিক্ষাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশের লোকের এত আশা, আমাদের প্রতি তাঁদের এত স্নেহ-আদরের সম্মান প্রাণ দিয়েও রাখতে হবে।"

—(বাঁধনহারা, ৯৫ পঃ)

এ-সকল চরিত্রে নজরুলের নিজের জীবনের ছায়া পড়েছে এবং তাদের এ-ধরণের নানা উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, নজরুল একটা রোমান্টিক খেয়ালের বশে যুদ্ধে যোগ দেননি ; বাঙালীর ভীরুতা অপবাদ অপনোদন এবং বিজ্ঞানসম্মত সামরিক শিক্ষা লাভের সেই প্রথম সুযোগের সদ্ব্যবহার, এই দুই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি যুদ্ধের

জীবন-মরণ খেলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাতে সামরিক বৃত্তিতে বাঙালীর কৃতিত্ব প্রদর্শনের পথ কতখানি প্রশস্ত হয়েছে সে-বিচার ইতিহাসবিদ্ করবেন ; কিন্তু আমাদের বড় বিবেচ্য এই যে, নজরুলের যুদ্ধ গমনের কল্যাণে ঝিলম পেশোয়ার কোয়েটা করাচী বেলুচিস্তানের প্রকৃতি ও মানুষ হয়েছে বাঙলা সাহিত্যের পাঠকদের পরিচিত। বৃষ্টি-বিধৌত করাচীর একটি বর্ণনা শুনুন—

"আজ করাচিটা এত সুন্দর বোধ হচ্ছে, সে আর কি বলব !

"কাল সমস্ত রাত্তির ধ'রে ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে খুব একটা দাপাদাপির পর এখানকার উলঙ্গ প্রকৃতিটা অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দিব্যি শান্ত স্থির বেশে—যেন লক্ষ্মী মেয়েটির মত ভিজে চুলগুলি পিঠের উপর এলিয়ে দিয়ে রোদ্দুরের দিকে পিঠ ক'রে বসে আছে : এই মেয়েই যে একটু আগে ভৈরবী মূর্তিতে সৃষ্টি ওলট-পালট করবার জোগাড় করেছিল, তা তার এখনকার এ সরল শান্ত মুখশ্রী দেখে কিছুতেই বোঝা যায় না। ....মেঘে মেঘে জটলা, তার উপর হাড়-ফাটানো কন্‌কনে বাতাস ; করাচি বুড়ি সমস্ত রাত্তির এই সমুদ্দুরের ধারে গাছপালা-শূন্য ফাঁকা প্রান্তরটায় দাঁড়িয়ে থুরু থুরু ক'রে কেঁপেছে, আর এখনকার এই শান্ত শিষ্ট মেয়েটিই তার মাথার উপর বৃষ্টির পর বৃষ্টি ঢেলেছে। বজ্রের হুঙ্কার তুলে বেচারীকে আরও শঙ্কিত ক'রে তুলেছে, বিজুরির তড়িতালোকে চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিয়েছে, আর সঙ্গিনী উন্মাদিনী ঝঞ্ঝার সঙ্গে হো হো ক'রে হেসেছে। তারপর সকালে উঠেই এই দিব্যি শান্ত শিষ্ট মূর্তি।"

—(বাধনহারা, ৫—৬ পৃঃ)

নজরুলের দক্ষ হাতে পশ্চিম-পাকিস্তানের নানা স্থানের নিসর্গ শোভা এমনই মনোহর রূপে বর্ণিত হয়েছে। ঝিলম-নদীর তীরের একটি দৃশ্য তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবে—

"সেদিন ভোরে ঝিলাম নদীর কূলে তার সঙ্গে আবার দেখা হ'ল। সে আসছিল একা নদীতে স্নান ক'রে। কালো কশ্‌কশে ভেজা চুলগুলো আর ফিরোজা রঙের পাৎলা উড়ানিটা ব্যাকুল আবেগে তার দেহলতাকে জড়িয়ে ধরেছিল। আকুল কেশের মাঝে সগুস্নাত সুন্দর মুখটি তাল দীঘির কালো জলে টাটকা ফোটা পদ্ম ফুলের মত দেখাচ্ছিল। দূরে একটা জলপাই গাছের তলায় বসে সরল রাখাল বালক গাইছিল—

গোরী ধীরে চলো,
গাগরি ছলকে না যায়—
শির' পরি গাগরি, কমর মে ঘড়া,
পাৎরি মকরিয়া তেরি বলখ না যায়,
আহা টুট না যায় ;—
গোরী ধীরে চলো।"

—(রিক্তের বেদন, ৬৩ পৃঃ)

করাচীর এই বৃষ্টিস্নাত মোহন শোভা আর ঝিলাম-তীরের সদ্যস্নাতা সুন্দরীর উদ্দেশ্যে প্রেমিকের হৃদয়-ব্যথা নিবেদন কি পুর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীদের মনেও একই অনুরণন তোলে না ? মনে কি হয় না যে, তাদের এলাকাতেও নামে এমনি বৃষ্টিধারা, মেঘনা-সুরমা-শীতলক্ষ্যার তীরেও গাগরী কাঁখে সুন্দরীরা শোনে এমনি মধুর মিনতি ?

অবশ্য বৈচিত্র্যও আছে। সে প্রকৃতির রূপবিন্যাসের বৈচিত্র্য, মানুষের জীবন-যাত্রার বৈচিত্র্য। নজরুলের 'হেনা' গল্পের একটি দৃশ্য—

"সেদিন জাফরানের ফুলে যেন খুন-খুশরোজ মেলা হচ্ছিল বেলুচিস্তানে ময়দানে। আমি আনমনে আখরোটের ছোট একটা ডাল ভেঙ্গে কাছের দেবদারু গাছ থেকে কতকগুলো ঝুমকো ফুল পেড়ে হেনার পায়ের কাছে পেড়ে দিলুম। তাম্বুলী সুর্মা-মাখা তার কালো আঁখির

পাতা ঝরে' দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তার মেহদী-ছোপানো হাতের চেয়েও লাল হয়ে উঠেছিল তার মুখটা!"

—(ব্যথার দান, ৪৪ পৃষ্ঠা)

এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ পৃথক বটে; কিন্তু অন্তরের ব্যাকুলতা প্রকাশের ধরণটা আলাদা নয়। মানুষের মনের এই মিল শাশ্বত। এই অন্তঃপ্রবাহী ঐক্যের সূত্রেই মানুষে মানুষে বন্ধন হয়েছে দৃঢ়তর ও অর্থবহ।

পূর্বেই বলেছি, করাচী নজরুলের সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশে প্রভূত সহায়তা করেছে। তিনি এ-সম্পর্কে তাঁর 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন—

"আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরেজী ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়!

"আমাদের বাঙালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেব থাকতেন। একদিন তিনি 'দেওয়ান-ই-হাফিজ' থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনান। শুনে' আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সী ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সী কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি।

"তখন থেকেই আমার হাফিজের 'দীওয়ান' অনুবাদের ইচ্ছা হয়। কিন্তু তখনো কবিতা লিখবার মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় ক'রে উঠতে পারিনি। এর বৎসর কয়েক পরে হাফিজের 'দীওয়ান' অনুবাদ করতে আরম্ভ করি।

নজরুলের অনূদিত 'দীওয়ান-ই-হাফিজ'-এর ৮টি গজল মোসলেম ভারত, প্রবাসী ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। একটি গজলের গোড়ার চার ছত্র—

ত্যজি' মসজিদ কা'ল মুর্শিদ মম আস্তানা নিল মদশালা,

নেবে কোন্ পথ এবে পথ-রথ ওগো সুহৃদ্ সখি পথবালা!

আমি মুসাফির যত শারাবীর ঐ খারাবীর পথ-মঞ্জিলে ;
সখি মাফ চাই, বিধি এই রায় ভালে লিখেছিল আমি জন্মিলে।

এখানে প্রচলিত আচার-পদ্ধতি ও গতানুগতিকার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের আভাস, অবন্ধন-প্রিয় মরমীয়া মনের যে আকূতি প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর পরবর্তীকালের রচনায় তারই পরিণত রূপ দেখা যায়।

নজরুলের 'ব্যথার দান' করাচী থাকতেই লেখা। 'ব্যথার দান' গল্পটিতে "শিরাজ-বুলবুল-এর 'দীওয়ান' এবং সাধক-শ্রেষ্ঠ প্রেমিক রূমীর গজল"-এর উল্লেখ আছে। তাঁর 'সালেক' গল্পটি রূপক ; তাতে হাফিজের একটি বিখ্যাত গজলের মনোহর রূপায়ণ রয়েছে। ইরানের এই দুই অমর প্রতিভার প্রভাবে এসে নজরুলের আত্মিক জীবনে যে মধু সঞ্চয় হয়, তারই জের চলেছে তাঁর লেখক-জীবনের শেষ অবধি।

নজরুলের কিশোর বয়সের রচনায় গ্রাম্য কবিয়াল ও পুঁথিয়ালদের ঢঙে আরবী-ফার্সী-উর্দু-হিন্দী-ইংরেজী শব্দের মিশ্রণ দেখা যায় ; সে মিশ্র ভাষায় গ্রাম্যতা-দোষ প্রচুর। কিন্তু হাফিজ-রূমীর কাব্যের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার পর থেকে তিনি তাঁর মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের বহু কবিতায় যেভাবে আরবী-ফার্সী-উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন তা সুমার্জিত ও মধুবর্ষী। সেই প্রথম জীবনে তিনি উর্দু জবানে কয়েকটি গীতি-কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর 'সোহাগ' শীর্ষক গানটির প্রথম দু'চরণ—

গুলশান কো চুমচুম কহ্‌তে বুলবুল,
রুখসারা সে বেদরদী বোরকা খুল্‌ !

শরাবন-তহুরা' শীর্ষক গজলটির প্রারম্ভ—

নার্গিস বাগ্‌মে বাহার কি আগ্‌মে ভরা দিল দাগ্‌মে
কাঁহা মেরি পিয়ারা, আও আও পিয়ারা !
দুক দুক ছাতিয়া, ক্যায়সে এ রাতিয়া কাটু বিসু সাথিয়া
ঘাবড়ায়ে জিয়ারা, তড়পত জিয়ারা ॥

নজরুলের আবির্ভাবের আগে রচিত অনেক পুঁথিতে ও নাটকে উর্দু গান পাওয়া যায় বটে ; কিন্তু এমন অনবদ্য ও হৃদয়গ্রাহী রচনা বাঙ্গালা সাহিত্যে আজও দুর্লভ।

নজরুলের রচনায় আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দাবলীর প্রয়োগ সুঠাম ও সুষ্ঠ হয়েছে, তাঁর রচনায় পশ্চিম পাকিস্তানের নানা স্থানের রূপময়তা অপূর্ব রসমূর্তি লাভ করেছে, এ আমরা দেখেছি। ১৩২৭ মাঘের 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় তাঁর 'বিরহ-বিধুরা' শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশিত হয় ; তার পাদটীকায় উল্লেখ আছে যে, "কাবুলী কবি খুশহাল খান খটকের হিন্দুস্তানে নির্বাসন-কালীন তাঁর সহধর্মিণীর লিখিত একটি কবিতার ভাব-অবলম্বনে" তা রচিত। 'বিরহ-বিধুরা'র প্রারম্ভিক শ্লোক—

কার তরে ? ছাই এ পোড়ামুখ আয়নাতে আর দেখবো না,
সুর্মা-রেখার কাজল-হরফ নয়নাতে আর লেখবো না !

এ-সব শ্লোক পড়ে' পুশ্‌তো থেকে ভাবানুবাদ ব'লে মনেই হয় না। এ যেন বাঙ্গলা ভাষারই এক বিরহগাথা !

ইকবালকে বাঙালী পাঠকের কাছে পরিচিত করাবার কল্পনাও নজরুলই প্রথম করেছিলেন। ১৯৩২ সালের ঘটনা। একদিন সকালে আমি, মরহুম আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন, মরহুম কবি আশরাফ আলী খান ও মরহুম কবি আজিজুল হাকিম, এই চার বন্ধু মিলে কলকাতায় ৩৯নং সীতানাথ রোডে নজরুলের বাসায় গিয়েছিলাম। কথা-প্রসঙ্গে নজরুল ইসলাম বললেন যে, তিনি ইকবালের 'শেকোয়া' ও 'আসরার-ই-খুদী', হাফিজের 'রুবাইয়াৎ' ও ওমর খৈয়ামের সমগ্র 'রুবাই' মূল থেকে অনুবাদের সংকল্প করেছেন, কেননা অন্য কেউই এই প্রয়োজনীয় কাজে অগ্রসর হচ্ছে না। তখন আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন বললেন যে, তিনি কবি নন এবং ফারসী ভালো জানেন না, তবে ইকবালের 'আসরার-ই-খুদী' ইংরেজী অনুবাদের সাহায্যে বাংলা গদ্যে রূপান্তরের

চেষ্টা করতে পারেন। আশরাফ আলী খান বাংলা পদ্যে 'শেকোয়া' অনুবাদের ভার নিলেন। আজিজুল হাকিম সমগ্র 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমরখৈয়াম' অনুবাদের আশ্বাস দিলেন। অচিরেই আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন বাংলা পদ্যাত্মক গদ্যে 'আসরার-ই-খুদী'র যে অনুবাদ প্রস্তুত করেন, তা মাসিক 'মোয়াজ্জিন'-এ ১৩৪৽ সালের ভাদ্র, আশ্বিন ও পৌষ সংখ্যায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। আশরাফ আলী খানের অনুবাদ 'শেকোয়ায়ে-ইকবাল' শিরোনামে মাসিক 'মোয়াজ্জিনে'ই ১৩৪০ সালের শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। ১৩৪০ সালের কার্তিক মাসে আশরাফ আলী তাঁর 'শেকোয়া'-কাব্য গ্রন্থাকাবে প্রকাশ করেন, তা 'উৎসর্গ' করেন "বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের দরাজ-দস্তে"। নজরুল মনে করতেন যে, বাঙ্গলার মুসলমানরা ইকবালের 'শেকোয়া' ও 'আসরার ই-খুদী' থেকে প্রচুর প্রেরণা পেতে পারেন তাই তিনি এই দু'খানি কাব্য বাঙলায় ভাষান্তরের আবশ্যকতা বোধ করেছিলেন।

বাঙ্গালী মুসলমানের ঐহিক ও আত্মিক জীবনের দুর্গতি নজরুলের মনে সঞ্চার কবেছিল তীব্র বেদনা-বোধ ; তাই ইকবালের মতো তিনিও চেয়েছিলেন সকল সামাজিক কুসংস্কার ও আধ্যাত্মিক অচলায়তনের বেড়াজাল থেকে আশু অব্যাহতি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশ্ব-মুসলিমের পশ্চাদপসরণ লক্ষ্য ক'রে তাঁর মনে হয়েছিল যে, এই অধোগতি প্রতিরোধ করতে হলে চাই বৃহতের সাধনা। তিনি পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজের জননেতাদের ডেকে বলেন :

"আল্লাহর ঊর্ধ্বের জালাল-শক্তিকে স্পর্শ করতে হবে তাঁদের, যাঁরা দেশকে জনগণকে পরিচালিত করতে চান।....

"আল্লাহ্‌র শক্তিতে নির্ভর কর, তাঁর পরমাশ্রয়ে তোমার আত্মীয়-স্বজনকে সমর্পণ ক'রে রাহে-লিল্লাহ্ আত্মনিবেদন কর।"

আল্লাহ্‌তে সর্বস্ব সমর্পণ ভিন্ন যে জাতির বা সমাজের সর্বাঙ্গীণ শ্রেয়োসাধন কোনো ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়, এই পরম প্রত্যয় তাঁর অন্তরে ছিল দৃঢ়মূল। সত্য ও শ্রেয়ের পথে আত্মোৎসর্গ মুসলমানের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সাম্য ও মৈত্রীর সাধনাতেই মুসলিমত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, এই বিদ্যুৎগর্ভ বাণী নজরুলের বলদৃপ্ত কণ্ঠে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। তিনি বলেছেন—

ধর্মের পথে শহীদ যাহারা, আমরা সেই সে জাতি,
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি।

ইসলাম ধর্মের নীতির নিরিখেই তিনি মুসলমানের জাতীয়ত্ব সাব্যস্ত করেছেন। এই জাতীয়ত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্যে তিনি বাঙ্গলার মুসলমানকে পরামর্শ দিয়েছেন—

"রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মতো আমাদেরও কালচারের সভ্যতার জ্ঞানের সেণ্টার বা কেন্দ্রভূমির ভিত্তি স্থাপনের মহৎ ভার আপনারা গ্রহণ করুন।

বাংলার সকল চিন্তাশীল মুসলমানদেরও অনুরোধ করছি, মাতৃভাষায় আপনাদের সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস-সভ্যতার অনুবাদ ও অনুশীলনের কেন্দ্রভূমি যেখানে হোক প্রতিষ্ঠা করুন।"

নজরুলের এই মূল্যবান পরামর্শ আমরা কবে সম্পূর্ণ ফলবতী করতে পারব, তা ভবিতব্যই বলতে পারেন। কিন্তু এ কথা মানতেই হবে যে, মুসলিম কালচারের সার্থক রূপায়ণ আমাদের কাম্য হলে এরূপ একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপনা ভিন্ন অন্য উপায় নেই।

এ সত্য সুবিদিত যে, নজরুল আজীবন হিন্দু-মুসলমানে মিলন স্থাপনে অকৃত্রিম প্রয়াসী ছিলেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর কলকাতা এলবার্ট হলে বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সম্বর্ধনার উত্তরে নজরুল তাঁর প্রতিভাষণে বলেছিলেন—

"আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাণ্ডশেক্ করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করবার চেষ্টা করছি। সে হাতে-হাত-মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে তা হলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে। আমার গাঁট-ছড়ার বাঁধন কাটতে তাদের কো' বেগ পেতে হবে না।"

বৃটিশের কঠোর শাসন-কবল থেকে অবিলম্বে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে এই উপ-মহাদেশের হিন্দু-মুসলমানকে এক জমায়াতে ঐক্যবদ্ধ করতে নজরুল সর্বাপেক্ষা অধিক আন্তরিকতা সহকারে চেষ্টা করেছিলেন। কবি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা, তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে ভবিষ্যতের এই ছায়াপাত ঘটেছিল যে, তাঁর সে-উদ্যম ব্যর্থ হলে অবলীলাক্রমেই হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি হিসাবে আলাদা হয়ে যাবে। হয়েছেও তাই। এই উপ-মহাদেশের হিন্দু ও মুসলমান ইতিহাসের দুর্নিবার স্রোতোধারায় যথাকালে 'আলাদা হয়ে' দুই আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন,—এই দুই রাষ্ট্রের দুই জাতি আজ আলাদাভাবে তাঁদের ভাগ্যগঠনের চেষ্টা করছেন, তাঁদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি আজ স্বতন্ত্রভাবে বিকাশ লাভ করছে।

আমাদের সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে নজরুল বহু পূর্বে তাঁর "বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান" প্রবন্ধে বলেছিলেন—

"যাহা বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পায় না, তাহা স্থায়ী সাহিত্য নয়, খুব জোর দু'দিন আদর লাভের পর তাহার মৃত্যু হয়! আমাদিগকে তাই এখন করিতে হইবে সাহিত্যে সার্বজনীনতা সৃষ্টি। অবশ্য, নিজের জাতীয় ও দেশীয় বিশেষত্বকে না এড়াইয়া না হারাইয়া। যিনি যে দেশেরই হউন, সকলেরই অন্তরের কতকগুলি সত্য আছে, সূক্ষ্মতম ভাব আছে, যাহা সকল দেশের সকল লোকের পক্ষেই সমান; সাহিত্য সৃষ্টির সময় ভিতরের এই সব সূক্ষ্ম দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।" —(যুগবাণী)

আমাদের সাহিত্যেও স্বতঃই ফুটবে আমাদের দেশের প্রাকৃতিক ও চারিত্রিক বিশেষত্ব, আমাদের জাতির মনের সূক্ষ্মতম ভাব—অন্তরের

অন্তঃপ্রবাহী ভাবের রঙ্। ফলে সে-সাহিত্য হবে বিশেষ, অথচ তাতে থাকবে নির্বিশেষের দ্যোতনা।

নজরুল বাঙলার প্রথম জাতীয় গণতান্ত্রিক কবি। তাঁর আগে আর কোন কবি বা সাহিত্যিক দেশের হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতিনিধিস্থানীয় বলে' হয়তো তাদের মনের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করেননি। এহেন নজরুলের সাহিত্য-প্রতিভার স্ফূরণে, পূর্বেই বলেছি, করাচীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়; কাজেই করাচীতে তাঁর অসামান্য কবি কীর্তিকে স্মরণীয় ক'রে রাখার জন্য করাচীর নাগরিকদের উদ্যোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। করাচীর নজরুল-একাডেমির স্থায়ী ভবন নির্মাণ ক'রে তাতে পাঠাগার, মিউজিয়াম, সভাকক্ষ ও নাটমঞ্চ স্থাপিত হলে কবির প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা হবে ব'লে আমার বিশ্বাস।*

*গত ২৪শে মে করাচীর নজরুল একাডেমির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নজরুল-সাহিত্য-সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ।

বাঙালা সাহিত্যে নজরুল

কাজী নজরুল ইস্‌লামের কল্যাণেই একালের বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার দিকে বৃহত্তর দেশের দৃষ্টি প'ড়ছে,—এ বল্‌লে অন্যায় হয় না। ঊনবিংশ শতকের বাংলাদেশ যে সমাজ-সংস্কার কামনা করেছিল, তারই ফলে হয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্য। বিংশ শতাব্দীর আমরা যে সামাজিক বিপ্লব চাইছি, তার পূর্বাভাস ছিল নজরুলের রচনায়। তাই তরুণ বাঙালী সেদিন নজরুলকে এমন অভিনন্দন জানালে। কিন্তু এই অভিবন্দনা বেশীদিন শোনা গেল না। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখে বের হয় আমার "জয়ন্তী"; সে-সময় শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একখানি পত্রে আমাকে লেখেন:—"আমার দুর্ভাগ্য এই যে, আমি কাজী নজরুলের গানের সমালোচনা করেছিলাম কোন্ কুক্ষণে। কাজী একজন আর্টিষ্ট, তিনি হলেন দেবতার বাচ্চা; আমি carp-ই করিতে পারি। আজ যদি কাজীকে পেতাম তা'হলে তার সামনেই বলতাম যে, তাঁর নিজের দোষেই তিনি নিজের ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। তাই বলে' তাঁর ক্ষমতা নেই, কে অস্বীকার করবে! তবে এ কথা ঠিক যে তাঁকে কেন্দ্র ক'রে কোনো 'পত্রিকা' ঘুরতে পারে না; কারণ astronomical; তিনি জ্যোতিষ্ক নন, তিনি ধূমকেতু, আর ধূমকেতুর কোনো উপগ্রহ থাকে না,—সকলেই জানে।"........

কিন্তু আমার 'জয়ন্তী' পত্রিকার আসরে নজরুল ইসলাম একেলা আসেন নি; কয়েকজন চিন্তাশীল অধ্যাপক তাতে সূচনা করেছিলেন মুক্ত-বুদ্ধিবাদের আন্দোলন। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে হয়েছিল নজরুলের প্রতিপত্তি। সমাজ-বিপ্লবের যে বিপুলতর পরিকল্পনার আভাস ছিল তাঁর সাহিত্যে, তার স্পষ্টতর প্রকাশ সম্ভব করিতে যখন তিনি আর অগ্রসর হলেন না, তখন মুসলিম বাঙলার চিন্তাধারায় দেখা দিলেন উক্ত

অধ্যাপক দল। Church-এর বিরুদ্ধে Rationalist-দের প্রতিবাদ, সপ্তাদশ শতকের Humanism এবং অষ্টাদশ শতকের Liberalism, এ-সবের কিছু প্রভাব 'জয়তী'র নব্য-শিক্ষিত লেখকদের রচনায় লক্ষ্য করা যেতেপারে। এঁরা বিশেষভাবে মেতেছিলেন ধর্মীয় বাদ-বিতণ্ডায়—তাঁদের শ্রোতার অভাব সেদিন বেশী হয় নাই। কিন্তু নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের পর বাঙলার মুসলমান এক অদ্ভুত ধরণের রাষ্ট্রনীতিকতার দিকে মন ফিরিয়েছে; এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে উক্ত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠি লেখনী কিছুটা গুটিয়েছেন। অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন 'জয়তী'য় অন্যতম বিশিষ্ট লেখক; তিনি বলেছেন: "বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারীরা নূতন সমাজের ব্রাহ্মণ হয়েছেন; নব্য-ব্রাহ্মণের দল বিদেশী রাজার অনুচর ও গুপ্তচর; তাঁরা বিজাতীয় সভ্যতার পৌরহিত্য ক'রে অর্থ ও সংসারে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন; তাঁদেরকে বুদ্ধিজীবী বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা পরশ্রমজীবী—কি বিদ্যার, কি অর্থের, কি প্রতিষ্ঠার।"—(আমার ও তাঁহারা, মুখবন্ধ।) উপরোক্ত মুসলমান তরুণদল বৈদেশিক সংস্কৃতির খবরদারী করতে গিয়ে স্বদেশ ও স্বসমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কথা ভেবেছিলেন বটে; কিন্তু ভবিষ্যৎ সমাজের কোনো সুস্পষ্ট আদর্শ তাঁদের কল্পনায় তেমনভাবে ধরা দেয়নি। সামাজিক বিপ্লব-আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন আমাদের বর্তমান আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন; সেই পরিবর্তনের মুখেই সৃষ্টি হবে নব্য-সাহিত্য, এ-কথা এখানে স্মর্তব্য।

কিছুদিন আগে সাপ্তাহিক 'দুন্দুভি' পত্রিকায় নজরুল ইসলাম জানিয়াছেন: "কোন সাহিত্যিক উৎসবে আমার আমন্ত্রণ অপরাধ, হয়তো তার চেয়েও বেশী, কেননা আমি ধর্মভ্রষ্ট, সাহিত্য-সমাজের পতিত। অপরিমাণ শ্রদ্ধা নিয়ে সাহিত্যকে আমি বিসর্জন দিয়ে এসেছি।"....তিনি তাঁর যৌবনের কাব্যানুশীলনকে তুলনা করেছেন "দদ্রুকণ্ডুয়নের" সংগে। আজ সুরচর্চা করতে গিয়েই তিনি সাহিত্য-

চর্চা সম্বন্ধে করছেন এ ধরণের উক্তি। কিন্তু এ-সব বিনয়োক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান যে গান, তা অস্বীকারের উপায় নেই। এই গানের সাধনা তিনি আজো করছেন। তবে সমাজ-বিপ্লবের যে আদর্শবাদ তাঁকে দিয়েছিল সাহিত্য-প্রেরণা, তার কথা ভেবেই সম্ভবতঃ নিজেকে বলছেন 'ধর্মভ্রষ্ট'। পুর্বেই ইঙ্গিত করেছি যে, সামাজিক বিবর্তনের আভাসই থাকে নব্য-সাহিত্যের সূচনায়। কবি নজরুলের বাঁশরীতে যদি সমাজ-বিপ্লবের সুর আর না বাজে, তবে তাঁর শিল্পচর্চা সার্থক হলেও নব-যুগের প্রবর্তনা তাঁর দ্বারা হবে না, এ নিশ্চিত।

ধূর্জটীবাবু বলেছেন যে, কাজী নজরুলের প্রতিভা-সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে কোনো সাহিত্য-গ্রহ আবর্তিত হতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখেছি, দশ বৎসর পুর্বে কাজীকে কেন্দ্র ক'রে তরুণ মুসলমানদের সাহিত্য-আসর সুন্দররূপে জমে' উঠেছিল। কাজী সে মজলিসের মুতরীব্ ছিলেন ব'লেই সেদিন হয়েছিল এত শ্রোতৃ-সমাগম। কাজী করেছিলেন আমাদের কবি-সভায় মার-মোশায়েরার কাজ : তাই কাজীর কবিতা শুনতে এসে অবকাশ সময়ে আমাদের কবিতা শোনানো হলেও শ্রোতারা আসর ছেড়ে উঠে যেতেন না। কিন্তু আজ সে আসর গেছে ভেঙে'। কাজী গর-হাজীর বলে' সমঝদারের দল আর ভীড় করছেন না ; আমাদের সাহিত্য-প্রচেষ্টা তাই উপেক্ষিত,—ভাব-চর্চার মতন বুদ্ধি-চর্চার ক্ষেত্রেও নেই তেমন সাড়া। আমাদের সাহিত্যের আসর সরগরম ক'রে তুলবার মতো সৃজনী প্রতিভার আবির্ভাব কবে আবার হবে,—সে কথা ভেবে আজ আমার মনে জাগছে বেদনা আর নৈরাশ্য।

যুগান্তর
'সাহিত্যের বৈঠক'
২০ অগ্রাহণ, ১৩৪৫।

বাংলা ভাষা ও নজরুল ইসলাম

করাচী সেনানিবাস থেকে হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'মুক্তি' শীর্ষক কবিতাটি ১৩২৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় প্রকাশ করে ছিলেন। কবিতাটি রাণীগঞ্জের এক মৌনী ফকিরের অলৌকিক কাণ্ড অবলম্বেনে, রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা'-র মুক্তক স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এইটিই নজরুলের প্রথম মুদ্রিত কবিতা। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র কবিতাগুলোর প্রকাশনা ১৩২১-২২ সালে; নজরুল তখন রাণীগঞ্জে সিয়ারশোল-রাজ স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। 'বলাকা'র কবিতাগুলোর অন্তর্নিহিত প্রেরণা যুগিয়েছিল Creative Evolution-এর চিন্তাধারা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্ববিহারী কবি-কল্পনায় অনুভব করেন ব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণুতে মজ্জায় মজ্জায় উদ্দাম চাঞ্চল্য ও অনাহত গতিবেগ; সেই অনুভূতির অপূর্ব রসপ্রকাশ 'বলাকা'য় হয়েছে প্রাণময়।

আপদ আছে. জানি আঘাত আ:ছ,
তাই জেনে তো বক্ষে,পরাণ নাচে;
ঘুচিয়ে দে' ভাই পুঁথি-পোড়োর ক'ছে
পথে চলার বিধি-বিধান যাচা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আরাম কাঁচা।
—(সবু:জর অভিযান)

তোমার কাছে আরাম চেয়ে' পেলেম শুধু লজ্জা,
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।
—। শঙ্খ)

সহস্র ধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।
—(ছবি)

জীবনেরে কে রাখিতে পারে
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে,
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
—(শাজাহান)

ওরে কবি! তোরে আজি করেছে উতলা
ঝঙ্কার-মুখরা এই ভুবন-মেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ আবরণ চলা।
—(চঞ্চলা)

'বলাকা'র এই সুর তরুণ নজরুলের মানস-লোকে দুর্গম পথের স্বপ্নাঞ্জন বিস্তার করেছে; কিন্তু অবন্ধন-প্রিয় ও গতিবাদী জীবনের এই মোহন রণবেশ নজরুলের অঙ্গে হয়েছে রক্ত-খচিত,—পথে চলার মধুর আহ্বান-মন্ত্র তাঁর কণ্ঠে হয়েছে বীরের বজ্র-হুঙ্কার। পল্টনে থাকতে 'বাঁধন-হারা'র বুকে গুমরে ফিরছিল যে তীব্র বিক্ষোভ, যুদ্ধ থেকে ফিরে তা ফেটে পড়লো 'বিদ্রোহী'-রূপে। বাণীর বীণা তাঁর হাতে হলো 'অগ্নিবীণা', সুরের বাঁশী হলো 'বিষের বাঁশী', 'ফণি-মনসা'র কাঁটা-কুঞ্জে বসে' নব-সৃষ্টির উল্লাসে তিনি গাইলেন 'ভাঙার গান'। সেদিনের বাংলা কবিতা ও গানে নজরুল এভাবে সঞ্চার করলেন প্রবল প্রাণবেগ; তাঁর যাদুকরী লেখনী গুণে মধুস্রাবী ভাষার ঝঙ্কারে ব্যক্ত হলো বজ্রের ব্যঞ্জনা। সেদিন বাংলা ভাষায় এই ওজস ও পৌরুষ সঞ্চার নজরুলের অমর দান।

১৩২৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'মোসলেম-ভারতে' নজরুলের সুবিখ্যাত 'শাতিল আরব' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এর ছন্দে

দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পাহাড়' গানটির অনুরণন অনস্বীকার্য। কিন্তু নজরুল স্তবকগুলোর গঠনে যে বৈচিত্র্য সাধন করলেন, তার ফলে সৃষ্টি হলো অভিনব ছন্দঃস্পন্দ। দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা ছন্দে বলিষ্ঠতা আনয়নের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন ; কিন্তু তাঁর 'মন্দ্রে' এপিকের ভঙ্গী রসভঙ্গ না ঘটালেও তাঁর 'আলেখ্য' কাব্যে গদ্যের দার্ঢ্য ও রুক্ষতা সৃষ্টির দুরূহ পরীক্ষা উৎকট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বাংলা কাব্যে বীর্য সঞ্চারের জন্য নজরুল সেরূপ কোনো সচেতন প্রয়াস করেননি, তাঁর সহজাত কবি-শক্তি আপন বিকাশের পথেই বিবিধ ছন্দঃভঙ্গীর সৃষ্টি করেছে,—তাঁর কবিতার স্তবক ও পদের বিচিত্র বিন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অসাধারণ ছন্দঃদক্ষতা। করাচীর সেনানিবাসে নজরুল রুমীর 'মসনবী' ও হাফিজের 'দীওয়ান' পড়েছিলেন, তাঁর 'ব্যাথার দান' ও 'সালেক' নামক গল্প দু'টিতেও তার প্রমাণ মিলে। তিনি বাংলা ছন্দে প্রাণবেগ প্রতিষ্ঠার জন্য মধুসূদন বা দ্বিজেন্দ্রলালের পথ নিলেন না, প্রচুর আরবী-ফরাসী শব্দ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার ক'রে অপূর্ব ঝংকার আনায়ন করলেন। মোহিতলাল তাঁর সুবিখ্যাত dramatic monologue "নাদির শাহের জাগরণ" রচনা করতে গিয়ে উপলব্ধি করেন যে, আধুনিক বাংলা কাব্যে ভাবালুতার প্রাবল্য বা আঙ্গিকের প্রাধান্য দূরীভূত ক'রে তাকে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে হলে আরবী-ফরাসী শব্দের বহুল ব্যবহার এক প্রশস্ত উপায়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর অনেক কবিতায় সাধ্যানুসারে আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন ; কিন্তু ছন্দের কারুকার্যে খচিত ক'রে ভাবের রূপসজ্জা রচনা ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু নজরুল তাঁর ভাবের শিল্পসিদ্ধ ও সৌন্দর্যময় প্রকাশ অপেক্ষা বেশী কাম্য মনে করেছেন তার স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণময় প্রকাশ ; তাই তাঁর কাব্যসৃষ্টি হয়েছে প্রাণের দীপ্তিতে ইস্পাতের মতন তীক্ষ্ণ, যৌবনের উল্লাসে ভরা-জোয়ারের মতো তরঙ্গায়িত।

'পলাতকা'র মুক্তক স্বরবৃত্তে তাঁর 'কামাল পাশা' বিদ্র .
আরবী-ফারসী পদে যথাযথ প্রয়োগে তাঁর এ-সব সৃষ্ট
কালজয়ী। তাঁর অসামান্য অবদানে বাংলা ভাষার ভাণ্ডার প
হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকে কবি ভারতচন্দ্র তাঁর 'মানসিংহ' কাব্যে
মানসিংহ ও সম্রাট আকবরের কথোপকথন বর্ণনায় আরবী-ফার
শব্দাবলী ব্যবহারের কৈফিয়েৎ স্বরূপ বলেন—

মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারশী হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥

ভারতচন্দ্র বিষয় অনুসারে এবং প্রয়োজনীয় পরিবেশ
অভিপ্রায়ে আরবী-ফারসী পদের-আমদানী করেছিলেন। যে উদ্দে
রবীন্দ্রনাথ মৈথিলী ভাষার অনুকরণে 'ভানুসিংহের পদাবলী' লিখেছি
তদ্রূপ তাগিদেই ভারতচন্দ্র "যাবনী মিশাল ভাষা" ব্যবহার করেছিলে
কিন্তু মুসলমানী পুঁথি-সাহিত্যের লেখকেরা 'মুসলমানী বাংলা
ব্যতিক্রম হিসেবে গ্রহণ করেননি; এ ঘরোয়া ভাষায় তাঁরা
বিরাটকায় কাহিনী-কাব্য প্রণয়ন করেছেন। তাঁদের রচনায় স্বাভাবি
ভাবেই দেদার আরবী-ফারসী শব্দ স্থান পেয়েছে। চারিটি প্রা
পুঁথি থেকে চারিটি নমুনা শুনুন—

খোলাসাতল্-আম্বিয়া সে কেতাবের নাম।
নবি সকলের কথা তাহাতে তামাম।